বাঙলার রণাঙ্গনে

বেদুইন

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ ঃ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

আট টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীত্রিদিবেশ বসু,
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

বাঙলার মুক্তিপাগল বীর শহীদদের স্মৃতিতে

এই লেখকের ঃ

রক্তের আলপনা

পথে প্রান্তরে [১ম ও ২য় পর্ব]

ঘানার কালো মানুষ

মন্ত্রীপতন

ওরা নকশালপন্থী কেন ?

হ্যানয় থেকে সায়গন

বাদশা বেগম নফর

অনু বোষ্টুমীর আখড়া

মোজাম্বিক

আমি চে গুয়েভারা

সিয়া একটি গোপনচক্র

আমি রেজি দ্যব্রে

কিউবা বিপ্লবের শেষ অধ্যায়

---ইত্যাদি

ওপার থেকে কামানের শব্দ ভেসে আসছে এপারে। বাঙলা দেশে লড়াই চলছে। স্বাধীনতা লাভের জন্য ওপারের বাঙ্গালীরা মরণপণ করে লড়াই করছে। গাদা গাদা খবর আসছে সীমান্তের ওপার থেকে। সকালবেলায় সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় অন্য কোন খবর প্রাধান্য পাচ্ছে না, শুধু মাত্র বাঙলা দেশের খবরই হল নিত্যকার খবর। সংবাদগুলো রোমহর্ষক, অচিন্তনীয়, বর্বর এবং নারকীয়।

এই নারকীয় ঘটনা যারা ঘটাচ্ছে তারা বাঙলার মানুষ নয়। আদিম ইতিহাসে যে-সব হুণ-শকের নাম পড়েছি, তাদেরই বংশধররা মধ্যযুগ থেকে বর্তমান যুগ অবধি ইসলামের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করলেও, তারা ইসলামকে স্বীকার করে না কোনকালেই ; ওরা হল সাম্রাজ্যবাদের উত্তরপুরুষ। দখলদারদের সাম্রাজ্য রক্ষা ওদের ধর্ম, সেই ধর্মপালন করতে বিবেককে হত্যা করেছে ওদের পূর্বপুরুষ। সেই রক্তের কুৎসিত বীজাণু আজও মসীলিপ্ত করছে মানবসমাজকে, শোণিতসিক্ত করছে বাঙলার মাটিকে।

এই নারকীয় ঘটনার হোতা হল পাকিস্থানের স্বয়ম্ভু প্রেসিডেণ্ট এহিয়া খান (ভারতবর্ষে একে ইয়াহিয়া খান বলা হয়)। নিজেকে নাদির শাহের বংশধর বলে দাবি জানাতে এহিয়া গৌরব বোধ করে। আমরা নাদিরশাহের অমানুষিক নরহত্যার কাহিনী ইতিহাসে পাঠ করে চমকে উঠেছি, কিন্তু নাদিরশাহের সন্তান সংখ্যার সঠিক হিসাব পাইনি। এহিয়া নাদিরশাহের কোন্ বেগমের গর্ভজাত সন্তানের উত্তরপুরুষ, সে হিসাবও জানি না। নাদিরশাহের কোন বেগম ভারতে সন্তান প্রসব করে রেখে যায়নি, এটা হলফ করে বলতে পারি। বংশগৌরব প্রচারের নানা অপকৌশল সব দেশেই আছে। ইরাণী নাদিরশাহ আর পাঠান এহিয়ার যোগ-

সূত্র ঘোর তমসায় আবৃত। তবুও আমরা মেনে নিচ্ছি, এই নারকীয় ঘটনার হোতা এহিয়া নাদিরের সাক্ষাৎ বংশধর এবং তার সুযোগ্য বংশধর। হত্যালীলায় নাদিরশাহকেও টেক্কা দিয়েছে এহিয়া। এটাই তার জীবনের বড় সার্টিফিকেট।

এহিয়ার বিশ্বাসঘাতকতার কথা পাকিস্থানের মানুষ ভুলে গেলেও ভুলতে পারেনি দুনিয়ার মানুষ আর আয়ুব খান। প্রভুকে গদিচ্যুত করে সিংহাসনে বসার যে গৌরব, তার চেয়ে কলঙ্কই বেশি। সাম্রাজ্যবাদীরা চিরকাল যা করেছে, এহিয়াও তাই করেছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আজ লক্ষ লক্ষ মৃতদেহের মাঝে দাঁড়িয়ে একটা কথা এহিয়াকে স্মরণ করতে হবে, সেটা হল নাদিরের পরিণতি। এত বড় ঘাতককেও আরেকজন ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। এহিয়া যদি কোনদিন ঘাতকের হাতে প্রাণ দেয়, তার জন্য কেউ কি অশ্রুপাত করবে ?

বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস নিয়েই পাকিস্থানের ইতিহাস রচিত হয়েছিল। এস্কান্দার মির্জা গদিতে বসেছিল প্রভুকে বিতাড়ন করে, তার পরিণাম হল লণ্ডনে বসে 'ভাতবিক্রি'। কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট এর চেয়ে বড় গৌরব (?) কি আর লাভ করতে পারে ? তার মৃত্যুর পর একবিন্দু অশ্রুপাত করেনি পাক-ভারত উপ-মহাদেশের একটিও মানুষ। মীরজাফরের উত্তরপুরুষ বিশ্বাস-ঘাতকতার যে ইতিহাস রচনা করে মীরজাফরকে আবার কবর থেকে টেনে তুলেছিল, তার পরিণতি এর চেয়ে ভাল কী হতে পারে !

এদেশের মানুষ সংবাদ শোনে। চমকপ্রদ খবর দেয় পাকিস্থান বেতার থেকে। সেই বেতারের খবর ভাল করে শোনায় ইংরেজ সরকার লণ্ডন থেকে। বি. বি. সি.-র সংবাদ হল পাকিস্থান সংবাদের ভাষ্য। সেদিন সবাইকে চমক দিয়ে বি. বি. সি. করাচীর খবর শোনালো, হিন্দুস্থানের দুই ব্যাটেলিয়ান সৈন্য পাকিস্থানে প্রবেশ

করেছিল। এরা সমাজবিরোধী ও বিচ্ছেদপন্থীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করছিল। পাকবাহিনী এদের নির্মূল করে দিয়েছে।

(ঝুটা খবর সময় সময় মিঠা হয়।)

সংবাদ আসছে, প্রতিবাদ আসছে, আবার সংবাদ আসছে, সব মিলিয়ে বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে সংবাদ-জগৎ। লোকে ভাবছে, বাঙলাদেশের সংবাদ বুঝি তৈরী হচ্ছে বাগবাজারে, সুতারকিন স্ট্রীটে, আর চৌরঙ্গীতে। এরা যে সংবাদ পরিবেশন করছে তার বিপরীত সংবাদ আসছে করাচী, ঢাকা, লাহোর, খুলনা থেকে। রাজশাহী অবশ্য নীরব। পাকিস্থান বলছে সব ঠিক হ্যায়। বিলকুল ঠাণ্ডা। এমন ঠাণ্ডা যে উত্তরমেরুতেও অত ঠাণ্ডা নেই। লোকে ভাবল, এত যখন ঠাণ্ডা তখন নিশ্চয়ই কবরের শীতলতা। নইলে এত ঠাণ্ডা হয় কি করে।

এমন সময় পুরোপুরি দুই ব্যাটেলিয়ান ভারতীয় সৈন্যের বিচিত্র সংবাদ নিশ্চয়ই চমকপ্রদ। সংবাদটি শুনেই আমাদের সলিল সেন ছুটতে ছুটতে হাজির হল আমার কাছে। কোন রকমে বিছানায় ধপাস করে বসে বলল, হোলো তো! ভারতের দুই ব্যাটেলিয়ান সৈন্য খতম করেছে পাকিস্থানীরা। গুরুতর ঘটনা। এখনও ইণ্ডিয়া চুপ করে রয়েছে কেন?

হেসে বললাম, ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে?

পাকিস্থানে, মানে পূর্ব-বাঙলায়, মানে সেখানে নাকি এরা ইয়ারকি করতে গিয়েছিল।

তা হলে ঠিকই হয়েছে। পাকিস্থান তথা পূর্ববঙ্গ হল বিদেশী রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্রে ভারতের সৈন্য অনধিকার প্রবেশ করলে তাদের খতম করার অধিকার তাদের নিশ্চয়ই আছে। অন্যায় তো কিছু নয়।

কিন্তু ভারত সরকার চুপ করে আছে কেন?

যেহেতু এমন ঘটনা ঘটেনি। পশ্চিম পাকিস্থানের জহ্লাদরা পূর্ববঙ্গের সধর্মীদের হত্যা করছে। তাদের তো আর পূর্ববঙ্গীয় বলা যাচ্ছে না। একেই বিশ্বজনমত ধীরে ধীরে এই কসাইদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তাই ওরা প্রমাণ করতে চাইছে, পূর্ববঙ্গে বিলকুল ঠিক আছে, যারা গোলমাল করছে তারা হিন্দুস্থানের লোক। হিন্দুস্থানের অবৈধ প্রবেশকারীদের হত্যা করা হয়েছে, পূর্ববঙ্গের লোকদের নয়। খবরটা বি.বি.সি.-র নিজস্ব সংবাদদাতার নিশ্চয়ই নয়।

সলিল মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, খবরটা হল করাচীর খবরের উদ্ধৃতি মাত্র।

বললাম, পাকিস্থান খুব চতুর, তবে কিছুটা ভুল করে ফেলেছে। ইতিপূর্বে ভারত সরকার কড়া হুমকি দিয়েছে। ভারতসীমান্ত থেকে তিনজন সেপাইকে জোর করে আটক করেছে পাকিস্থান। তাদের ফেরত চেয়েছে ভারত। হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, এরকম ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটলে খুব অসুবিধার সৃষ্টি হবে। এই ঘটনাকে চাপা দিতে পাকিস্থান আরেকটা মিথ্যা-সংবাদ প্রচার করেছে। অর্থাৎ বন্দী তিনজন ভারতীয় সেপাইকে ওরা ছেড়ে দেবে না। কিন্তু মুক্তিফৌজের ঠ্যাঙ্গানি খেয়ে শ'য়ে শ'য়ে পাকিস্থানী সেপাই ভারতে ঢুকেছে। তাদেরও আটক করেছে ভারত সরকার। এবার দড়া-টানাটানি চলবে। চলবে রাজনীতি আর সামরিক নীতির লড়াই। চলবে চিঠিচাপাটি আর বাক্যস্রোত।

আমাদের পাড়ার মাতব্বর বীরেনবাবু অলক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমার কথা শেষ হতেই বলল, তাহলে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। তিনজনের বদলে বহুজন।

বললাম, তিনজন আর বহুজন ঠিকই, কিন্তু এতে কি সমস্যা মিটবে, বরং সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। আসল বস্তুটি হল, বাঙলা দেশের ঘোরতর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। যুদ্ধে বহু প্রাণ ও সম্পদহানি হচ্ছে, নারীর মর্যাদাহানি ঘটছে। এটাই হল সঠিক সংবাদ। দু'জন দশজন

গ্রেপ্তার যুদ্ধের ডামাডোলে ঝগড়া জিইয়ে রাখার রাজনৈতিক স্টাণ্ট। জয়-পরাজয় এখনও স্থির হয়নি। চূড়ান্ত জয়ের পর জানা যাবে কোন্ ঘটনা সত্য আর কোন্ ঘটনা মিথ্যা। তবে বীরেনবাবু, যুদ্ধ মানেই "সত্যনাশ" অর্থাৎ সবার আগে উভয়পক্ষই 'সত্য'কে হত্যা করে। সত্য হননের পর মিথ্যাকে সত্যের মুখোস পরানো চলতে থাকে। এটাই হল সব যুদ্ধের প্রধান এবং অকৃত্রিম আদি স্ট্রাটেজি। এখন এইসব সংবাদের মাঝ থেকে সত্যকে খুঁজে বের করার মত অণুবীক্ষণ যন্ত্র আজও আবিষ্কার হয়নি। সেজন্য সেই মহৎ কার্য সম্পাদন মোটেই সম্ভব নয়।

বীরেনবাবু বলল, আমাদের কালাচাঁদ ঠিকই বলেছে। অন্য খবর বরবাদ, আসল খবর যুদ্ধ চলছে। আর এই যুদ্ধ হল বাঙলা-দেশের স্বাধীনতালাভের যুদ্ধ। এই চলছে।

বললাম,—চলছে এবং চলবে। সপ্তাহের হিসাব দিচ্ছে, এরপর মাসের হিসাব হবে, তারপর চলবে বৎসরের হিসাব। এই যুদ্ধ যখন সপ্তাহ ডিঙ্গিয়েছে, তখন কয়েক বছরে শেষ হবার আশা কম। শেষ পর্যন্ত বাঙলা দেশের মাঠেঘাটে যদি পাহাড় পরিমাণ মৃতদেহ জমে ওঠে, তাতেও আশ্চর্য হব না। যুদ্ধ ইজ্ অলওয়েজ যুদ্ধ। এতে ন্যায়নীতি থাকবে না, সত্য ও সততা মারা যাবে। মরবে মানুষ, ভাঙ্গবে ঘরবাড়ি সংসার, মাটি লাল হবে, অনাহার মহামারী দেখা দেবে, একদল বিপক্ষদলের ওপর আঘাত প্রত্যাঘাত করবে। তারপর একদিন ক্লান্ত হবে উভয়পক্ষ। যারা শক্তিশালী অথবা যাদের সাহায্য করবে পরিবেশ, তারা জয়ী হবে, তাদের হাতে ক্ষমতা যাবে; তখন বিজয়ীরা গলা উঁচু করে চিৎকার করবে, আমরা ধর্মযুদ্ধ করেছি, তাই জয়মাল্য আমাদের কণ্ঠে।

সলিল সেন আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, তাহলে তুই বলতে চাস এই যুদ্ধ বহুকাল চলবে?

আমার মনের কথা যুদ্ধ বেশিদিন না চলা, কিন্তু মন যা চায় তা তো বাস্তব নয়। বাস্তব হল ইতিহাসের পৃষ্ঠা নতুন করে লেখা। তাই যুদ্ধ অনেক কাল না চলে পারে না, তবে কতকাল তা বলা কঠিন। পৃথিবীর শক্তিশালী দেশ যদি একত্র হয়ে চাপ দেয় তা হলে যুদ্ধ তাড়াতাড়ি বন্ধ হবেই; কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থা তাতে সাম্রাজ্যবাদীর জারজ যুদ্ধবাজদের নেতা এহিয়া খান কোনক্রমেই পিছু হটতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে আশ্রয় না নেওয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলতে বাধ্য। পশ্চিম পাকিস্থানী সামরিক জুন্টা (Junta), পশ্চিম পাকিস্থানী পুঁজিবাদী গোষ্ঠী এই শোষণ ও শাসনের উপনিবেশ সহজে ছেড়ে চলে যাবে এটা যারা মনে করে, তাদের মূর্খ বললে বোধ হয় ভুল হবে না। এহিয়া পেছু হাঁটলে সামরিক কর্তাদের সর্বনাশ, পুঁজিপতিদের সর্বনাশ, জঙ্গী-প্রশাসকদের প্রেসটিজের সর্বনাশ। এতগুলো সর্বনাশ কস্মিনকালেও এহিয়া স্বীকার করবে না। সেজন্য এহিয়ার পেছন-হাঁটার পথ নেই।

কিন্তু মুক্তিফৌজ তো দেউলে হতে পারে।

তাও পারে, আবার নাও পারে। তবে তাদেরও পেছন-হাঁটার কোন উপায় নেই। যদি তারা পেছন হাঁটে, তা হলে মুক্তিযোদ্ধাদের নির্বিচারে জবাই করবে এহিয়া। অসামরিক সমর্থক নরনারীদের লক্ষ লক্ষ জনকে প্রাণ দিতে হবে। আজ উভয়পক্ষের সামনে খোলা আছে একটিমাত্র পথ। সে পথটি হল যুদ্ধ করা। সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তির যুদ্ধ, অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্রের যুদ্ধ। এহিয়া যদি বঙ্গোপসাগরে ডোবে তবে যুদ্ধ শেষ, না হয় লক্ষ লক্ষ পুরুষ যদি দাসত্ব স্বীকার করে এবং লক্ষ লক্ষ নারী যদি গণিকায় রূপান্তরিত হয়, তবে যুদ্ধ শেষ। এহিয়া বঙ্গোপসাগরে সহজে ডুবতে চাইবে কি? আর লক্ষ লক্ষ পুরুষও দাসত্ব স্বীকার করবে না, লক্ষ লক্ষ নারীও গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করবে না, সেজন্য বলছি—যুদ্ধ চলবে।

তুই বলতে চাস আওয়ামী লীগের জয় হবে?

বললাম, ভেবে বলতে হবে। বীজগণিতের ফরমূলায় অঙ্ক কষতে হবে। তারপর জবাব দেব।

সলিল সেন হেসে বলল, মানে? যুদ্ধ আর বীজগণিতে কোথায় মিল আছে?

মানে খুব সহজ। লড়াই যারা করে তাদের চরিত্রের ওপর আজকের দিনে যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করে।

বীরেনবাবু বলল, যোদ্ধার আবার চরিত্র কি? Do or die, —এই তো তাদের মূল চরিত্র।

কিন্তু সবাই do করতে গিয়ে die-কে ভয় করে, আর do করতে undo ঘটায়, আর অনর্থক die-এর দলে নাম লেখায়। আমাদের বিচার করতে হবে যুদ্ধ কারা করছে—তাদের। দেখতে হবে লড়াকুদের মনোবল কতটা। দেখতে হবে নেতা কারা? যোদ্ধার মনোবল, যোদ্ধার চরিত্র, নেতাদের চরিত্র এবং এই সবের সমন্বয়ে যেটা গড়ে উঠবে সেটা হল সংগঠন,—এইসবের বিশ্লেষণ করলে বীজ-গণিতের ফরমূলায় আসবে। রাজনীতি হল ইতিহাসের গতি। ইতিহাসের গতির সঙ্গে মিলিয়ে অঙ্ক কষলেই রাজনীতি আর জঙ্গী-নীতির ফলাফল জানা যাবে। সেই ফলাফল হবে চূড়ান্ত ফলাফল। সেটাই স্থির করে দেবে জয়মাল্য কার কণ্ঠে শোভা পাবে।

বীরেনবাবু বলল, আপনি যেন সক্রেটিসের মত কথা বলছেন। দার্শনিকের ভাষ্য দিয়ে যুদ্ধকে বিচার করলেই হয়েছে আর কি! যুদ্ধটা হল বাস্তব ঘটনা। দর্শনশাস্ত্র দিয়ে যুদ্ধের বিচার হয় না, কালাচাঁদবাবু।

হেসে বললাম, ওটা আমিও বুঝি। যেদিন জানার মত বুদ্ধি জন্মেছে, সেদিনই এইসব বাস্তবকে কিছু কিছু বুঝেছি। সেজন্য যারা যুদ্ধ করে বাক্য দিয়ে, তাদের মত দার্শনিক হওয়া আমার ধাতে পোষায় না। দুই পক্ষই সহস্র সহস্র মিথ্যা প্রচার করবে, গুজব ছড়াবে, আর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও বলবে, "আল্লা আমাদের সহায়।"

কারণ, উভয়পক্ষই আল্লার বান্দা এবং এদের সব যুদ্ধই বদরের ধর্ম-যুদ্ধ, সবাই ন্যায়ের জন্য শান্তির জন্য যুদ্ধ করছে, কিন্তু ইতিহাস, সমাজনীতি, অর্থনীতির পটভূমিকায় রাজনীতিকে বিচার করে যদি যুদ্ধকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়, তা হলে দেখা যাবে, "আল্লা" একপক্ষকে পরিত্যাগ করে অপর পক্ষের স্কন্ধে আরোহণ করেছেন, কারণ জয়ী পক্ষ শক্তিশালী। বীরভোগ্যা বসুন্ধরার মত আল্লাহ্‌তালাও জয়ী বীরদের একচেটিয়া সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছেন।

সলিল সেন বলল, এত বড় গুরুতর ব্যাপারে তুই যে ব্যঙ্গ-তামাশা করবি, তা মনেও করতে পারিনি। Heavy জিনিসকে heavy মনে করতে হয় ভাই, কালাচাঁদ।

বললাম, এটা হাসি-তামাশা নয় ভাই। মাসিডানের বীর আলেকজান্দার একজন দার্শনিককে একবার খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। হাজার হাজার মানুষ হত্যা করে আলেকজান্দার ভারতবর্ষ পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। এত বড় সৎকার্য করে আলেকজান্দার ভাবলেন, এত বড় সৎকার্য সম্পন্ন করা একমাত্র ভগবানের পক্ষেই সম্ভব। তাহলে আলেকজান্দার নিশ্চয়ই ভগবান। নিজেকে ভগবান প্রমাণ করতে আলেকজান্দার দার্শনিক খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন যে, যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবে আলেকজান্দার স্বয়ং ভগবান। হত্যা ও সম্পদলুণ্ঠন করে আলেকজান্দার বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন, সেজন্য ভগবান নিশ্চয়ই তার দোর-গোড়ায় বাঁধা। পৃথিবীর সকল দেশেই বিজয়ীদের জন্য ভগবান। সেজন্য যুদ্ধ দার্শনিক তথ্য দিয়ে বিচার না করলেও, মানবের সমাজনীতি দিয়ে বিচার করতে হবে, অর্থ-নীতির পটভূমিকায় যে রাজনৈতিক আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে, যুদ্ধের পটভূমিকা তৈরী করতে তারই বিচার করতে হবে। তা থেকেই যুদ্ধের ফলাফল অগ্রিম জানা যায়। ভবিষ্যদ্বাণী শোনাবার কোন প্রয়োজনই হয় না।

তোর মত যে কি তা বুঝছি না। তা হলে এহিয়া (ইয়াহিয়া) জিতবে কি ?

আশ্চর্য নয়। এহিয়ার হাতে আছে আধুনিক মারণাস্ত্র, আছে অর্থ, আছে বিশ্বজোড়া কিছু কিছু সমর্থক ; আছে স্বদেশীয় যোদ্ধা, আছে মুসলীম লীগের মীরজাফরের দল, আছে অবাঙ্গালী বিশ্বাসঘাতক ; আর আছে এই সবাইয়ের নারকীয় ঘটনা ঘটাবার মত নারকীয় পশুত্ব। সেজন্য সবার আগে ঝটিকাগতিতে মুক্তি-যোদ্ধাদের আঘাত করে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করবে এবং তাতে যদি সাফল্যলাভ করে তাহলে সে জিতবে, নইলে নয়।

তোর কথায় মনে হচ্ছে মনোবলটাই বড় কথা।

হাঁ। এহিয়ার (ইয়াহিয়ার) সৈন্য হল ভাড়াটিয়া লোক। ওদের আছে পারিবারিক বন্ধন। ওরা দেশ রক্ষা করতে যে শৌর্যের পরিচয় দিতে পারে, সে শৌর্য বিদেশ দখল করতে দেখাতে পারে না। যারা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তারা ভাড়াটিয়া লোক নয়। মুক্তিযোদ্ধারা আদর্শ আঁকড়ে ধরে লড়াই করছে হানাদার বিতাড়ন করতে। এদের মনোবল হিমালয়ের মত বিরাট ও দৃঢ় হতেই হবে। যদি তা না হয়, তাহলে প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়বে, স্বাধীনতা ফিরে পাবার বর্তমান যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

অস্ত্রের প্রয়োজনের কথা বলছিস না কেন ?

অস্ত্র নেই মুক্তিফৌজের। এটা সর্ববাদীসম্মত। কিন্তু বিপ্লবী-যুদ্ধের ইতিহাসে আমরা দেখেছি, কোন কালেই তাদের অস্ত্র ছিল না। শত্রুর অস্ত্রই তাদের অস্ত্র। Enemy's weapon is our weapon (Che Guevara). শত্রুর অস্ত্র দিয়েই তাদের লড়াই করতে হবে। আর শত্রুর কাছ থেকে অতর্কিতে অস্ত্র কেড়ে নেওয়াই হবে সবচেয়ে বড় অস্ত্র-সংগ্রহ। একজন বিপ্লবীর মৃত্যুর চেয়েও

বিপ্লবীযুদ্ধে একটি রাইফেল হাতছাড়া হওয়া বড় ক্ষতি। শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদের অন্যতম মাও সে-তুং বলেছিলেন, আমরা ভাঙ্গা বন্দুক দিয়ে জাপানীদের সঙ্গে লড়াই করেছি, জাপানীদের বিতাড়িত করেছি। সূচনায় অনেক ক্ষতি হবে, অনেক অসুবিধা হবে, কিন্তু এরাও শত্রুর অস্ত্র কেড়ে নিতে পারবে। যতদূর সংবাদ আসছে তাতে জানা গেছে, মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুর অস্ত্র কেড়ে নিতে পারছে। যোদ্ধাদের মনোবল, নেতৃত্ব আর দৃঢ়-সংগঠন প্রয়োজন। তা যদি থাকে তাহলে এহিয়ার পতন অনিবার্য। পৃথিবীর কোন শক্তির ক্ষমতা নেই এহিয়ার পতন রোধ করে। এইটাই হল আমার বীজগণিতের ফরমূলা।

বীরেনবাবু মৃদুস্বরে বলল, আধুনিক অস্ত্র আর নিরস্ত্র মানুষ! কি যে বলছেন কালাচাঁদবাবু! হোসেন বক্‌সো আর ইনকাম ট্যাক্‌সোর সঙ্গে তুলনা করছেন।

হেসে বললাম, তুলনাটা ঠিক হল না বীরেনবাবু। এখানে হোসেন বক্‌সো বলে যাদের তুচ্ছ করছেন, তাদের সত্যিই তুচ্ছ মনে করার কোন কারণ নেই। আর যারা ইনকাম ট্যাক্‌সো, তাদের গতর এত বেশী মুটিয়ে গেছে যার ফলে মোটেই নড়াচড়া করতে পারছে না।

সলিল সেন বাধা দিয়ে বলল, অস্ত্র না হলে যুদ্ধ করবে কি দিয়ে? শক্তির উৎস হল রাইফেল। মাও সে-তুং সেই কথাই বলেছেন। সেই হাতিয়ার যাদের নেই, তারা যুদ্ধ করবে একদল সুশিক্ষিত সৈন্যের সঙ্গে, এমন আজব আজগুবি ঘটনা কেউ বিশ্বাস করবে কি?

বললাম, তোর কথা ঠিক। মাও সে-তুং বলেছেন, বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস। তোরা মাও সে-তুং-এর সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে ঐটুকুই জানিস। মাও এর সঙ্গে আরও একটি কথা বলেছেন সেটা তোরা জানিস না, জানলেও তা স্বীকার করিস না। যেখান থেকে

এই উদ্ধৃতি, তার সঙ্গে রয়েছে আরও একটা কথা,—Party should control guns. Guns shall not be allowed to control party অর্থাৎ সংগঠন চাই। সুসংগঠিত পার্টির হাতে থাকবে বন্দুক, বন্দুক দিয়ে পার্টিকে পরিচালনা করা হবে না। পার্টি অর্থেই সাধারণ মানুষের সংগঠন। যদি সংগঠন ঠিক থাকে, আর সেই সংগঠনের এক্তিয়ারে বন্দুক থাকে, তাহলে ক্ষমতা দখল করা যাবে। তা যদি না হত, তাহলে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী রাষ্ট্র আমেরিকা কেন নাকানি-চুবানি খাচ্ছে ভিয়েতনামে, লাওসে আর কম্বোডিয়াতে?

ওসব কম্যুনিস্টদের কথা শুনতে চাই না, বন্ধু। আমরা বাঙলা দেশে কি হবে তাই শুনতে চাই।

কিন্তু বাঙলাদেশ তো পৃথিবী ছাড়া নয়। পৃথিবীর ইতিহাসের ক্ষুদ্রতম অধ্যায়ে যে বাঙলার স্থান নেই, সেই বাঙলাকেও চলতে হবে ইতিহাসের নির্দেশে। সেজন্য আমি যা বলছি তা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। এই তো সেদিনের কথা, লাওসে কি প্রচণ্ড মার খেয়ে পালিয়ে এসেছে আমেরিকা তা তো তোমার জানা আছে। ভিয়েতনামে সতর বছর ধরে লড়াই চলছে, তাও তো দেখতে পাচ্ছ। আমেরিকার মত শক্তিশালী রাষ্ট্র কেন সেখানে সুবিধা করতে পারছে না তা কখনও কি ভেবে দেখেছ?

আমেরিকা দেশ ছেড়ে বিদেশে লড়াই করতে গেছে। তাদের নানা অসুবিধা। তাই সুবিধা করতে পারছে না।

ঠিক কথা। এখানেও এহিয়া হানাদারী করছে। পাকিস্থানের ফৌজ বললেই বুঝতে হবে পানজাবী, বেলুচি আর পাঠান। তারাও সাড়ে তিন হাজার মাইল সমুদ্র পেরিয়ে হানাদারী করতে এসেছে। তাদের সঙ্গে বাঙলাদেশের মানুষের কোন সম্পর্ক নেই, তারা বাঙলাদেশের কেউ নয়। সেজন্য তারাও সুবিধা করতে পারবে না —এটা তো স্বতঃসিদ্ধ।

এহিয়ার ফৌজ সুশিক্ষিত এবং আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। তাদের সামনে ওরা দাঁড়াবে কি করে?

এটা তো নতুন কথা নয়। যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগেই মুক্তি-যোদ্ধারা তা জানে। কিন্তু এর পেছনে রয়েছে আরও কতকগুলো সমস্যা। সে সমস্যার সমাধান করতে কোনকালেই এহিয়া পারবে না। নিয়মিত সৈন্যরা লড়াই করে ছকে-বাঁধা নিয়মে, যাকে বলে according to table. আরও সহজ করে বলছি। আগের দিনে মোগল বাদশাহরা যুদ্ধে যেত, সঙ্গে যেত বেগম, বাঈজি, আরও অনেক কিছু। চলতে ফিরতে তাদের সময় নষ্ট হত, নৈতিক দিকগুলো থাকতো শিথিল। বর্তমানে নিয়মিত সৈন্যরাও চলে পুরাতন দিনের মোগল বাদশাহের সৈন্যদের মত। নিয়মিত সৈন্যের সঙ্গে যাবে ইনজিয়ার কোর, সিগন্যাল কোর, মেডিক্যাল কোর, সারভিস কোর অর্থাৎ লড়াকুদের সাহায্য করতে নানা বিভাগ, নানা ব্যবস্থা। কিন্তু অনিয়মিত সৈন্য, যাকে আমরা মুক্তিফৌজ বলে মনে করি, তাদের জন্য একটিমাত্র বস্তু দরকার—সেটি হল আদর্শ ও নেতৃত্বের নির্ভুল পরিচালনা। নেতাদের নির্দেশমত মুক্তিযোদ্ধারা সুযোগমত আঘাত করবে, সুবিধামত যুদ্ধের কৌশল নির্ণয় করবে, তাদের প্রয়োজন হয় না পেছনে পেছনে সাহায্যকারী কয়েকদল সৈন্যের বা তার লেজুড়ের। কোন ছকে-বাঁধা নিয়ম নয়। ফলে ছকে-বাঁধা নিয়মিত সৈন্যদের হারতে হয় প্রতি পদক্ষেপে।

বীরেনবাবু বলল, আপনার তত্ত্ব স্বীকার করতে পারছি না। মুক্তিফৌজের প্রতিরোধ ভেঙ্গে ইতিমধ্যেই পাকিস্থানীরা জেলা শহরগুলো দখল করেছে, মহকুমা শহরগুলো দখল করছে। অনিয়মিত সৈন্য বাধা দিতে পারছে না কোনমতেই।

হেসে বললাম, বীরেনবাবু, সৈন্য দিয়ে শহর দখল করা যায়, শহরের মানুষদের দখল করা যায় না। মানুষ বিনা রাষ্ট্র চলে কি? বাঙলা রাষ্ট্রের মানুষ মাত্রেই পাকিস্থানের বৈরী। বৈরিতাই যথেষ্ট

নয়, প্রত্যেক দেশপ্রেমীর মনে যে ঘৃণা জেগেছে পাকিস্থানীদের সম্বন্ধে, সে ঘৃণা অপনোদন হাজার বছরেও সম্ভব নয়। দখলদারী পাকিস্থানীদের যেমন আধুনিক অস্ত্র আছে, তেমনি মুক্তিকামী বাঙলাদেশের মানুষের রয়েছে বড় অস্ত্র, সেই অস্ত্র হল পাকিস্থানীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা। এই ঘৃণাই বাঙলাদেশের মানুষকে দখলদার বাহিনীর হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনে দেবে।

সলিল সেন বলল, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের অভাব নেই বাঙলাদেশে।

পৃথিবীর সকল দেশেই তা আছে এবং থাকবে। কিন্তু বিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধাদের সতর্ক হতে হবে। যারা মুক্তিফৌজের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করছে, তাদের কাজ হল বিশ্বাসঘাতকদের খুঁজে বের করা এবং বিনা দ্বিধায় তাদের খতম করা। মুক্তিফৌজকে লড়তে হবে। এ লড়াই হবে দখলদারীদের রসদ বন্ধ করা, যোগাযোগ বন্ধ করা, প্রশাসন পঙ্গু করা, অতর্কিত আক্রমণে তাদের নির্মূল করা। তাদের জানতে হবে দখলদারীটা জয় নয়। মধ্যযুগে যারা দিল্লী দখল করত, তারাই ভারতের প্রভু হত। সে-যুগে সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাজার কোন সম্পর্ক ছিল না, সেজন্য সাধারণ মানুষ কোন সময়ই চিন্তা করত না কে তাদের রাজা, আর কোন্ রাজা এল অথবা গেল। কিন্তু আজ তো সে জমানা নেই। আজ সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রয়েছে, তাই যুদ্ধ শুধু পাণিপথেই শেষ হয় না, দেশের আনাচে-কানাচে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধের শেষ হয় হানাদার নির্মূল হলে। সেটা সময় সাপেক্ষ। সাধারণ মানুষের স্বার্থেই রাষ্ট্র চলতে পারে। সাধারণ মানুষ যদি কোন বিশেষ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা না চায়, দখলদারী পছন্দ না করে, তা হলে বন্দুক উঁচিয়ে দেশ শাসন করা যায় না। কোনদিন যাবেও না। লক্ষ্মণসেনের যুগে যা সম্ভব ছিল, বর্তমান যুগে তা সম্ভব নয়। আজই হোক আর কালই হোক, দখলদারী হানাদার এহিয়াকে নাকে খৎ দিতেই হবে।

সলিল মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, তা হলে তোমার মত হল—মুক্তিফৌজ জিতবে।

বললাম, তা ঠিক করে এখনই বলতে পারছি না, তবে জেতা উচিত। এসব জানতে হলে এবং কোন নিশ্চিত মতে আসতে হলে আমাদের পেছন হাঁটতে হবে, বন্ধু। আরও অনেক বছর আগের ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমান ঘটনাগুলো একই দাঁড়িপাল্লায় তুলে তবেই বিচার করতে হবে। নইলে বিচারফল হাস্যজনক হবে।

বীরেনবাবু বলল, যুদ্ধটা কার? কেন? এসব তো জানা দরকার।

সেটাই বলতে চাই, বীরেনবাবু। আসল যুদ্ধ কিন্তু শোষক ও শোষিতের; বাঙ্গালী আর অবাঙ্গালীর; স্বদেশী আর বিদেশীর। যুদ্ধকে এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই বিচার করতে হবে। যদি আমরা মনে করি যুদ্ধ হচ্ছে পাকিস্থানের একটি অংশের সঙ্গে অপর অংশের, যদি মনে করা হয় এহিয়া পাকিস্থানের সংহতি রক্ষার জন্য যুদ্ধ করছে, তাহলে মহা ভ্রম ঘটবে।

পাকিস্থান বলছে, বিচ্ছেদকামী সমাজবিরোধীরা যে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল, তা দমন করতে পুলিসীব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সামরিক বাহিনী।

তাই যদি হত, তাহলে সামরিক বাহিনীতে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী উভয় শ্রেণীর যোদ্ধারা অংশ গ্রহণ করত। এখানে দেখতে পাচ্ছ, বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে অবাঙ্গালীরা। অর্থাৎ পাকিস্থান নামক যে রাষ্ট্র বিশ্বাসঘাতকতা ও ঘৃণার ক্লেদ সর্বাঙ্গে মেখে জন্ম নিয়েছিল, তার পূর্ব-পশ্চিমের কোন সংহতি ছিল না, আজও নেই। সংহতি নেই বলেই জোর করে যুদ্ধটা চাপিয়ে দিতেও হয়েছে বাঙলাদেশের ওপর। আর স্থল-বাহিনীর অক্ষমতা প্রমাণ না হলে বিমান-বাহিনীর প্রয়োজন হত না, প্রয়োজন ছিল না নৌ-বাহিনীর কামান দাগার। এ থেকেই তো প্রমাণিত হয়েছে,

এটা পুলিশীব্যবস্থা নয়, এটা দখলদারী কায়েম করতে জহ্লাদের কাজ।

বীরেনবাবু বলে উঠল, কেন ? কেন এই যুদ্ধ ?

যুদ্ধটা পাকিস্থানী হানাদাররা চাপিয়ে দিয়েছে বাঙলাদেশের ওপর। কেন যুদ্ধ, এর জবাব দিতে আমাদের অনেক পেছনে হাঁটতে হবে, বীরেনবাবু। কি ভাবে এই লড়াই জমে উঠেছে অতীতের পটভূমিকায়, সেটাই আমরা বিশ্লেষণ করব। এরপর আমরাই স্থির করতে পারব কে জয়লাভ করবে, আর কে পরাজিত হবে। আমরা যোদ্ধাদের বিচার করার আগে নেতাদের সম্বন্ধে আলোচনা করব।

বাঙলাদেশ তো কেবলমাত্র ওপারের বাঙলাই নয়, এপারেও বাঙলা। গোটা বাঙলাকে দুভাগ করল কার প্রয়োজনে ? বাঙালীর প্রয়োজনে ? বাঙলার সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে ? অনেক অনেক প্রশ্ন জমে আছে সবার মনে।

সবচেয়ে বড় সত্য হল সাতচল্লিশ সালের চোদ্দই আগস্ট রাত বারটায় বাঙলা বিভক্ত হল, তাকে সম্পূর্ণ করা হল সতর আগস্ট তারিখে। বিভাগের জন্য ইংরেজ সরকার যে কী মেহনত করেছে, পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে তা যাদের জানা নেই, তারা এই বিভাগকে স্বাভাবিক বলেই মনে করতে পারে ; কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই কলঙ্কজনক বিভাগকে যারা অধ্যয়ন করেছে, তারা আজও খুঁজে বেড়াচ্ছে উপযুক্ত অবসর, যাতে এই বিভাগের হোতাদের যথোপযুক্ত শাস্তি দিতে পারে। শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে, হবে। সবাই প্রতীক্ষা করছে শাস্তিদানের সেই শুভদিনটার।

ওরা সবাই বলছে, ভারতবিভাগ হয়েছে সাতচল্লিশ সালে। রাজনৈতিক ভাষ্যকার বললেন, উঁহু, ভারতবিভাগ হয়েছে সেইদিন, যেদিন কংগ্রেস আর মুসলীম লীগ মেনে নিয়েছিল আলাদা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন। মেনে নিয়েছিল, মুসলমানদের স্বার্থ

রক্ষা করতে মুসলমানরাই সক্ষম, আর হিন্দুর স্বার্থ রক্ষা করতে হিন্দুরাই উপযুক্ত।

মুসলীম লীগ খোলাখুলি ভাবে মুসলমানদের কথা বললেও, কংগ্রেস নিজেদের হিন্দুর প্রতিনিধি বলে স্বীকার করল না, কিন্তু পরোক্ষভাবে হিন্দু স্বার্থের রক্ষকরূপেই দেখা দিয়েছিল রঙ্গমঞ্চে।

হিন্দু-মুসলমান যে ছুটো নেশান, তার পাকা বুনিয়াদ তৈরী হল এই ভাবেই।

একই পতাকাতলে হিন্দু-মুসলমান বাস করতে পারে না, এটা সেদিন যেমন মুসলীম লীগ স্বীকার করেছিল, তেমনি ভারত-বিভাগের পর জিন্নাহ্, লিয়াকত আলি এবং আয়ুব খান এই তত্ত্বকে মেনে নিয়েছিল, যার পরিণতি হল ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্থান থেকে সুপরিকল্পিত উপায়ে হিন্দু-বিতাড়ন।

ধর্ম কোন জাতীয়তাবোধের জন্ম দিতে পারে কিনা, সে প্রশ্ন আজ সবার সামনে। হিন্দু-মুসলমান যে দ্বিজাতি, এটা যারা স্বীকার করেছিল, তারা বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিল জাতীয়তার বুনিয়াদ হল ভাষা আর সংস্কৃতি। যেখানে এই ভাষা ও সংস্কৃতিতে আঘাত লেগেছে, সেখানেই অশান্তির বীজ রোপিত হয়েছে। সেই বীজ থেকে জাতীয়তাবোধের যে মহীরুহ সৃষ্টি করেছে, তাতেই দেখা দিয়েছে স্বাধীনতালাভের স্পৃহা, যা দমন করতে পারেনি কট্টর সাম্রাজ্যবাদীরাও।

ইংরেজ এটা বিশ্বাস করত।

জাতীয় সংহতির এই ছুটো অবশ্যধর্ম বাদেও ভৌগোলিক নৈকট্য জাতীয়তাবোধের অপর পরিপোষক। ইংরেজ কি জানতো না সে কথা? খৃষ্টান ইংরেজের ভাষা আর আয়ারের ভাষা একই ভাষা। গ্রেট বৃটেন আর আয়ারের মধ্যে ফারাক একটা সামুদ্রিক খাড়ি, অথচ আয়ারকে কোনক্রমেই গ্রেটবৃটেনের সঙ্গে যুক্ত রাখতে পারেনি, আয়ারকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়েছে। ধর্ম যে কোন

জাতীয়তাবোধের ভিত্তি নয়, একথা কি জানা ছিল না ইংরেজের? জানা ছিল। কিন্তু ভারতের ওপর ইংরেজপ্রভুত্ব বজায় রাখতে হলে ঘরোয়া অশান্তি সৃষ্টি করাই হল সাম্রাজ্যবাদী নীতি, সেই নীতির ছকে হিন্দু-মুসলমানকে জড়িয়ে রেখে ইংরেজ সাহায্য করেছিল এই দুই নেশ্যন থিওরিকে শাখা-প্রশাখায় বৃদ্ধি পেতে।

জিন্নাহ্ কংগ্রেস পরিত্যাগ করেছিল। মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুবিধালাভের জন্য দাবি জানিয়ে নিষ্ফল হয়েই, জিন্নাহ্ মুসলীম লীগে যোগ দিয়েছিল। কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষতার ভান করে জিন্নার দাবি স্বীকার না করলেও, যখনই Separate Communal Electorate মেনে নিল, তখনই মুসলীম লীগের উদ্দেশ্য সফল হল এবং কংগ্রেস কার্যত হয়ে দাঁড়াল হিন্দুর প্রতিষ্ঠান, অবশ্য কংগ্রেস কোন সময়েই তা স্বীকার করেনি।

ঘটনাটা ঘটেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়।

ইংরেজ বড়ই বিপন্ন।

কংগ্রেস তখন গায়েগতরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারা ভারতের রাজা, জমিদার, শিল্পপতিরা ক্রমেই ভিড় জমাচ্ছে কংগ্রেসে। মুসলীম লীগেও আমীর ওমরাহদের ভিড়। উভয়পক্ষেই সাধারণ মানুষদের কোন আশ্রয় জোটেনি, অথচ উভয়পক্ষই জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার। বিপন্ন ইংরেজ সাহায্য চাইল উভয়পক্ষের।

কংগ্রেস দাবি জানাল স্বায়ত্ত-শাসনের, ঠিক স্বায়ত্ত-শাসন নয়, শাসন সংস্কারের।

বিপন্ন ইংরেজের প্রয়োজন ভারতের সাহায্য। ইংরেজ বলল, ঠিক আছে। আমরা যুদ্ধ শেষ হলে তোমাদের দাবি নিয়ে বিবেচনা করব। এখন তোমরা সাহায্য কর। এই যুদ্ধের ডামাডোলে শাসন-সংস্কার নিয়ে চিন্তা করার কোন অবসর নেই, এটা তো তোমরা বুঝতে পারছ।

মহানুভব নেতারা বলল, সত্যিই তো। শত্রুও যদি আশ্রয় চায়

তাকে আশ্রয় দেওয়া মানবধর্ম। এই তো হল রামায়ণ-মহাভারতের শিক্ষা। ইংরেজ অতি সদাশয় জাতি, নিশ্চয় যুদ্ধশেষে আমাদের বিষয় বিবেচনা করবে।

এমন সময় একজন দিক্‌পাল আবির্ভূত হল আফ্রিকা থেকে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে। ইনি ঐতিহ্যবান ইংরেজপ্রেমী। আফ্রিকায় যখন বুয়োররা স্বাতন্ত্র্যলাভের সংগ্রাম করছিল, তখন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সাহায্য করতে য়্যাম্বুলেন্স-বাহিনী গঠন করেছিলেন ইনি। ইংরেজসেবার এই ঐতিহ্য বহন করে উনি পুরস্কৃত অথবা তিরস্কৃত, তা' জানা যায় নি। ইনি কংগ্রেসে হাজির হয়েই ইংরেজদের বিবেচনাশক্তির ওপর যথেষ্ট মূল্যদান করলেন, বললেন, ঠিক হ্যায়। এখন ইংরেজ বিপন্ন। এখন তাকে সাহায্য করা ভারতবাসীর কর্তব্য।

ইনি পরবর্তীকালে মহাত্মা নামেই পরিচিত হয়েছিলেন এবং Separate Communal Electorate স্বীকার করে ভারত বিভাগের পথ খুলে রেখেছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে ভারতবিভাগ সম্পন্ন করে ইংরেজ-ভক্তির শেষ উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন।

এই মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় সেপাই সংগ্রহ করে এবং অর্থ সংগ্রহ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইমারতকে আরও শক্ত করে তুলেছিলেন। কিন্তু ঘটনা দাঁড়াল সেই রূপকথার শেয়ালের ঘটনার মত। সারস শেয়ালের গলা থেকে কাঁটা বের করে দিতেই শেয়াল তখন সারসকেই উদরসাৎ করল। ইংরেজের গলার কাঁটা খুলল, কিন্তু স্বায়ত্ত-শাসন এল না। উপরন্ত ভারতীয়দের দাবি নস্যাৎ করে জালিয়ানওয়ালাবাগে নরহত্যার রেকর্ড সৃষ্টি করতে পেছপা হল না।

মহাত্মাকে কিন্তু কেউ প্রশ্ন করল না। ইংরেজসেবার এই পুরস্কার কাদের জন্য জমা ছিল, তা বোধহয় মহাত্মা জানতেন না। তাই তিনি শাসন-সংস্কারের জন্য নূতন পথ আবিষ্কার করলেন।

ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা আমরা করব না।

আমরা কারা? হিন্দুরা। কিন্তু মুসলমান কি করবে?

মুসলমানদের এই আন্দোলনের সামিল করতে হবে। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে এত বেশী পার্থক্য দাঁড়িয়েছে যে, সহজে সেই পার্থক্য মুছে দেবার কোন উপায়ই ছিল না।

হঠাৎ মুসলমানরা মনে করল, আরব-তুরস্কের মুসলমান আর ভারতের মুসলমান ভাইবেরাদার। যেহেতু সবাই মুসলমান, সেজন্য সবাই এক কৌমের অন্তর্গত। তাই তুরস্কের খলিফারা যখন যুদ্ধোত্তরকালে ইংরেজের হাতে নিগৃহীত, তখন তুরস্কের মুসলমানদের জন্য হঠাৎ হৃদয়ে প্রেমের বান ডাকল কিছু মুসলমান নেতার। তারা খিলাফত আন্দোলনে নেমে পড়ল।

কংগ্রেস দেখল, হিন্দু-মুসলমান সবাই যদি খিলাফত আন্দোলনে নামে, তা হলে অসহযোগ আন্দোলনেও মুসলমানরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, অতি নগণ্য সংখ্যক মুসলমান অসহযোগ আন্দোলনের অংশীদার হয়েছে, মুসলমান সমাজ কোনই সাড়া দিল না। ফলে দেখা গেল, চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টি হলে থর মরুতে ধান্য রোপণের মত মূর্খতার পরিচয় দিয়েছে নেতারা।

যে বিষগাছ পুঁতেছিল কংগ্রেস, তারই ফল ধরেছে গাছে। মুসলমান ও হিন্দুকে মারদাঙ্গা করিয়ে ইংরেজ রাজত্ব করবে—এই তো সাম্রাজ্যবাদী নীতি। কায়েমীস্বার্থের এজেন্ট হিন্দু-মুসলমান নেতারা বোধহয় সব জেনেও এই নীতিকে দেখতে পায়নি, অথবা ইংরেজ তাদের উৎকোচ দিয়ে অন্ধ করে রেখেছিল।

অসহযোগ আন্দোলন আংশিক সাফল্যলাভ করল। ইংরেজ শাসন-সংস্কার করল কিছুটা। কিন্তু ভারত-বিভাগের পটভূমিকা দৃঢ় হল।

মুসলমানরা বলেছিল, আমাদের জন্য আইনসভায় আসন নির্দিষ্ট থাকবে। আমরা আইন পরিষদে প্রতিনিধি পাঠাব

কেবলমাত্র মুসলমানদের ভোটে। হিন্দু আলাদা, মুসলমান আলাদা। ভারতের বুকে হিন্দুর স্বার্থ ও মুসলমানের স্বার্থ কখনও এক নয়। প্রকারান্তরে তারা হিন্দু ও মুসলমান দুটো নেশ্যন বলেই দাবি করল।

কংগ্রেস স্বীকার করে নিল এই দাবিকে। অর্থাৎ পরোক্ষ দ্বিজাতিতত্ত্বের স্বীকৃতি আদায় করল মুসলমানরা।

প্রদেশে প্রদেশে আইনসভায় যারা নির্বাচিত হল তারা বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় থেকে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের ভোটে নির্বাচিত। ঘরে-বাইরে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে ইংরেজ আত্মতৃপ্তি লাভ করল। আর যারা এই তত্ত্বকে মেনে নিল, তারা ছিল সারা ভারতের শতকরা চোদ্দজনের প্রতিনিধি, বাকি চুরাশিজনের জন্য এরা গভীর বেদনা ও দুঃখের আস্তানা গড়ে দিয়েছিল। এই চুরাশিজন সেদিন ছিল রাজনীতিতে অজ্ঞ, অর্থনীতিতে পশ্চাদ্পদ, সমাজনীতিতে সামন্ততন্ত্রের মুখাপেক্ষী। তাই এই অপকার্য এড়িয়ে গেল জনসাধারণের চোখকে।

বাংলাদেশে মন্ত্রিসভা গড়ল নির্বাচিত সদস্যরা।

একজন মাত্র জনদরদী মুসলমান ভিন্ন আর সবাই, কি হিন্দু, কি মুসলমান, হল বিশেষ শ্রেণীস্বার্থের রক্ষক। এই মন্ত্রিসভার ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ, কতকগুলো বিভাগের কাজ নিয়েই তাদের তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। এর মধ্যে শিক্ষাবিভাগ ছিল সেই জনদরদী আবুল কাশেম ফজলুল হক সাহেবের হাতে।

ইংরেজ ভারত দখল করামাত্র ভারতীয় হিন্দুরা তাদের ঐতিহ্যকে বজায় রেখে ইংরেজের তাঁবেদারী করতে নামল। ভারতীয় হিন্দুরা দাসত্বকে বেশ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছে চিরকাল। মুসলমানরা ভারত দখল করবার পর চোগাচাপকান গায়ে চড়িয়ে সুলতান-বাদশাহদের ভজনা যেমন করেছে, তেমনি ইংরেজ দেশ দখল করতেই হিন্দুরা কোট প্যাণ্ট টাই লাগিয়ে

ইংরেজ ভজনায় নেমে পড়ল। এটা হল transferring allegiance. হিন্দুসমাজকে পরিচালনা করত অর্থ; যার টাকা ছিল সেই হত সমাজের মাথা। মুসলমান আমলে হিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী শ্রেণী দাসত্ব করেছে অর্থের, সেজন্য তাদের রুচির কোন বালাই ছিল না। সমাজে যাদের ছিল অর্থ, তারা সমাজকে পরিচালনা করত।

কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা একেবারে স্বতন্ত্র। ফিরিঙ্গির কাছে রাজ্য হারিয়ে মনের দুঃখে বনে যাবার উপক্রম। আমীর আর ফকির হল মুসলমান সমাজের সিম্বল, বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী হল হিন্দুরা। ফকির মুসলমানশ্রেণীকে যেভাবে ধর্মের কঠিন বন্ধন দিয়ে রেখেছিল মোল্লা-মওলবীদের মারফত আমীরের দল, সেই বন্ধন ছিন্ন করা সুকঠিন। আমীরদের নির্দেশে মোল্লারা ফতোয়া দিল "অংরেজসে দূরে রহ", "অংরেজি জবান কাফেরী জবান, না-পাক", তাই দেড় শ' পৌনে দুই শ' বৎসরের ইংরেজ রাজত্বেও মুসলমান সমাজে না হয়েছিল শিক্ষার বিস্তার, মুসলমানরা না পেয়েছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীসৃষ্টির সুযোগ। অতি সামান্য সংখ্যক যেসব মুসলমান পশ্চিমী শিক্ষালাভ করেছিল, তারাও তাড়াতাড়ি আমীরের দলে ভিড়তে থাকে বিশেষ সুযোগলাভ করতে। তারাই হল অভিজাত; কিন্তু সাধারণ মুসলমানরা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে গেল।

ফজলুল হক বুঝলেন এই অজ্ঞ মানুষদের অবস্থা। তিনি বুঝলেন, হিন্দুরা যে এগিয়ে চলেছে তার কারণ তাদের শিক্ষালাভে অকুণ্ঠ চেষ্টা। মুসলমান সমাজকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে পশ্চিমী শিক্ষায়। মসজিদের যে মক্তব তাতে যে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়, তাতে ধর্মশিক্ষার চেয়ে অধর্মশিক্ষা বেশি হয়, কারণ অল্পশিক্ষা সব সময়ই অশিক্ষার চেয়েও ভয়ঙ্কর ও ভীতিপ্রদ। হকসাহেব মুসলমানদের আহ্বান জানালেন লেখাপড়া শিখতে। অবশ্য হিন্দুদের বাধা দিলেন না শিক্ষালাভে।

মুসলমানদের শিক্ষা প্রসারে হক সাহেব যে একাই চেষ্টা করেছেন, এটা কিন্তু ঠিক নয়। বাঙলার হিন্দু বড় বড় জমিদাররা নিজেদের এলাকায় বহু উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যথেষ্ট সাহায্যও করেছিল। অভিজাত সামন্ততন্ত্রী শোষকরা মাঝে মাঝে যে-সব বদান্যতার উদাহরণ স্থাপন করেছিল, তার মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপন অন্যতম। এইসব বিদ্যালয় হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। অবশ্য ইংরেজ রাজত্বের শেষ দিন অবধি মুসলমান ছাত্রসংখ্যা হিন্দুদের তুলনায় অনেক কম ছিল।

শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সমাজ আত্মসচেতন হল। তারা বাইরে এসেই দেখতে পেল সরকারী কর্মক্ষেত্রের সর্বত্র হিন্দুরা চেপে বসে আছে। তাদের জন্য বিশেষ কোন সুযোগসুবিধা নেই।

দেখা দিল অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব।

নেতারাও এই সুযোগের অপেক্ষা করছিল। তারাও মুসলমান সমাজের জন্য বিশেষ দরদী হয়ে উঠল। এইসব নেতাদের টিকি-বাঁধা কায়েমী স্বার্থে, তারা সেদিন চিন্তাও করেনি তারা যে পাপের পথ খুলে দেবে, সেই পাপ তাদের গ্রাস করবে ভবিষ্যতে। ভবিষ্যৎ চিন্তা না করেই হিন্দু-মুসলমানের বিভেদকে আরও তীব্রতর করে তুলতে সচেষ্ট হল। বাঙলাদেশে এই বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করতে বাঙ্গালী মুসলমানদের চেয়েও অবাঙ্গালী মুসলমানরা নেতৃত্ব দিতে মোটেই ভুল করল না, যার ফলে ধর্মান্ধ মুসলমানরা ভুলে গেল নিজেদের ভারতীয় বলে চিন্তা করতে; তারা কতকগুলো কায়েমী স্বার্থসর্বস্ব মানুষের হাতে ক্রীড়নক হয়ে উঠল।

এই পটভূমিকায় যে সাম্প্রদায়িকতা গ্রাস করেছিল মানুষের বিবেক, তার কাহিনী বলতে গেলে শিউরে উঠতে হবে।

সেদিন সলিল সেন আর বীরেনবাবুকে ভারতের বর্তমান দুর্ভাগ্যের পটভূমিকার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বললাম, হিন্দু-

বিদ্বেষের সবচেয়ে বড় কারণ হিন্দুর অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য। এই স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করতে তারা যেভাবে দরিদ্র মানুষদের শোষণ করেছে, তার কোন ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। যদি কোন দিন তা লেখা হয়, তবে তা কোনমতেই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের মনোরঞ্জন করবে না। দরিদ্র মানুষ সবাই তো মুসলমান ছিল না, কিন্তু গরিষ্ঠ সংখ্যাই ছিল মুসলমান। শোষিত মানুষের ক্ষোভ যেখানে শ্রেণী-সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়, সেখানে দুষ্টবুদ্ধি মুসলীম নেতারা ধর্মের জল ছিটিয়ে তাকে এমন ঘৃণ্য হিন্দুবিদ্বেষে রূপান্তরিত করেছিল, যার ফলে শোষক হিন্দুরাই নয়, শোষিত হিন্দুদেরও ওরা শত্রু মনে করতে শিখেছিল।

সলিল সেন বলল, তাহলে হিন্দুবিদ্বেষকে তুমি শ্রেণীসংগ্রামের একটা স্তর বলে মনে কর?

বললাম, না ভাই। শ্রেণীসংগ্রামে দুটো শ্রেণী থাকে, একটা শোষিত, আরেকটা শোষক। এখানে শোষিত শ্রেণীকে ধর্মের নামে দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন সাম্প্রদায়িক শোষকশ্রেণী অপর সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার করার অবাধ সুযোগ দিয়েছিল, যার ফলে কোন শ্রেণী-সংগ্রাম গড়ে উঠেনি। যদি শ্রেণী-সংগ্রাম গডে উঠত, তাহলে কস্মিনকালেও ভারতবিভাগ সম্ভব হত না। তবে শোষিত মানুষদের চেহারা চিনতে বেশি দেরি হয় নি, যার ফলে আজ রক্তের বন্যা বয়ে চলেছে বাঙলা দেশে।

বীরেনবাবু বলল, আগে হিন্দুরা শোষণ করত, এখন তাদের ভাইবেরদাররা শোষণ করছে। আজ তো আর হিন্দু তাদের শত্রু নয়। সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তুলে শোষিতদের বঞ্চনা করার পথ খুলে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। আজ বঞ্চিত মানুষ বুঝতে পেরেছে, কিভাবে ধর্মের বুলি শুনিয়ে দূরদেশী এক শ্রেণীর সামান্য কয়েকজন লোভী কায়েমীস্বার্থের মানুষ তাদের শোষণ করছে। তারই প্রতিক্রিয়া হচ্ছে।

বললাম, ঠিক বলেছেন বীরেনবাবু। আজ লড়াইয়ের গতি অন্য রকম। তাতেই 'কিন্তু' আছে।

এতে আবার 'কিন্তু' কোথায় দেখলেন কালাচাঁদবাবু?

আজ যারা লড়াই করছে, তাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মুসলমানদের মধ্যে যে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে বিগত বিশ-পঁচিশ বছরে, সেই বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তদের হাতে আছে নেতৃত্ব। যার ফলে বাঙ্গালী জাতীয়তাবোধের প্লাবন এসেছে, সেই প্লাবন নীচের তলায় কতটা পোঁছেছে তাও দেখতে হবে। যদি নীচের তলায় না পোঁছয়, তাহলে যদি বাঙলাদেশ মুক্ত হয়, তাহলে গোপনে আরেকটি শোষকশ্রেণী গজাবে জাতীয়তার নামাবলী গায়ে দিয়ে।

কিন্তু পাকিস্থানীদের মনে করা হচ্ছে দখলদার। তাদের তাড়িয়ে দিতে হলে জাতীয়তাবোধের জাগরণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রত্যেক বাঙ্গালী যদি অবাঙ্গালী প্রাধান্য ও প্রভুত্ব না চায়, তাহলে জাতীয়তাবোধের জাগরণ অনিবার্য নয় কি? চীনের যুদ্ধ ছিল গৃহযুদ্ধ। চীনাদের একশ্রেণীকে উৎখাত করে চীনাদের আরেক শ্রেণী ক্ষমতা দখল করার লড়াই করেছিল। এখানে এটা হল মুক্তিযুদ্ধ; বিদেশীর হাত থেকে মুক্ত হতে হলে, জাতীয়তাবোধ উগ্র না হলে তা সম্ভব নয়। ভিয়েতনামে এই উগ্র জাতীয়তাবোধ ফরাসীদের বিতাড়িত করেছিল, এখানেও পাকিস্থানীদের বাঙ্গালীরা একইভাবে বিতাড়িত করবে।

আমি আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু ফরাসীদের সঙ্গে লড়াই করতে যারা এগিয়ে এসেছে, তারা সাধারণ মানুষ। অর্থাৎ সেটা ছিল Peoples' War, বাঙলাদেশে Peoples' War, যতদিন না হচ্ছে ততদিন সত্যিই মুক্তি আসবে কিনা সেটাও ভাবতে হবে। যখনই এই যুদ্ধ পরিণত হবে জনযুদ্ধে, তখনই নেতৃত্বের বদলও হবে, নইলে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী যে-কোন সময় সামান্য

সুযোগ-সুবিধালাভ করলে মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করেও দিতে পারে।

বীরেনবাবু বলল, সবই 'যদি', আমরা 'যদি'-র হাত থেকে বাঁচতে পারি, যদি সরজমিনে রণক্ষেত্র পরিদর্শন করি এবং বাঙলার বাস্তব অবস্থা স্বচক্ষে দেখে আসতে পারি।

বললাম, এ বিষয়ে আমি আগ্রহী, কিন্তু আপনি কি সত্যিই সরজমিন তদন্তে যেতে পারবেন ?

বীরেনবাবু বলল, এবিষয়ে হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। পরিস্থিতি বিবেচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সলিল সেন বলল, আমি যেতে রাজি কিন্তু তার আগে আমাদের স্থির করতে হবে আমাদের যাওয়ার উদ্দেশ্য কি ? উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কোন গুরুতর কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত কিনা।

বললাম, সলিল ঠিকই বলেছ। আমাদের মনে রাখতে হবে বাঙলাদেশে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পর কোন যুদ্ধ হয়নি। সে যুদ্ধও বর্তমান যুগে কলকাতার ছয়চল্লিশ সালের ষোলই আগস্টের দাঙ্গার চেয়ে এমন কিছু বড় ঘটনা নয়। বর্তমান কালের যুদ্ধ হল ধ্বংসের প্রতীক। এই বাঙলার মানুষ যেমন যুদ্ধ সম্বন্ধে অজ্ঞ, ওই বাঙলার মানুষও তেমনি অজ্ঞ। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পেশাদার ফৌজের লড়াই যে কতটা ভয়াবহ ও মারাত্মক, সে জ্ঞান আমাদের নেই। সেজন্য যুদ্ধের ভয়াল অবস্থা আমাদের দেখতে হবে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে।

বীরেনবাবু বলল, সে তো ঠিকই। আর কোন উদ্দেশ্য কি থাকবে না ?

নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য থাকবে। যুদ্ধ হল জয়-পরাজয়ের টানাপোড়েন। আমার বীজগণিতের ফরমূলাটা মিলিয়ে দেখতে হবে। তার জন্য প্রথম প্রয়োজন, জনসাধারণের মনোবল যাচাই করা, দ্বিতীয়

প্রয়োজন হল যোদ্ধাদের ও নেতাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করা। এই তিনটি কাজ করতেই আমরা যাব সেখানে।

বীরেনবাবু বলল, ব্যাপারটা বড়ই গুরুতর। আমরা কি পারব এই কাজ সম্পন্ন করতে ?

বললাম, অবশ্যই পারব। সেই সঙ্গে আমরা যতটা ওদের সাহায্য করতে পারি তাও করব। কে আমার সঙ্গী হবে ?

বীরেনবাবু প্রথম প্রস্তাব দিয়েছিল সরজমিন তদন্ত করার, কিন্তু দেখা গেল বীরেনবাবু কোনক্রমেই সঙ্গী হতে রাজি নন। সলিলও মনস্থির করতে পারছিল না।

এমন সময় সংবাদপত্র হাতে করে বিনয় বোস এসে হাজির। কাগজ নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়লো। বীরেনবাবু অভিনিবেশ সহকারে পড়তে পড়তে বলল, এই দেখ আমাদের সরকারের অভিমত। সরকার বলছে, সীমান্তের ওপারে পিক্‌নিক্ ম্যুডে কেউ যেন না যায়। যুদ্ধ হল মৃত্যু ও ধ্বংস। তাকে লঘু করে দেখতে নিষেধ করেছে। সীমান্তরক্ষীদের নির্দেশ দিয়েছে কাউকে যেন যেতে না দেওয়া হয় এপার থেকে ওপারে।

সলিল সেন কাগজ থেকে মুখ তুলে বলল, অনেক চ্যাংড়া ছোকরা ওপারে গিয়ে উৎপাত করছে, এমন সংবাদও আসছে। ওপার বাঙলার মানুষকে আমরা সাহায্য না করে যদি উৎপাত করি, তাহলে সরকার যাতায়াত বন্ধ করতে বাধ্য। বিশেষ করে ভারতীয়দের বিপদ ঘটতে পারে যে-কোন সময়।

দুজনেই কাগজ পাঠ শেষ করে বলল, তাহলে আর গিয়ে কাজ নেই।

বললাম, আমরা সংবাদ পাচ্ছি যে-সব সংবাদপত্রের মারফত, তাদের চরিত্র আমাদের জানা আছে। ভারতীয় সংবাদপত্র যখন কোন সংবাদ ফলাও করে প্রচার করে, তখন সন্দেহ হয় এর পেছনে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য আছে। নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক

হত্যাকাণ্ডের সংবাদ থাকত প্রথম পৃষ্ঠায়। এই হত্যাকাণ্ড দিয়ে প্রমাণ করত ঘাতক যারা তারা বামপন্থী; সেই বামপন্থী, বিশেষ করে মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের পরাজিত করে কংগ্রেসকে সিংহাসনে বসাবার এটা একটা চক্রান্ত মাত্র। যেমন নির্বাচন শেষ, অমনি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সংবাদ স্থান পাচ্ছে ভেতরের মূল্যহীন সংবাদের সঙ্গে। মার্কসবাদীরা পরাজিত না হলেও তাদের জব্দ করেছে সরকার গঠন করতে না দিয়ে—এটাই হল কাগজওলাদের সাফল্য। সেইজন্য আর কুৎসা কেচ্ছা করার দরকার নেই। তেমনি যেভাবে সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে যুদ্ধটা কোন একটা শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ, ঠিক জনতার যুদ্ধ নয়। সেজন্য সরজমিনে দেখা দরকার, সত্যিই যুদ্ধের প্রকৃত চরিত্র কী।

সলিল সেন বলল, তোমার কথা মেনে নিচ্ছি। এই প্রচার-ব্যবস্থার পেছনে অযৌক্তিক পাকিস্থান সৃষ্টির অসারতা প্রমাণ করাও তো হতে পারে। দ্বিজাতিতত্ত্বটা যে ভুয়ো এবং ধর্ম যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করতে পারে না, সেটাই বিশ্বের সামনে তুলে ধরাও তো উদ্দেশ্য হতে পারে।

বললাম, এগুলো অস্বীকার করছি না। এদেশ থেকে যেসব সাংবাদিক ওদেশে গেছে, তাদের কারুরই যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। আবেগের প্রাচুর্যে বড় বড় কথা বলবে, লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে রাজনৈতিক ভাষ্য লিখবে। তা দিয়ে ঘটনাকে বিচার করা যাবে না।

সলিল বলল, ওদের অনেকেরই ভাষ্য ও বিশ্লেষণ খুবই হৃদয়গ্রাহী। বিশেষ করে কোন কোন সংবাদপত্রের রাজনৈতিক ভাষ্যকারের।

বললাম, ও রকম ভাষ্য আমার কুকুরটাও লিখতে পারত। তার লেখার ক্ষমতা নেই; কিন্তু যারা ঐসব কথা লেখে তারা আমার গৃহপালিত কুকুরের মত প্রভুভক্তি দেখায়। ঘটনার আসল চিত্র

তা থেকে জানা যায় না বরং আরও ঘোরালো হয় আসল ঘটনা। সেজন্য দেখে আসা দরকার।

যতই যুক্তিতর্ক হাজির করি না কেন, বীরেনবাবু ও সলিল সেন সরজমিন তদন্তে যেতে মোটেই সাহস সঞ্চয় করতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে আমার কাছে সংবাদ পাঠাল।

সলিল সেন সদ্য বিবাহিত। তার ইচ্ছা থাকলেও তার স্ত্রী সহজে রাজি হতে পারে না, এটা আমি বুঝতে পারি। বীরেনবাবু বয়স বৃদ্ধির অজুহাতে এই ঝুঁকি নিতে সাহস পেল না।

নতুন সঙ্গীর সন্ধান করার আগেই হাজির হল অমল সরকার। আগমনটা নেহাত সৌজন্যমূলক। আমার সঙ্গে কথা বলার আগে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার আসর জমিয়ে নিয়েছিল। আমি ভেতর মহলে হাজির হতেই অমল হেসে বলল, বউদি বলছিল, আপনি নাকি বাঙলাদেশের যুদ্ধ দেখতে যেতে চান?

বললাম, ইচ্ছা তো ছিল কিন্তু সঙ্গী পাচ্ছি না বলেই যাওয়া হচ্ছে না।

আমি যাব। আপনার আপত্তি আছে কি?

মোটেই নয়। তবে আমাকে ফেলে পালাবে না তো? রোয়াকবাজি অথবা পাড়ায় পাড়ায় গুণ্ডাবাজি আর যুদ্ধ কিন্তু এক বস্তু নয়। এসব ভেবেচিন্তে মত দিও ভাই।

সব ভেবেই বলছি। এই তো কলকাতা শহরে আগে ছুটো-একটা বোমা ফাটলে লোকে ছুটোছুটি করত। এখন তো দেখছো হরবখত বোমা ফাটছে, মানুষ মরছে, তবুও মানুষ কাজ করে চলেছে। যুদ্ধটাও তাই। প্রথম দিকে মানুষ ত্রাসের শিকার হবে। অবশেষে গা-সহা হয়ে যাবে। যারা পালিয়ে আসছে, তারা আর পালাবে না, তারা সাময়িক নিরাপদ আস্তানা খুঁজে

নেবে, আবার গুলীগোলা বন্ধ হলে স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে তাল ঠুকে পা ফেলবে। এটাই অনিবার্য পরিণতি।

বললাম, তুমি তো ঘটনাগুলো বেশ রপ্ত করে ফেলেছ দেখছি।

ঘটনা দেখেই তো ঘটনার গতি স্থির হয়। আমিও তা স্থির করেছি কালাচাঁদ-দাদা। মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে কেন এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড, কেন এই পরিণতি! কে এবং কারা এই অবস্থার সৃষ্টি করল। এ সব ভেবে কোন কূলকিনারা পাচ্ছি না।

বললাম, ভারত বিভাগটা স্বতঃসিদ্ধ করে তুলছিল এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই। তবুও আশা ছিল, বাঙলার মানুষ হিন্দু হোক্ আর মুসলমান হোক্, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া কাজিয়া করবে, আবার নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে বাস করবে। তা হয়নি। হবার সুযোগও দেয় নি ভারতের অবাঙ্গালী নেতারা। এইসব নেতা যে-কোন সম্প্রদায়ের হোক, মূলতঃ তারা হল কায়েমীস্বার্থের এজেন্ট। তারা বুঝেছিল, পুঁজিস্বার্থ বজায় রাখতে উভয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব একটা অঞ্চল দরকার। এই অঞ্চলে কেবলমাত্র ধর্মের নামে অবাধ শোষণ কায়েম রাখা হল তাদের কাজ। যদি উভয় সম্প্রদায় একই অঞ্চলে শোষণ কায়েম করতে চায়, তার পরিণাম পুঁজিবাদীদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীরা শোষণ করে, আবার শোষকদের মধ্যেও বৈরিতা সৃষ্টি করে। ইংরেজ পুঁজিবাদী স্বার্থ আর জার্মান পুঁজিবাদী স্বার্থের সংঘাত—দুই দুটো বিশ্বযুদ্ধে ডেকে এনেছে। কিন্তু তেমনি ভাবে সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে, তার আকার প্রকার যাই হোক, তখন সংঘর্ষ এড়াতে পারবে না। যদি ভারত-পাকিস্থানের দীর্ঘস্থায়ী লড়াই কখনও হয়, তখনও এই একই কারণে তা হবে।

এই অবস্থা তো একদিনে সৃষ্টি হয় নি।

তা হয়নি অমল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর মানচিত্রে যে পরিবর্তন এসেছে, তা ছিল অনিবার্য। সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদী

হল ইংরেজ। তারা যুদ্ধের পর হিসাব করতে বসেই দেখে জমার ঘর শূন্য, খরচের ঘরে তাদের সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব। সাম্রাজ্য রক্ষার চেয়ে গৃহরক্ষাই তখন তাদের সমস্যা। বেনিয়া ইংরেজ বুঝল, সাম্রাজ্য রক্ষা আর সম্ভব নয়। আরও বুঝল, পৃথিবীর পদানত জাতিরা ক্রমেই কম্যুনিজমের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। মালয়ে গোলমাল, বর্মায় গোলমাল, ইন্দোচীনে গোলমাল, আবার ইতালিতে গোলমাল, গ্রীসে গোলমাল,—এর পরিণতি হল শুধু সাম্রাজ্য হারানো নয়, এর পরিণতি হবে পুঁজিবাদী স্বার্থহানি। সাম্রাজ্য যায় যাক্, কিন্তু তাদের পুঁজিস্বার্থ যদি নষ্ট হয়, তাহলে রুটি-রুজির অভাব হবে।

অমল বলল, পুঁজিস্বার্থ টাই তা হলে বড় ?

নিশ্চয়। ইংরেজ তৃতীয় শ্রেণীর শক্তি। সাম্রাজ্য রাখার জন্য বলপ্রয়োগ করলে তার কোটি কোটি টাকার মূলধন যে খাটছে তার সাম্রাজ্যে তা ধ্বংস হবেই। ভারত সাম্রাজ্য রাখা যাবে না তাও বুঝেছিল। নৌ-বিদ্রোহ, আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচার নিয়ে জনজাগরণ, কলে কারখানায় যুদ্ধোত্তর উৎপাদনের হ্রাসের হিড়িকে অনবরত ধর্মঘট, প্রশাসনের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পরস্পরের যে অবিশ্বাস ও ঘৃণা, এই সব থেকেই বুঝতে পেরেছিল ইংরেজকে বিদায় নিতেই হবে। ইংরেজ তখন বশম্বদ খুঁজছিল। এই বশম্বদের হাতে ক্ষমতা দেবার জন্য ইংরেজ খুবই ব্যস্ত।

কম্যুনিস্ট পার্টি ইংরেজকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাহায্য করেছিল, তাদের হাতে ক্ষমতা কেন দিল না ?

বললাম, কম্যুনিজম হল সাম্রাজ্যবাদীদের বড় শত্রু। যুদ্ধের সময় রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইংরেজ জাপানের সঙ্গে লড়াই করছিল। রাশিয়া আক্রান্ত না হলে হয়ত এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অংশ-গ্রহণ করত না। কিন্তু রাশিয়াতে যারা লড়াই করছিল তারা হল রাশিয়ার আপামর জনসাধারণ, অর্থাৎ তা ছিল জনযুদ্ধ।

ভারতীয় কম্যুনিস্টরা তখন ছিল রাশিয়ার অন্ধ সেবক। তারাও মনে করল যেহেতু রাশিয়া এই যুদ্ধে জড়িত, ভারতেরও সেজন্য এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা উচিত। এটাও ভারতের জনযুদ্ধ।

অমল বাধা দিয়ে বলল, রাশিয়া একটি স্বাধীন দেশ। তার দেশের যুদ্ধ স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ। সেখানকার যুদ্ধ জনযুদ্ধ হতে বাধ্য ; কিন্তু পরাধীন ভারতে এই যুদ্ধ তো কোনক্রমেই জনযুদ্ধ হতে পারে না। পরাধীনতাকে কায়েম রাখতে কোন দেশেই জনযুদ্ধ হতে পারে না। স্বাধীনতা লাভের জন্য, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জনযুদ্ধ হতে পারে।

তোমার কথাই ঠিক। কম্যুনিস্ট পার্টি এই সামান্য সহজ সত্যটি কেন বুঝতে পারে নি তার যুক্তি আজও কম্যুনিস্ট পার্টি দিতে পারে নি। তবে তারা হয়ত আশা করছিল, যুদ্ধোত্তর কালে তাদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে যাবে ইংরেজ। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হতেই ইংরেজ কোন ক্রমেই তাদের বন্ধু মনে করতে পারল না, আর কম্যুনিস্ট পার্টির এই জনযুদ্ধের জিগীর কোন ক্রমেই ভারতীয় জনতার সমর্থন লাভ করে নি। ইংরেজের স্বার্থ কোন ক্রমেই কম্যুনিস্ট পার্টির হাতে নিরাপদ নয়। পুঁজিবাদের এজেণ্ট কংগ্রেসই হল একমাত্র উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান যার হাতে ক্ষমতা তুলে দিলে কোনক্রমেই ইংরেজ বিপন্ন হবে না। তবুও ইংরেজ আশ্বস্ত হতে পারল না। ভবিষ্যতে কংগ্রেসেও প্রগতিবাদী লোকের ভীড় জমতে পারে, তখন ইংরেজও বিপন্ন হবে ; তার রুটি-রুজিতে টান পড়বে। বিগত তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে ইংরেজ হিন্দু-মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়িয়েছে, তার সুফল পাওয়ার সময় সমাসন্ন। ইংরেজ মুসলীম লীগকে উস্কে দিল পাকিস্থানের দাবি জোরদার করতে।

অমল প্রশ্ন করল, ভারতের সব প্রদেশে তো মুসলমান গরিষ্ঠ নয়? তাতে কি লাভ হবে?

আর কারও লাভ না হলেও ইংরেজের লাভ হবে। মুনাফা

ঘরে নিতে পারবে। আর কৃত্রিম অবৈজ্ঞানিক এবং মিথ্যাচারপূর্ণ পাকিস্থান আর ভারতের মধ্যে যতদিন ঝগড়া-ক্যাজিয়া থাকবে, ততদিন ইংরেজস্বার্থ মোটেই বিপন্ন হবে না উভয় দেশে। ইংরেজ জানে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রে কস্মিনকালেও কম্যুনিস্টরা ক্ষমতা দখল করতে পারবে না, সেজন্য পশ্চিমী গণতন্ত্রকে চাপিয়ে দেবার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলল।

কিন্তু পাকিস্থানে তো গণতন্ত্র চালু করতে পারে নি। সেখানে স্বৈরাচারী সামরিক জুনটাই শাসন চালাচ্ছে।

একই কথা। ফ্যাসিস্ট জঙ্গীবাদীরা সাম্রাজ্যবাদীর দোসর এবং পুঁজিবাদের রক্ষক। তাদের হাতে ইংরেজস্বার্থ সুরক্ষিত থাকবেই। এটা বুঝতে কোন অসুবিধা থাকলেও তার আসল চেহারা বর্তমানে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। যাক্ ওসব কথা। তুমি দয়া করে মনস্থির কর, কবে কি ভাবে বাঙলা দেশে যাবে। আর কেউ আমাদের সঙ্গে যাবে কিনা তাও স্থির কর।

অমল বলল, অনেকেই যেতে চায়। অনেকেই তো যাচ্ছে।

অনেকের যাওয়া আর আমাদের যাওয়া আলাদা। আমরা এক্সকারসনে যাব না। এতে জীবনের রিস্ক্ আছে। এসব ঝুঁকি নিয়ে যে যেতে পারে, এমন লোক বেছে নিতে হবে।

তা হলে এই অমলচন্দ্র বিনা অন্য কাউকে পাব কিনা বলা মুস্কিল। দরকার কি বেশি লোক নিয়ে। আমরা দুজনেই যাব। বললাম, না হে না। আরও একজন দরকার। সংবাদ আদান-প্রদান, যোগাযোগ রক্ষা করতে দুজন যথেষ্ট নয়। চারজন হলেই ভাল হয়। অন্তত তিনজন। তুমি আরেকজনকে খুঁজে দেখ।

আমরা কিন্তু হরিদাসপুর হয়ে যাব না। ওখানে খুবই ভিড় জমছে। সহজ নিরাপদ পথ আমাদের দেখতে হবে।

অমল বাঙলাদেশের ম্যাপ হাজির করল।

উল্টেপাল্টে বললাম, সীমান্ত সর্বত্রই নিরাপদ মনে হচ্ছে তবে স্কেল মেপে দেখতে হবে কোন পথে সবচেয়ে কম পরিশ্রমে বাঙলা দেশে প্রবেশ করা যায়।

ম্যাপ দেখতে দেখতে অমল বলল, মালদহ জেলাই উপযুক্ত। নদীয়া জেলা দিয়েও যাওয়া সহজ।

আমাদের নতুন সহচর অবিনাশ বলল, কেষ্টনগর চলুন। সেখান থেকে আমরা খুঁজেপেতে পথ বের করব। শুনছি করিমপুর থেকে বাঙলা দেশের দূরত্ব দু-আড়াই মাইল।

অমল সমর্থন জানাল। আমিও সম্মত হলাম।

রাতের ট্রেনে চলতে চলতে অবিনাশ বলল, দেশের বড় শত্রু হল মুসলীম লীগ।

হেসে বললাম, ও কথা ভুলে যাও অবিনাশ। বর্তমানে কংগ্রেস কম্যুনিস্ট সবাইয়ের বড় বন্ধু হল মুসলীম লীগ। যে মুসলীম লীগ জাতীয় জীবনে দুঃখ-দুর্দশা স্থায়ী অশান্তি এনে দিয়েছে, তাদের গলায় মালা দিয়ে কংগ্রেস আবার তাদের রাইটার্স বিলডিং-এর গদীতে বসিয়েছে।

অমল বলল, বর্তমান সংবিধান অনুসারে চলতে হলে লীগ আর বিষদাঁত ফোটাতে পারবে না।

সেটাও ঠিক। কিন্তু কিছু কিছু হিন্দু তো আবার সাম্প্রদায়িকতার শিকার হবে।

অবিনাশ বলল, এদের সংগঠন এত ছোট, বর্তমানে কিছুই হবে না। বড়জোর মন্ত্রীর গদী পেতে কেউ কেউ অনুকম্পা বোধ করবে এইসব বেচারাদের জন্য।

বললাম, এক সময় এটাই মনে করেছিল কংগ্রেস। সেবারও মুসলীমতোষণ করতে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িকতার নোংরা প্রতিষ্ঠান মুসলীম লীগের চাঁদতারা মার্কা পতাকাতলে ঠেলে দিয়েছিল কংগ্রেস। এই বাংলাদেশের কথাই শোন। সাঁইত্রিশ

৩

সালে সীমিত সংখ্যক ভোটারের ভোটে যারা বাংলার বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সবাই কিন্তু মুসলীম লীগের মনোনীত প্রার্থী ছিল না। বরং নির্বাচিত মুসলমানদের মধ্যে তারা সংখ্যালঘু ছিল। গরিষ্ঠ কৃষক-প্রজা দল। তাদের নেতা ছিলেন ফজলুল হক। রাজনীতির খেলায় এবং বাঙলার প্রতি কংগ্রেসের বিমাতৃসুলভ ব্যবহারে এবং বাঙলাকে নেতৃত্ব করতে না দেবার চক্রান্তে বাঙলাদেশ পরিণত হয়েছিল মুসলীম লীগের সুদৃঢ় দুর্গে।

শুনেছি ফজলুল হক ছিলেন প্রধান মন্ত্রী।

ছিলেন কিন্তু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা তার দলের থাকলেও সরকার গঠনের মত গরিষ্ঠতা ছিল না। মন্ত্রিসভা তথা সরকার গঠন তখন সম্ভব হচ্ছিল না। ইংরেজ তার পশ্চিমী পোকা-খাওয়া গণতন্ত্রের মহিমা প্রচারের জন্য লঘিষ্ঠ দলকে দিয়েও সরকার পরিচালনা করবে স্থির করল। রক্ষাকবচ হল গভর্ণরের 'ভেটো' ক্ষমতা। ফজলুল হক দেখলেন এই সুযোগ হারালে লঘিষ্ঠ মুসলীম লীগ সরকার গঠনে এগিয়ে যাবে। ফজলুল হক নেমন্তন্ন করলেন কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভার অংশীদার হতে। কংগ্রেস তখন মন্ত্রি-সভায় যোগ দিতে রাজি হল না। কেন হল না সেটা ইতিহাসের কথা। কিন্তু ফজলুল হক আর অপেক্ষা করলেন না। মুসলীম লীগ আর হিন্দু কায়েমী স্বার্থকে ডেকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।

কংগ্রেস তো বিভিন্ন রাজ্যে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিল।

করেছিল, কিন্তু কিছুকাল পরে। তখন বাঙলার সর্বনাশ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। বাঙলার কংগ্রেস হল বিরোধী দল। মুসলীম লীগের প্রভাব ছিল কম। মুসলীম লীগ সুযোগ পেল শোষিত মুসলমানদের মাঝে প্রচার করতে। তারা শ্রেণীসংগ্রাম চায় না, কারণ মুসলীম লীগ হল নবাব-আমীরদের প্রতিষ্ঠান। তারা এই

সুযোগে অশিক্ষিত শোষিত মুসলমানদের মাঝে হিন্দুবিদ্বেষ ছড়িয়ে দেবার সুযোগ পেল। গায়েগতরে ফেঁপেফুলে উঠল। ফজলুল হক বুঝতে পারলেন, এমন কি লীগের সঙ্গে যে মন্ত্রিসভা গড়েছিলেন তা ভেঙ্গে দিলেন। কিন্তু খুবই বিলম্ব হয়ে গেছে তখন। কংগ্রেসী হাই কম্যাণ্ড বাঙলাদেশে মুসলীম লীগের দুর্গ গড়তে পরোক্ষে মদত জোগাল। যা ছোট ছিল তা বৃহৎ হল।

কিন্তু ধর্ম দিয়ে তো রাজনীতির গতি ও প্রকৃতি কোন দেশেই নিরূপিত হয় না।

হয় না ঠিকই, কিন্তু সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে দেশের সমূহ ক্ষতি করে, তাও তো ঠিক। এর উদাহরণ হল ফজলুল হক স্বয়ং। ছয়চল্লিশ সালের নির্বাচনে ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা দল সুবিধা করতে পারল না। অথচ মুসলীম লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল মুসলমানদের মধ্যে। ফজলুল হককে ডুবতে হল কংগ্রেসের অবিমৃষ্যকারিতায়। আর তারই ফল ভুগছে দুই বাঙলার মানুষ। ওখানে উর্দু সাম্রাজ্যবাদ, এখানে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ। আজ যে মুসলীম লীগকে আবার কবর থেকে তুলে এনে কংগ্রেস গদীতে বসিয়েছে, তারাই ভবিষ্যতে কংগ্রেসকে কবরে যদি পাঠায়, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। উপরন্তু চিন্তা করতে হবে, ভারতে মুসলীম লীগ যে আবার মাথাচাড়া দিয়েছে, তার পেছনে পাকিস্থানীদের কতটা হাত আছে। ভারত ও পাকিস্থানের দ্বন্দ্ব জিইয়ে রাখতে পারলে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের যেমন সুবিধা, ভারতের অভ্যন্তরে হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ জিইয়ে রাখতে পারলে পাকিস্থানেরও তেমনি সুবিধা। তার প্রমাণ আমি তোমাদের সামনে হাজির করতে পারি। বাঙলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধ ভারতের মুসলমানরা ঠিক গ্রহণ করতে পারছে না। অর্থাৎ এদেশে যে-সব মুসলমান আছে, তাদের গরিষ্ঠ সংখ্যাই পাকিস্থানের সমর্থক, শুধু তাই নয়, পশ্চিম পাকিস্থানী জঙ্গীবাজদের দাসত্ব করতে বাঙালী

মুসলমানদের যে কিছু বাধ্যবাধকতা আছে, সেটাও তারা মেনে নিয়েছে। ভারতের এইসব মুসলমানদের পাকিস্থান-প্রীতি নিশ্চয়ই তাদের ভারতীয় চরিত্রের আদর্শ নয়। বিশেষ করে অ-বাঙলাভাষী মুসলমানদের বিরাট অংশই বাঙলার স্বাধীনতা-যুদ্ধের বিরোধী, পশ্চিমবঙ্গে বাঙালী মুসলমানদেরও বিরাট অংশ এই স্বাধীনতা-যুদ্ধ সমর্থন করছে না।

অমল বলল, বাঙলার মানুষদের আর পশ্চিম বাঙলার মুসলমানদের মানসিক গঠন আলাদা। বাঙলাদেশে বিগত বিশ-পঁচিশ বছরে যে জাতীয়তাবোধ জেগেছে, তা ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিম বাঙলায় জন্মায় নি। পশ্চিম বাঙলার ঐসব মুসলমানরা ভারতে বাস করলেও, তাদের নাড়ীর টান রয়েছে পাকিস্থানের দুষ্ট সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে। উপরন্তু নানা দল উপদলের দেশ পশ্চিম-বঙ্গে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার কোন চেষ্টাই হয় নি। এ ছাড়াও, চোরা পাকিস্থানীতে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত ভরতি। ভারতে অমার্জনীয় অপরাধ ঘটিয়েও তারা আশ্রয় পেত পূর্ববঙ্গে, স্বাধীন বাঙলায় সে সুযোগ পাবে না। উপরন্তু পশ্চিম বাঙলার বহু মুসলমানের দুই বঙ্গেই ঘর আছে। বাঙলাদেশে ওরা মুসলমান, আর ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে ওরা লঘিষ্ঠ-সংরক্ষণের অজুহাতে ডালপালা মেলে বহাল-তবিয়তে আছে। এটাতেও অসুবিধা। আবার চোরাকারবারের এই অভূতপূর্ব সুযোগটাও তাদের হাতছাড়া হবে। এসব কারণেই গরিষ্ঠ সংখ্যক ভারতে বসবাসকারী মুসলমান বাঙলাদেশের স্বাধীনতালাভের বিরোধী। এমন কি, সরকার যে বাঙলাদেশকে নৈতিক সমর্থন জানাচ্ছে, তারও বিরোধী। বেহেস্তে আগুন লাগলে কজন খুশী হয় বলুন।

এটা কোন্ স্টেশন ?—জিজ্ঞেস করলাম।

অমল বাইরে মুখ দিয়ে বলল, পড়ার উপায় নেই। যেভাবে পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ করেছে, তাতে স্টেশনের নাম চোখ

দিয়ে দেখে স্থির করা কঠিন। শেষ রাতে লোকও তো দেখছি না।
—ও মশায়, এটা কোন্ স্টেশন ?

প্লাটফরমের লোকটি কোন দিকে না তাকিয়ে বলল, চাকদহ।

অবিনাশ বলল, পশ্চিম বাঙলার রাজনীতি বর্তমানে দেওয়ালে পৌঁছেছে। মানুষের মনে পৌঁছতে পারছে না বলেই পোস্টারে পোস্টারে দেওয়াল ঢেকে ফেলছে।

বললাম, এরও প্রয়োজন আছে। চোখের সামনে বার বার পোস্টার পড়লে কিছুটা মানসিক পরিবর্তন তো হয়।

অমল বলল, তাও ঠিক, কিন্তু এবার যেসব পোস্টার পড়েছে, তাতে রাজনৈতিক বক্তব্য যত কম, সেই পরিমাণে বিপক্ষদলের প্রতি কুৎসা বেশি। কুৎসায় কারও কোন সুবিধা হয় না। অজয়বাবু সরকার ভেঙে দিয়ে জেহাদ ঘোষণা করেছিল মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে। কয়েক শত সভা করে মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে কুৎসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল। নির্বাচনের পরে দেখা গেল, তার বাঙলা কংগ্রেস পপাত ও মমার। এবার কোরামিন দেওয়া হয়েছে। দেখা যাক আর কতকাল তার দল বেঁচে থাকে। মানুষ কুৎসা আর রাজনৈতিক বক্তব্য ঠিক করতে শিখেছে, মানুষ ভাল-মন্দ চিনতে শিখেছে। সেজন্য এই পোস্টারগুলো কৌতূহল সৃষ্টি করে, জনমনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

অবিনাশ বলল, একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছ কি ?

কি ?

একই ধরনের ওয়াল-পেন্টিং, একই শ্লোগান।

অমল বলল, দলের হেডমাস্টারদের নির্দেশে এইসব হচ্ছে বলেই সব জায়গায় একই ধরনের শ্লোগান ও ওয়াল-পেন্টিং। অর্থাৎ এই-সব কুৎসা রটনায় সব পার্টির হাইকম্যাণ্ডের সমর্থন ও সহযোগিতা আছে। তোমার কথাই ঠিক। পশ্চিম বাঙলার রাজনীতি দেওয়ালেই আটকেছে, আর অগ্রসর হবে এমন ভরসা করতে পারছি না।

গাড়ি ছাড়তেই আবার পা মেলে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। গাড়িটাও বেশ ফাঁকা হয়ে এসেছে।

অমল কিন্তু মোটেই শুতে রাজি হল না। ক্যামেরা আর ব্যাগ এমন ভাবে আগলে বসে রইল যাতে কেউ চুরি করতে না পারে।

বললাম, তুমিও শুয়ে পড় অমল।

না দাদা। এ রাস্তা তো জানেন না। কখন যে ছিনতাইয়ের দল হামলা করবে, তার ঠিক নেই। রাণাঘাট পেরিয়ে গেলেই আরও ভয়। ওরা দল বেঁধে ওঠে, যাত্রীদের সবকিছু কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। সেজন্য রাণাঘাট পর্যন্ত যাকিছু ভিড়, তারপরই গাড়ি ফাঁকা চলে। আগে এই গাড়িটা ছিল বিনা-টিকিটের যাত্রীদের স্বর্গ। বিশেষ করে ব্যবসায়ীরা টু পাইস চেকারদের হাতে ঠেকিয়ে দিয়ে বিনা পয়সায় লালগোলা পর্যন্ত যেত। বর্তমানে চোর-ডাকাতের উৎপাতে বিনা-টিকিটের যাত্রী কমেছে, ওদের মাল লুট হয় অনবরত, তাই তখন অন্যান্য যাত্রীদের হামলা সহ্য করতে হয়।

অবিনাশ কাত হয়ে শুয়ে ছিল, উঠে বসে বলল, তাই তো অমল।

ভয় পেয়ে গেলি দেখছি!

না রে না, একেবারে একখানা লাঠিও নেই। দুর্ঘটনা ঘটলে বাধা দেবার উপায় থাকবে না।

বললাম, অত ভেবে কাজ নেই। শুয়ে পড়। যদি ছিনতাই হয়, তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

অমল জানালায় মুখ দিয়ে বসে। অবিনাশ মাঝে মাঝে ঝিমোচ্ছে। আমি বেশ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ গাড়ির ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে গেল।

কতদূর এলাম?—উঠে বসেই জিজ্ঞেস করলাম।

অমল বলল, কালীনারায়ণপুর পেরিয়ে রাস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়ে

গেছে। বোধ হয় লাইন ক্লিয়ার পায়নি। কেষ্টনগর এসে গেছি প্রায়। আর দুটো তিনটে স্টেশন পার হলেই কেষ্টনগর।

বাইরে পরিষ্কার জ্যোৎস্না। সবকিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম। ভাবছিলাম জীবনের ফেলে-আসা দিনগুলো। এমনি এক জ্যোৎস্নাস্নাত রাতে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে একদিন এই পথেই ভারতে আসতে হয়েছিল আশ্রয়ের আশায়। তারপর কত বছর পেরিয়ে গেছে। সেদিন দেহে সামর্থ্য ছিল, মনে ছিল প্রভূত বল, তাই সামলে নিতে চেষ্টা করেছিলাম নিজের অবস্থাকে। কিন্তু আজ দেহটা ভেঙে এসেছে, অথচ উদগ্র কামনা রোধ করতে পারিনি সেই ফেলে-আসা দেশ দেখার। আজ অশান্তভাবে ছুটে চলেছি রণবিধ্বস্ত সেই দেশকে দেখতে। সেদিনের সে চোখও নেই, সেদিনের সে মনও নেই, আজ নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে যাচ্ছি সেই মাকে, যে মা কোনক্রমেই রক্তপিপাসু হিংস্র অপর সন্তানদের হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে পারেনি, তার কোলে সামান্য স্থানও দিতে পারেনি। আমরা চাইনি এই দেশটা বিভক্ত হোক, অথচ তা হয়েছিল।

দেশ-বিভাগের সব চেয়ে বড় সমর্থক চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারিয়া বলেছিল, বাঙলা আর পাঞ্জাব স্বাধীনতালাভের পথে বড় প্রতিবন্ধক। (Bengal and the Punjab are the two stumbling blocks to the Indian Independence.) ইংরেজ দয়া করে স্বাধীনতা দেবে, অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। কিন্তু সেই ক্ষমতা দখলের জন্য আমাদের লড়াই করতে হয়নি বলেই রাজাগোপাল বাঙলা ও পাঞ্জাবকে বলী দিয়ে স্বাধীনতা তথা ক্ষমতালাভ করতে চেয়েছিল। তাকে সমর্থন জানিয়েছিল কম্যুনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী যোশি।

জিন্নাহ্ খুবই করিতকর্মা লোক। কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট তার কাছে

সবাই হিন্দু। তাই হিন্দুদের এই সমর্থনকে মূলধন করে প্রমাণ করেছিল, হিন্দুরাও চায় ভারত বিভাগ হোক এবং পাকিস্থান জন্মলাভ করুক।

রাজনীতি এমনই কুটিল, কয়েকজনের স্বার্থরক্ষা করতে কোটি কোটি মানুষকে দুঃখ-দুর্দশার গভীরে নিক্ষেপ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা-বোধ করল না কেউ-ই।

আমি নয়, আমার মত লক্ষ লক্ষ মানুষ সেদিন আশ্রয়হারা হয়ে পথে পথে ভেসে বেরিয়েছে, শুধু ভিক্ষান্নে উদরপূর্তি করেছে। ভুলে গেছি আমাদের ত্যাগেই ভারতের স্বাধীনতালাভ সম্ভব হয়েছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরাই সর্বাধিক নির্যাতিত, অথচ আমাদের পরিচয় হল আমরা আশ্রয়প্রার্থী। ইংরেজি Refuge শব্দের অর্থ হল—পরিত্যক্ত, অনাদৃত, অপ্রয়োজনীয়। আমরা হলাম পরিত্যক্ত, অনাদৃত, অপ্রয়োজনীয় Refugee. কোথায়? নিজেদের দেশের আরেকটি প্রান্তে।

সেই ব্যথাবেদনার ইতিহাস মনের কোণায় পর পর উঁকি দিচ্ছিল।

অমল আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কি ভাবছেন দাদা?

ভাবছি আমার ফেলে-আসা জীবনকে।

অতীতকে ভেবে কি হবে দাদা। তার চেয়ে বলুন এই যুদ্ধ কি অনিবার্য ছিল?

হাঁ। পূর্ব-বাঙলাকে বাঁচতে হলে যে-কোন উপায়ে পাকিস্থানী হানাদারদের বিদায় করতেই হবে। দ্বিতীয় কোন পথ ছিল না। মুজিবর রহমান মনে করেছিলেন, অহিংস সত্যাগ্রহ অসহযোগ দিয়ে হানাদারদের কাছ থেকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তার ছয় দফা দাবি আদায় করবেন; কিন্তু গণতন্ত্রের উপাসক শেখ মুজিবর বুঝতে পারেন নি সাম্রাজ্যবাদী শোষক জঙ্গীবাদ তা হতে দেবে না। এরা বিবেকবুদ্ধিকে হত্যা করে স্বৈরাচার কায়েম করবেই।

এটা তো বাঙলা দেশেই ঘটছে এমন নয়, এটা ঘটছে ও ঘটেছে পৃথিবীর সর্বত্র। এই সত্যকে স্বীকার করেই যদি মুজিবর সাহেব প্রস্তুত হতেন, তা হলে আজ সবকিছুই একপক্ষীয় হত না, হানাদাররাও খুব বেশিদিন প্রতিরোধ করতে পারত না। মুজিবরের শ্রেণী-চরিত্রই অংশতঃ এই অঘটনের জন্য দায়ী। ব্যাপক নরহত্যা প্রতিরোধ করা যেত, তবে এখন আর সময় নেই। এখন যা ঘটছে তা অনিবার্যরূপেই ঘটছে।

আবার গাড়ি ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে আরম্ভ করল।

অবিনাশ সোজা হয়ে বসে বলল, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির স্রষ্টা হল শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীরা ; কিন্তু অশ্বেতাঙ্গ ভারতীয়রা অত সহজে কেন সাম্প্রদায়িকতার শিকার হল ?

একথা তো আগেও বলেছি ভাই। আসল হল শ্রেণীস্বার্থ। শোষকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই এই বিষ ছড়িয়েছে। আর সেই শোষকশ্রেণীর ট্রেনিং-সেণ্টার ছিল আলিগড়ে। পাকিস্থানের যারা উগ্রসমর্থক নেতা, তাদের শিক্ষাদীক্ষা ঐ আলিগড়ে। শিক্ষা যেমন মানুষ তৈরী করে, তেমনি অমানুষও তৈরী করে। তার উদাহরণ হল পাকিস্থানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিযাকত আলি খান, কাশ্মীরের শেখ আব্দুল্লা। এরা অমানুষ হয়েছিল আলিগড়ের শিক্ষা পেয়ে।

কংগ্রেস তো বাধা দিয়েছিল।

হেসে বললাম, অমল, ইতিহাস তো বক্তৃতার ঝুড়ি নয়। ইতিহাস হল ঘটনার সমষ্টি। ছয়চল্লিশ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছিল, হাজার বছর চেষ্টা করলেও মুসলীম লীগ ভারত বিভাগ করে পাকিস্থান গড়তে পারবে না, আবার সেই জওহরলালই সাতচল্লিশ সালে পাকিস্থান সৃষ্টির দাবি মেনে নিয়ে গদীতে বসল। আসল হল ঘটনা, ভাবাবেগ নয়। তবে নিয়তি কোন্ পথে চালিত হয় তা বোধহয় স্বয়ং বিধাতাপুরুষও বলতে পারবেন না। নইলে যে

সোরাবুর্দি বাঙলা দেশে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধিয়ে বাঙলা বিভাগকে নিশ্চিত করেছিল, সেই সোরাবুর্দিকে 'দেশদ্রোহী' খেতাব দিয়ে পাকিস্থান সরকার জেলখানায় ঢুকিয়ে দিতে পারত কি? সত্য ঘটনা হল, সোরাবুর্দিই পাকিস্থানের বাস্তব রূপ দিয়েছিল, জিন্নাহ্ দিয়েছিল থিওরী। সেই সোরাবুর্দিকে 'দেশদ্রোহী' বলতে যে প্রশাসকদের বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না, সেই প্রশাসকরা যে-কোন অপকার্য যে-কোন সময় করতে পারে, এটাই তো ঘটনা। এটাই তো ইতিহাস।

গাড়ি তাহেরপুর ছাড়ল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অমল বলল, দেড়ঘণ্টা লেটে গাড়ি চলেছে। ভালই হয়েছে। আমরা কেষ্টনগর পৌঁছাবার পর সকাল হতে খুব বেশি দেরি থাকবে না। স্টেশনেই বাকি সময় কাটিয়ে শহরে যাব।

সাজেসনটা মন্দ নয়। দেখ ট্রেন শেষ পর্যন্ত পৌঁছয় কিনা।

সন্দেহ আছে নাকি?

কেষ্টনগর হল বর্তমানে অনেক অশান্তির কেন্দ্র। হঠাৎ কারফিউ হতেও তো পারে।

অত ভেবে কাজ নেই। আসল কথা হল নিরাপদে রাত্রির এই যাত্রা শেষ হলেই সৌভাগ্য মনে করব।

অবশ্য নিরাপদেই আমরা পৌঁছেছিলাম, শহরেও কারফিউ ছিল না, তবুও স্টেশনেই রাত কাটাতে হল। রাত কাটাবার মত যথেষ্ট স্থানও ছিল।

চাদর পেতে শুয়ে ছিলাম। অমল বাইরে প্লাটফরমে পায়চারি করছিল। অবিনাশ চায়ের দোকানে বসে কাপের পর কাপ উজাড় করছিল। শেষ রাতের ঠাণ্ডায় বেশ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙ্গল অমলের ডাকে। বলল, কালাচাঁদ-দাদা যেভাবে ঘুমের রেস দিচ্ছেন, শেষে বাঙলাদেশে গিয়ে কোন বিপদে না পড়েন।

আমি উঠে বসে বললাম, সে বিষয়ে কোন চিন্তা করতে হবে না।

আপনি ঘুমিয়েছিলেন তাই ডাকিনি। ছোট লাইনের প্লাটফরমে কজন লোক গোল হয়ে বসে আছে। ওরা বাঙলাদেশ থেকে এসেছে। ওদের কাছে গেলে অনেক কথাই শুনতে পেতেন। অন্ততঃ পথের নির্দেশ পেতেন।

নির্দেশটা তুমিও তো নিতে পারতে অমল।

আমার আগ্রহ ছিল অন্য বিষয়ে। আপনার মত আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু খবর নিতে পারি না। এখনও ওরা আছে। যাবেন ওদের কাছে ?

বললাম, চল। মুখ-চোখে জল দিতে পারলে ভাল হত।

কোন কিছুরই অভাব হবে না। প্লাটফরমে চলুন।

যখন লোকদের কাছে পৌঁছলাম, তখন আরও অনেকে সেখানে ভিড় জমিয়েছে। আমরাও গিয়ে দাঁড়ালাম। মোট লোকসংখ্যা ছয় জন। একজন বিধবা বৃদ্ধা, একটি তরুণী বধূ, তার কোলে একটি সন্তান ঘুমিয়ে। পাশে বসে একটি তিন বছরের মেয়ে আর সঙ্গী তুজন যুবক।

পাবনা থেকে আসছি আমরা।

যাচ্ছেন কোথায় ?

কোথায় যে যাব তা আমরা জানি না। আমার মা, স্ত্রী ও সন্তানদের কোন ব্যবস্থা করে আবার ফিরে যাব। আমাদের একজন আত্মীয় আছে ওপারে কালনায়। সেখানেই যাব মনে করেছি।

পাবনার অবস্থা কি ?

এখনও তো মুক্তিফৌজের হাতেই আছে। পরে কি হবে জানি না। শুনলাম পাবনা দখল করতে খানের দল আসছে। এইবারই তো আসল যুদ্ধ হবে মশায়।' তাই এদের নিরাপদ জায়গায় রেখে

যেতে এসেছি। হিন্দুস্থানে সবারই কিছু সম্পত্তি আছে, আমার কিছুই নেই।

ঠিক বুঝলাম না। আপনি পাবনায় কি করতেন?

আমি কালেক্টরীতে চাকরি করি। এখন তো সব বন্ধ। তাই ভাবলাম পরিবার-পরিজনদের এখানে রেখে যাই, আমরা দুভাই লড়াইতে যাব। ফিরব কিনা তা জানি না।

জনতার প্রশ্নের ধীরে ধীরে উত্তর দিচ্ছিল মহীউদ্দিন। আমরাও শুনলাম।

অমল প্রশ্ন করল, এলেন কি করে?

চলাচলের কোন অসুবিধা নেই। খানরা সবাই শহরে। আমরা গ্রামে গ্রামে এসেছি। নৌকাতে পার হলাম পদ্মা নদী। কুষ্টিয়া এসেই দেখলাম, শহর মুক্তিফৌজের হাতে। সেখান থেকে চুয়াডাঙ্গা এলাম। চুয়াডাঙ্গা থেকে দর্শনা হয়ে গেদে এসেছিলাম সন্ধ্যাবেলায়, সেখান থেকে শেষ রাতের ট্রেনে এখানে এসেছি। এখান থেকে শান্তিপুর হয়ে কালনা যাব।

আর কিছু জানার প্রয়োজন মনে করলাম না। যুদ্ধের সঙ্গে মহীউদ্দিনের কোন পরিচয় নেই। সামরিক বাহিনী প্রথম ধাক্কায় পিছিয়ে পড়েছে, শীগ্‌গীর সামলে নিয়ে আবার যখন আক্রমণ আরম্ভ করবে, তখনই আরম্ভ হবে আসল যুদ্ধ। সেই যুদ্ধ সম্বন্ধে মহীউদ্দিনের কোন জ্ঞানও নেই। সেজন্য তার কাছ থেকে যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন সংবাদই পাওয়া সম্ভব নয়।

অমলকে বললাম, এখানে আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। চল শহরে। কিছু খেয়েদেয়ে পথ দেখি।

হাঁটতে হাঁটতে শহরের দিকে চলছিলাম।

যেতে যেতে বললাম, সবচেয়ে বেশি হতাশ হয়েছিল সোরাবুর্দি। দেশ ভাগ হতেই মুখ্যমন্ত্রীর গদী থেকে সোরাবুর্দিকে নেমে আসতে হল। বাঙলার যে অংশের লোক সোরাবুর্দি, সে অংশ রয়ে গেছে

ভারতে, সেজন্য পূর্ববঙ্গে সোরাবুর্দির স্থান নির্দিষ্ট হতে দিল না পূর্ব-বঙ্গের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। নাজিমুদ্দিন চেপে বসল সিংহাসনে। সোরাবুর্দিকে সিংহাসনে বসতে হলে প্রয়োজন ছিল নতুন করে পূর্ববঙ্গ থেকে নির্বাচিত হবার। কিন্তু কেউ ইস্তাফা না দিলে তো তা সম্ভব নয়। সোরাবুর্দির অনুগামী অনেকেই ছিল, কিন্তু দলে তারা লঘিষ্ঠ। ইতিমধ্যে নাজিমুদ্দিন সদ্য-সংযোজিত শ্রীহট্টের সদস্যদের সমর্থন লাভ করায় আইনসভার গরিষ্ঠসংখ্যাকে হাত করেছে। সোরাবুর্দি ছেঁড়া-কাঁথার মত আঁস্তাকুড়েতে স্থান পেল। পাকিস্থানের জন্ম হল হিংসায়, বিদ্বেষে আর ঘৃণায়, আর বাঙলা-দেশে এই মহৎ কার্যটি সম্পন্ন করেছিল সোরাবুর্দি। পাকিস্থানী বিচিত্র রাজনীতি হয়ত অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাতে সোরাবুর্দিকে বিদায় করল ক্ষমতা থেকে।

অমল বলল, যাই বলুন দাদা, বাঙলাদেশ চিরকালের একটা কামধেনু। হিন্দু, পাঠান, মোগল, ইংরেজ—সবাই দোহন করেছে বাঙলাদেশকে। আজও দিল্লী দোহন করছে পশ্চিম বাঙলাকে, ইসলামাবাদ দোহন করছে পূর্ব-বাঙলাকে।

বললাম, এই দোহন সম্বন্ধে বাঙলার মানুষ সজাগ হয়েছে বলেই তো লড়াই। এ লড়াই এখানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, অমল। যদি পশ্চিম বাঙলার প্রতি দিল্লী এখনও অবিচার করে, তাহলে এই লড়াইয়ের ঢেউ অচিরেই পশ্চিম বাঙলাকেও আঘাত করবে।

সেটাই গুরুতর সমস্যা। তার নমুনা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে।

বললাম, হুঁ।

পাশ দিয়ে একটা গাড়ি ঢুকল হাসপাতালে। লক্ষ্য করলাম আপাদমস্তক কাদামাখা। গাড়ির সঙ্গে বাঙলার জাতীয় পতাকা উড়ছে। ভাল করে নজর দিয়ে দেখলাম, গাড়ির পেছন দিকে স্ট্রেচারে একজন আহত যুবক শুয়ে আছে।

দাঁড়িয়ে গেলাম হাসপাতালের সামনে।

খবর দেবার কেউ নেই। কোথা থেকে এল, কেন এল, এসব ঘটনা জানার কোন উপায় নেই। তবুও দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ, তারপরই এগিয়ে গিয়ে বসলাম একটা চায়ের দোকানে। দোকানের সবাই গাড়িকে লক্ষ্য করে নিজেরাই মন্তব্য করছে।

আজ দেখছি অনেক আসছে।

তাই তো। যুদ্ধ তা হলে ভালই চলছে। ওদের তো ওষুধও নেই, ডাক্তারও নেই।

ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট সাহায্য তো করছে।

একজন টিপ্পনী দিয়ে বলল, অনেক মিঞাই মরছে।

মরবে না, ঠিক হয়েছে। পাপ করলে শাস্তি নিতে হবে বই কি। শালারা আমাদের তাড়িয়েছে, এবার শালারা জাত-ভাইয়ের হাতে মার খাচ্ছে। আরে ভগবান আছে।

একজন বাধা দিয়ে বলল, ওসব ভুলে যান কর্তা।

ভুলব! কি যে বলেন মশায়! আপনার দেখছি মুসলমানের ওপর খুব দরদ। ওরা যে আমাদের দেশঘর ছাড়া করল, তা বুঝি জানেন না! এবার শালারা দেশঘর ছাড়া হবে।

অমল বিরক্তির সঙ্গে কিছু বলতে চেষ্টা করতেই বাধা দিলাম। চোখ টিপে নিষেধ করলাম কোন কথা বলতে।

চা না-খেয়েই আমরা উঠে পড়লাম।

বেশিক্ষণ ওখানে থাকা উচিত নয়। অমল ও অবিনাশ আত্মসম্বরণ করতে না পেরে তর্কাতর্কি আরম্ভ করলেই শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি হতে পারে।

রাস্তায় নেমে অমল বলল, দেখলেন দাদা, লোকগুলো কেমন ইতর।

সব মানুষ তো সমান নয়। ওদের কথা কানে নিতে হয় না ভাই। দেখ, কোন কথাটি বল না। এরা এত বেশি মুসলমান-বিদ্বেষী হয়ত ছিল না, দেশছাড়ার দুঃখে মুসলমান-বিদ্বেষী হয়েছে।

কচু। ওদের কিছুই ছিল না। কাজ ছিল মুসলমানদের ঠকিয়ে খাওয়া। তা আর করতে পারছে না বলেই অত ক্রোধ। বাঙলাদেশের ঐ মুসলমানরা তবুও তো শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, আমরা তা করতে পারিনি। নিজেদের অক্ষমতাকে গোপন করতে ওরা সক্ষম মানুষদের প্রতি কুৎসিত ইঙ্গিত করছে।

অবিনাশ বলল, তবে পাপকার্য যারা করেছে তারা স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্দেশেই করেছে।

বললাম, স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিরা সরল সহজ মানুষদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে চিরকাল। কিন্তু যেদিন বোকা মানুষেরা বুঝবে তাদের ঠকিয়েছে চালাক মানুষেরা, সেদিন ওরা আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়বে। তবুও একটা কথা সত্যি, সেটা হল মানুষের মন থেকে ক্লেদ এখনও অপসারিত হয় নি। হয়ত তা করা সম্ভব হত, কিন্তু ভারতে আবার মুসলীম লীগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে হিন্দুদের মনে আবার মুসলীম-বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলেছে। যে মুসলীম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের জন্য সংখ্যানুপাতিক চাকরির দাবি করেছে, সেই মুসলীম লীগ বাঙলাদেশের নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য এক কদম এগিয়ে আসছে না। যখন ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলন চলছিল, তখনও এইভাবেই মুসলমানেরা—বিশেষ করে মুসলীম লীগের অনুচররা—জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে দূরে থেকেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনে সহায়তাও করেছে। বাঙলাদেশে যে স্বাধীনতালাভের লড়াই চলেছে, তাতে ভারতে বসবাসকারী মুসলমানেরা খুব বেশি সহযোগিতা তো করবেই না, সুযোগ বুঝে ওরা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরোধিতাও করবে। এটাই হল ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের গরিষ্ঠ সংখ্যার চরিত্র। ওরা ভারতে বাস করে, কিন্তু ভারত তাদের মাতৃভূমি, একথা কম সময়ই মনে করে। এতদিন ওরা তাকিয়ে ছিল ঢাকা আর ইসলামাবাদের দিকে, এবার ঢাকা ওদের পক্ষে না-পাক, পাক শুধু

ইসলামাবাদ। সেজন্য হিন্দুদের কোন অংশ যদি এখনও মুসলমান-বিদ্বেষী হয়, তার জন্য হিন্দুদের দায়ী করা যায় না। বরং বলা যায়, কংগ্রেস সরকার ভারতে মুসলীম লীগকে আবার নর্দমা থেকে টেনে গদীতে না বসালে এইসব মনোভাব জন্মাত না।

অমল বলল, কথাটা সর্বাংশে মেনে নিতে পারছি না, তবে এটাও অনেক কারণের একটি কারণ। পাকিস্থানের উর্দু-সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখতে যেমন ভারতবিদ্বেষ প্রচার করছে, তেমনি ভারতেও হিন্দী-সাম্রাজ্যবাদীরা সাম্প্রদায়িকতার আড়ালে তাদের প্রভুত্ব কায়েম রাখতে চেষ্টা করছে। বাঙ্গালী চরিত্রে যে উদারতা সহনশীলতা বর্তমান, অবাঙ্গালী চরিত্রে তা নেই। পশ্চিম বাঙলার দুর্ভাগ্য, এখানে কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দেবার মত বাঙ্গালী আর নেই। যারা এতকাল নেতৃত্ব দিয়েছে, তারা এতকাল হিন্দী-সাম্রাজ্যবাদীদের দালালী করেছে, সংহতির নামে পশ্চিম বাঙলায় ডেকে এনেছে বেকারসমস্যা, অন্নসমস্যা, অশান্তি। তাদের যখন সবাই বিদায় করল, তখন দেশের কংগ্রেসীরা উপযুক্ত নেতৃত্ব দেবার লোকের সন্ধান পেল না। তাই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি অবাঙ্গালী, কিছুকাল আগেও সাধারণ সম্পাদক ছিল অবাঙ্গালী। এরা তো বাঙলার কথা ভাবে না, এরা বাঙলার মানুষকে শোষণ করে হিন্দী-সাম্রাজ্যবাদ বজায় রাখতে চায়। তারই একটা হল সাম্প্রদায়িকতা জিইয়ে রাখা। ভারতে মুসলমানরা তো ধর্ম প্রচার করতে আসেনি, অশোকের মত ধর্মবিজয় ওদের কাজ ছিল না, ওরা এসেছিল লুণ্ঠকের বেশে, সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র নিয়ে। যার ফলে মুসলমান ও হিন্দুর মাঝে প্রভেদ যা দেখা গেছে, তা হল ঘৃণার। সেই ঘৃণা থেকে বিদ্বেষ, হিংসা জন্মেছে। আজও তার নিবৃত্তি ঘটেনি।

অবিনাশ বলল, ভারতেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অলক্ষ্যে কাজ করছে। বাইরে তাদের পরিচয় সমাজবাদী। অভ্যন্তরে তাদের

কাজ হল সমাজবাদের সমাধি রচনা। মানুষকে বহুকাল ওরা বোকা করে রাখতে পারবে না ঠিকই, কিন্তু বোকা করে রাখার চেষ্টা করবে ততদিন, যতদিন মূল সমস্যার কোন সমাধান করতে পারবে না। কখনও সাম্প্রদায়িকতাকে গোপনে উস্কানি ও প্রশ্রয় দেবে, কখনও কম্যুনিস্ট জুজুর ভয় দেখাবে, কখনও শ্রেণীহীন সমাজ পত্তনের লোভনীয় প্রস্তাব রাখবে। অবশ্য এসব করার মত ওদের মেশিনারী আছে বলেই আজও গদীতে বসে আছে। আজ এই যে মুসলীম-বিরোধী রটনা, এর পেছনে নৈতিক কোন সমর্থন কি থাকতে পারে? যারা স্বাধীনতা চায় তারা কোন্ দেশের, কোন্ শ্রেণীর, কোন্ ধর্মের তা নিয়ে মাথা ঘামানো অতি নিকৃষ্ট মনোবৃত্তির লক্ষণ।

বললাম, ওদের কথা নিয়ে আর আলোচনা করে লাভ নেই। এই ভারতের বুকে বসে কোন ভারতবাসী মুসলমান যদি বলে, বাঙলাদেশের রক্তপাত বন্ধ হবে যদি ভারত বাঙলাদেশকে অস্ত্র-সাহায্য বন্ধ করে। এই লোকটি ভারতের টিকিট কপালে এঁটে পাকিস্থানের গুপ্তচরের কাজ করছে। ভারত সরকার নির্বিকার। ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দিচ্ছে—এটা এই তথাকথিত ভারতীয় জানল কি করে? তার বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, বাঙলাদেশের রক্তপাত ঘটছে ভারতের জন্য। অদ্ভুত এই বিশ্বাসঘাতকের যুক্তি। ভারতীয় অস্ত্রাগারের সন্ধান এই ব্যক্তিটি পেল কি করে? [If India is really sympathetic towards the people of East Pakistan, the Indian Government should immediately stop injecting arms into East Pakistan. It is obvious that without Indian arms there cannot be a war and hence, no bloodshed.—Shakeel Ahmad, Statesman: (10. 4. 71)—Calcutta]. এই যদি ভারতে বসবাসকারী মুসলমানের চরিত্র হয়, তাহলে ক'জন হিন্দু যদি

কোন অপ্রীতিকর মন্তব্য করেও থাকে, তাতে দুঃখ পাবার কিছু নেই।

অমল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ভারত সরকার কেন এই শাকিল আহম্মদকে প্রশ্ন করছে না? কেমন করে সে জানল, ভারত অস্ত্র দিচ্ছে তথাকথিত ঈস্ট পাকিস্থানী মুক্তিফৌজকে?

আমি হেসে বললাম, ভারতে পাকিস্তানের বহু গুপ্তচর আছে যারা মিথ্যা গুজব ছড়ায়, অশান্তি সৃষ্টি করে। এই ব্যক্তিও সেই কাজ করছে। ভারতে মুসলীম লীগ কাজ করছে, তার দানাপানি করাচীর থেকে আসছে কিনা তাই বা কে বলতে পারে।

আবার প্রবেশ করলাম একটা চায়ের দোকানে।

সকালেই কলকাতা থেকে খবরের কাগজ এসেছে। সংবাদের দিকে চোখ রেখে অমল বলল, মুক্তিফৌজ পিছু·হটছে দাদা।

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

অবিনাশ বলল, আমরা তো সরজমিনে তদন্তে যাচ্ছি। কে হারছে কে জিতছে, সেখানে গিয়েই দেখতে পাব। সকালের খাওয়া-দাওয়াটা মিটিয়ে নেওয়া যাক। পরে কিছু জুটবে কিনা কে জানে।

চা-পায়ী সবার মুখে মুক্তিযুদ্ধের কথা। সবাই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত।

যাই বলিস, মিঞারা লড়ছে।

ধেৎ। আধুনিক অস্ত্র আছে পাকিস্তানীদের হাতে। এদের হাতে আছে ভাঙ্গা বন্দুক। এ-দিয়ে ক'দিন লড়াই করবে! সাতদিনেই চিৎপটাং হয়ে যাবে মিঞারা। এ তো আর নিরস্ত্র হিন্দু মারা নয়। এ হল খাঁটি যুদ্ধ। হাতিয়ার চাই। বিনা হাতিয়ারে যুদ্ধ হয় না। দেখছিস না লক্ষ লক্ষ লোক ঢাকায় আর চট্টগ্রামে মারা গেছে মিলিটারীর গুলীতে।

মানুষ মারলে তো দেশ জয় হয় না, ভাই। মিলিটারী গোটা

দেশের লাখ লাখ লোক মারবে ; কিন্তু যারা বেঁচে থাকবে, তাদের যে নতি স্বীকার করাতে পারবে, এমন আশা মহামূর্খেও পোষণ করে না।

একজন গম্ভীরভাবে বলল, মেয়েদের ওপর অমানুষিক বর্বর আচরণ করছে।

আরেকজন বলল, হবেই। আমাদের মেয়েরা কি মেয়ে নয়। আমাদের মেয়ের ওপর ওরা কম অত্যাচার করেছে। এখনও মিঞাদের ঘর খুঁজলে কম করেও কয়েক হাজার হিন্দু মেয়ে পাওয়া যাবে। তাদের জোর করে আটক করে রাখতে, তাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করতে, ওদের তো বিবেকে বাধেনি। এবার বুমেরাং হচ্ছে। ওদেরই ভাই বেরাদার অত্যাচার করছে। পাপ পূর্ণ না হলে এমন কি কখনও হয় ?

অমল চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, এতে উল্লাসবোধ করার কিছু আছে কি ?

ঠিক উল্লাসবোধ করছি না। তবে পাপের পরিণাম যা হয় তা দেখছি, বুঝতে পারছি ভগবান এখনও আছেন।

অমল উত্তেজিতভাবে বলল, ভগবান থাকলে কোনটাই হত না। পাপহীন পবিত্র হিন্দুনারীদের ওপর যারা অত্যাচার করেছে, তারা রেহাই যেমন পেয়েছে, তেমনি তারা পাপহীন পবিত্র মুসলমান নারীদের ওপর যারা অত্যাচার করছে, তারাও রেহাই পাবে। মেয়েদের চিন্তা করতে হবে মা-বোন-ভগ্নী বলেই। আমার ঘরের মেয়েটা উৎপীড়িত হলে যেমন বেদনাদায়ক, তেমনি আমার মুসলমান প্রতিবেশীর মেয়েটা উৎপীড়িত হলেও বেদনাদায়ক। সেজন্য আমরা মন্তব্য করলে শোভন হবে কি ?

আপনার নাম কি মশায় ?

আমার নাম অমলকুমার সরকার।

কোথায় থাকা হয় ?

কলকাতায়।

আপনার এত মুসলমান-প্রেম ভাল লক্ষণ নয়।

অমল কি যেন উত্তর দিতে উদ্যত হচ্ছিল। নিষেধ করলাম। অমল কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

একজন বলল, ব্যাটা বোধহয় নেড়ে!

কথাটা কানে যেতেই আমি নিজেই চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম, মুসলমান মেয়েদের সপক্ষে কেউ কিছু বললেই সে কি নেড়ে হতে পারে? কংগ্রেস গদীতে বসেই ঠিক করল, যে খেতে চাইবে, খাবারের জন্য আন্দোলন করবে, সে-ই কম্যুনিস্ট। আপনাদের ধারণাও দেখছি ঠিক সেই রকম। প্রত্যেকের নিজস্ব মতবাদ আছে। আপনার পছন্দ না হতে পারে, তা বলে অপরকে ব্যঙ্গ করা কি ঠিক হবে?

চা-ওলা বুঝল ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াতে পারে। সেজন্য সে এগিয়ে এসে বলল, ওসব আলোচনার দরকার নেই দাদা। হিন্দু-মোচনমান দিয়ে আমাদের কি হবে? আমরা চাট্টি খেতে পেলেই খুশী। দোকানে বসে তর্কাতর্কি করলে মাথা গরম হবে। তার চেয়ে ওসব আলোচনা বন্ধ করুন।

চা-ওলার অনুরোধে অপ্রীতিকর আলোচনা বন্ধ করতেই হল, সবাই চুপ করে গেল। আমি খবরের কাগজের দিকে চোখ রেখে চায়ে চুমুক দিতে থাকি।

অবিনাশ বলল, আরও কিছু রোল নিতে হবে দাদা। অনেক ঘুরে বেড়াতে অনেক ছবির দরকার হবে। চলুন কোথাও গিয়ে কয়েকটা রোল কিনে নেব।

চায়ের দোকানে বিল মিটিয়ে বের হলাম পথে।

যেতে যেতে বললাম, একটা কাজের কাজ কেউ করলে না। শুধু তর্কাতর্কি। কিভাবে নিরাপদে বাঙলাদেশে যাওয়া যায় সে বিষয়ে কোন খোঁজখবর না করে অবান্তর আলোচনা করলে।

খোঁজ নিচ্ছি। কিন্তু অবান্তর আলোচনা এটা নয় কালাচাঁদ-দাদা। আমাদের এই বাঙলাদেশে বিগত কয়েক শত বৎসরে কোন যুদ্ধই হয় নি। সেজন্য যুদ্ধ যে কতটা বিভীষিকাময়, সে সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। বড়জোর কলকাতা শহরে পুলিশের লাঠি-পেটা আর কাঁদুনে গ্যাস ও গুলী আমরা জানি। তার বেশি তো জানি না। সেজন্য যে দানবীয় অত্যাচার সহ্য করতে হয় যুদ্ধরত জাতিদের, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞানই নেই। বই পড়ে যুদ্ধকে জানা যায় না। যুদ্ধ যে কি বস্তু তা জানে ইউরোপের মানুষ, তা জানে ভিয়েতনামের মানুষ, চীন-জাপানের মানুষ। তারাই সেজন্য শান্তি-শান্তি বলে চিৎকার করতে বাধ্য হচ্ছে। সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার সামান্যতম সংবাদ যা দু' একটা আমাদের কাছে পৌঁছচ্ছে, তা শুনে ওরকম হৃদয়হীন মন্তব্য করা মোটেই মনুষ্যোচিত নয়।

বললাম, অত উত্তেজিত হোয়ো না অমল। আমরা গোপাল-ভাঁড়ের দেশে এসেছি, সেটা ভুলে যেও না। আলুর গুদামে আগুন লেগেছিল। গোপাল যেতে যেতে আলু পোড়ার গন্ধ পেয়ে হাজির হল। দিব্যি পোড়া আলু পেটভর্তি খেয়ে গুদামের মালিককে জিজ্ঞেস করল, আবার কবে আলুর গুদামে আগুন লাগবে? বাঙলাদেশের আলুর গুদামে আগুন লেগেছে, যারা পরোপজীবী তারা আবার কবে আগুন লাগবে তার চিন্তা করছে। আমরা মনে করছি, আজ যে দুর্ভাগ্য ওপার বাঙলায় নেমে এসেছে, সেই দুর্ভাগ্য আমাদের জন্য হয়ত মজুত আছে। নাও চল, এবার বাস-স্ট্যাণ্ডে চল। ওখান থেকেই হদিস করতে পারব।

বাস-স্ট্যাণ্ডে এসে বসলাম আরেকটা চায়ের দোকানে।

চা-ওলা বুঝতে পেরেছিল আমরা কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। বলেছিল, কলকাতা থেকে অনেক ভদ্রলোক আজকাল আসছে পাকিস্থান দেখতে। তাই ভাবলাম, আপনারাও বোধ হয় সেই মতলব নিয়ে এসেছেন।

বললাম, হাঁ। আমরাও এসেছি বাঙলাদেশে যাবার জন্য। কোন্ পথে যাই বলুন তো ?

অনেক পথ আছে। ধরুন চাপড়া দিয়ে যেতে পারেন। চাপড়া থেকে হৃদয়পুর পার হলেই পাকিস্থান।

আপনি পাকিস্থান বলছেন কেন ? এখন ঐ দেশের নাম বাঙলাদেশ। পূর্ব অঞ্চলে পাকিস্থানের কবর হয়ে গেছে।

দোকানদার চা ছাঁকতে ছাঁকতে বলল, কথাটা ঠিকই বলেছেন মশায়। মোক্ষম। পাকিস্থানটা ছিল আতঙ্ক। আতঙ্কেই পাকিস্থান বলি, বাঙলাদেশের কথাই ভুলে গেছি যখন আমার এগার-বার বছর বয়স। তা আপনারা বুঝি রিপোর্টার ?

না। আমরা দর্শক মাত্র। দেখতে যাচ্ছি। এক সময় ঐ দেশেই তো আমাদের ঘরবাড়ি ছিল, তাই মায়াটা ছাড়তে পারছি না। অবশ্য আমার ছেলেমেয়েরা ও-দেশের কথা একবার উচ্চারণও করে না। ওরা তো ওই দেশের মাটিতে জন্মায় নি, ঐ দেশের ধুলোমাটি গায়ে মেখে বড় হয় নি, ওই দেশের ঝোপঝাপ জঙ্গল নদীনালার সঙ্গে ওদের তো কোন পরিচয় নেই। তাই আমার ছেলেমেয়েরা বাঙলাদেশকে মনেই করতে পারে না, কিন্তু আমি তো ভুলতে পারি নি। আজও স্বপ্ন দেখি ঐ দেশটার।

দোকানদারের চোখটাও ছলছল করে উঠল। বলল, এই নদে জেলার লোক আমি। ওপারের গাংগনি থানায় আমারও বাড়ি ছিল। নদে জেলাটা দু'টুকরো করে দিল সাহেবরা। আমাদেরও বিশ মাইল পথ হেঁটে এপারে তেহট্টে এসে হাজির হতে হল। গাংগনি আর তেহট্ট একই জেলায়, একই কোর্ট-কাচারি। দেশটা আমাদের পর হয়ে গেল মশায়। ভেবেছিলাম এই হিড়িকে একবার ঘর-বাড়িটা দেখে আসব। সে-সব কি আর আছে! গরীব মানুষের মাটির দেওয়ালের বাড়ি কবেই ভেঙ্গে গেছে, না হলে মিঞারা দখল করেছে। করুক। যাওয়া আর হল না।

বললাম, ওপারের লোকজন তো আসছে এপারে ?

হামেশাই। আর তো বর্ডার কেউ পাহারা দেয় না। ওপারের পাহারাদাররা লড়াই করতে গেছে। এপারের সেপাইরা চুপ করে বসে আছে। কেউ কাউকে যাতায়াতে বাধা দিচ্ছে না। বাধা দিলে ওরা তো শুকিয়ে মরত। বাঙলাদেশের রাস্তাঘাট বন্ধ, রেল চলছে না, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ। ওদের ঘরে হয়ত চাল আছে, কিন্তু নুনটা তো চাই। আরও হরেক দরকার আছে ওদের। সেগুলো তো আমরাই যোগাচ্ছি মশাই। নুন, তেল, সাবান, সিগারেট, বিড়ি, দেশলাই, ওষুধপত্তর কত কি যে যাচ্ছে তার কি হিসাব আছে! হাঁ। আমাদের দেশের লোক সাহায্য করছে। না করলে কি ওরা লড়াই করতে পারত! তবে সরকার থেকে কিছুই করা হচ্ছে না। যা কিছু করছে দেশের লোক। ওপার থেকে গাড়ি আসছে। আমার সামনে দিয়েই দিনে দশ পনরোটা গাড়ি আসছে। কোনটা যশোরের, কোনটা কুষ্টিয়ার, কোনটা ঢাকার। ওরা আসছে, জখমী রুগীদের হাসপাতালে দিয়ে যাচ্ছে, দরকারী জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে।

তাহলে এখান থেকে যা যাচ্ছে তা দেশের লোকই দিচ্ছে ?

হাঁ মশায়। আমরা তো তাই দেখছি। আমাদের এখান থেকে মাল নিয়ে ওদের বর্ডারে পৌঁছে দিচ্ছে, ওরা আবার সেগুলো ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের গাড়ি ওপারে যাচ্ছে না।

ওপারের মানুষ এপারে আসছে, কিছু বলছে কি ?

ওরা ভাবতেও পারে নি ভারতের মানুষ এত বেশি সাহায্য করবে। অস্ত্রশস্ত্র বাদে এমন জিনিস নেই যা ওদের আমরা দিচ্ছি না।

যুদ্ধ করছে কারা ?

খানদের সঙ্গে শেখেরা। খানরা হল পাঞ্জাবী, বেলুচি আর পাঠান ; আর শেখরা হল কলম-পেষা বাঙ্গালী। যাই বলেন বাবু,

আমরা যা শুনছি তাতে তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি। মুসলমান বলেই পারছে। আমরা হিন্দুরা পারতাম না। আমরাও বাঙ্গালী, ওরাও বাঙ্গালী, কিন্তু ওরা জানের পরোয়া করে না। মরছে শুনছি গাদা গাদা। তবুও লড়াই করছে। আমরা হলাম ছাপোষা জাত, মরার কথা শুনলেই বুকের ভেতরটা ধুক্‌ধুক্‌ করে।

বললাম, বাঙ্গালী হিন্দুর ছেলেরাও আদর্শের জন্য মরতে ভয় পায় না, এটা কি জানেন না ? বলতে গেলে এতকাল মুসলমানরাই পিছিয়ে ছিল, বাঙ্গালী হিন্দুর ছেলেরা ওদের পথ দেখিয়েছে কি করে দেশের জন্য প্রাণ দিতে হয়।

তা তো বুঝলাম, শেষ রক্ষা হবে কি ?

সেই কথা সবাই ভাবছে। এমন কি স্বয়ং পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট মনে করেছিল, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে শায়েস্তা করে দেবে। কিন্তু পনরটা দিন তো পেরিয়ে গেল। শায়েস্তা করতে নিজেই শায়েস্তা হবার উপক্রম।

তা হলে শেখরা জিতবে, তাই না ?

আমরা তো আশা করছি। খানদের জেতার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। তবে প্রথম দিকে খানরা কিছুটা সুবিধা করতে পারবে, মানুষ মারবে, বাড়িঘরে আগুন দেবে, সম্পত্তি নষ্ট করবে, নারী ধর্ষণ করবে। সবার শেষে এই সব পাপ কাজের বদলা মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরবে। যাক্‌ ও-সব কথা। আমরা তা হলে হৃদয়পুর দিয়েই যাব।

তা যেতে পারেন। চাপড়ার জন্য টেম্পো পাবেন সব সময়। তারপর রিক্‌শা করে হৃদয়পুর যেতে পারেন, তবে সেখান থেকে অনেকটা পথ হেঁটে তবেই পাবেন পাকিস্থান, মানে বাঙলা দেশের বর্ডার।

আর কোন পথ নেই ?

আছে। সেটাই বলতে চাইছিলাম। আপনারা এখুনি মেল

বাস পাবেন। বাস শিকারপুর যাবে। পথে বেতাই। বেতাইতে নেমে পড়বেন। সেখান থেকে বর্ডার দেড় ত্নমাইল। এ পথে হাঁটার বিশেষ হাঙ্গামা নেই। সোজা পথে যাবেন।

বললাম, আপনার নির্দেশ পেয়ে আমরা বিশেষ উপকৃত। ধন্যবাদ।

ফিরবেন তো এই পথেই ?

বলতে পারছি না। ঘুরতে ঘুরতে কতদিনে যে ফিরে আসব, শেষ পর্যন্ত ফিরতে পারব কিনা তা আপনাকে নির্দিষ্ট করে বলতে পারছি না।

যদি এ পথে যান, তা হলে খবরগুলো বলে যাবেন। আমরা তো নানা রকম খবর পাই। আপনারা নিজের চোখে দেখে যে খবর দেবেন, সেটাই হবে অমূল্য।

বললাম, চেষ্টা করব এ পথে আসতে।

বাস-স্ট্যাণ্ডে এসে দেখি মেল বাসে বসার জায়গা নেই। পরের বাসে যাওয়া স্থির করে আগেই স্থান করে নিলাম।

অবশেষে বাঙলাদেশের মাটিতে পা দিলাম।

ছোট্ট একটা খাল। জল না থাকার মত। আগের রাতে খুব ঝড়বৃষ্টি হয়েছে এদিকে। সামান্য মাটি-ভেজা জল রয়েছে। পায়ের পাতাও ডোবে না। খালটা ভারতের, খালের ওপারটা প্রাক্তন পাকিস্থানের। খালের ধারে বটগাছের তলায় বসে ছিল একটা মুসলমান ছেলে। তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় তোমার বাড়ি ?

ছেলেটা বলল, ওপারের গাঁয়ে।

ওটা তো পাকিস্থান ! এখানে কি করে এলে ?

উদাসভাবে বলল, আমরা তো রোজই আসি। কেউ মানা করে না। এপার ওপার ত্নপারেই আমরা যাতায়াত করি। এই বর্ডারে কেউ মানা করে না।

ওপারে খুব গোলমাল হচ্ছে বুঝি ?

ছেলেটা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, জানি না।

আমরা তো শুনলাম লড়াই হচ্ছে।

হাঁ, হাঁ। ঢাকাতে নাকি লড়াই হচ্ছে শুনেছি। আর তো জানি না। ঢাকা তো একশ' ক্রোশ দূরে। ওখানে লড়াই হয়েছিল। থেমে গেছে।

পনরো ষোল বছরের ছেলে দেশের অভ্যন্তরে কি হচ্ছে তার কিছুই সংবাদ রাখে না। আশ্চর্য! আমার মনে হল আমাদের দেশের কাগজওয়ালারা দিনকে রাত করতে বেশ ওস্তাদি দেখাতে পারে। বাঙলা দেশের সামান্য ঘটনাকেই হয়ত বা ফাঁপিয়ে তুলেছে। একবার মোহনবাগান ক্লাবের ক্যাপটেন শৈলেন মান্নার সঙ্গে কথা বলছিলাম। তাকে বলেছিলাম, আমার ছেলেরা সকালবেলায় সবার আগে খবরের কাগজে খেলার খবর পড়ে।

শৈলেনবাবু হেসে বলল, খুব প্র্যাকটিক্যাল আপনার ছেলেরা। খবরের কাগজে যত খবর বের হয় তার মধ্যে খেলার খবরটাই একমাত্র নির্ভেজাল খবর। আর সব খবরকে পারসেণ্টেজ দিয়ে হিসাব করতে হয়।

কলকাতায় বসে বাঙলাদেশের যে-সব সংবাদ আমরা পড়ি, তাকে শেষ পর্যন্ত পারসেণ্টেজ দিয়ে হিসাব করতে হবে নাকি!

খালটা পার হতে হতে অমলকে বললাম, শুনলে তো ছেলেটার কথা। দেশে যে যুদ্ধ চলছে এই সংবাদটাও ছেলেটা জানে না ভাল করে। আমাদের খবরের কাগজওয়ালারা তা হলে কি অর্ধসত্য সংবাদ পরিবেশন করছে ?

অমল বলল, সব সময় অর্ধসত্য সংবাদ দেয় না। কোন কোন সময় সত্য সংবাদ দেয় উদ্দেশ্যমূলক ভাবে। সেদিনের নির্বাচন হবার আগে প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করে 'বোমা, গুলী, খুন' ইত্যাদির

সংবাদ পরিবেশন করত। উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার একমাত্র অমোঘ ঔষধ হল নির্বাচন, আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এবং সেটা গুরুতর উদ্দেশ্য, যে-কোন উপায়ে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রচার করে কংগ্রেসীদের নির্বাচনে জয়ের পথ করে দেওয়া। নির্বাচনের ফল বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদ মাঝের অপ্রয়োজনীয় পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। এ থেকেই তো বুঝতে পারছেন, সত্য সংবাদকে বিকৃত করা হয় উদ্দেশ্যমূলক ভাবে। তেমনি বর্তমানে বাঙলা দেশের যে সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে তার পেছনে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য যে কি তা আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়ে না, গভীরভাবে চিন্তা করতে হয়। তবুও ছেলেটা কেন এত অজ্ঞ, সেটাই চিন্তার কারণ। সত্যিই কি ওদেশে কোন ঘটনা ঘটছে না। ' এহিয়া (ইয়াহিয়া) দাবি করছে, বাঙলা দেশের সর্বত্র পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে, তা কি সত্য !

বললাম, এবার হাতে পাঁজি। এবার দিন ক্ষণ বার তিথি লগ্ন রাশি নক্ষত্র—সব কিছুই জানতে পারব। অত ভেবে কাজ নেই ভাই। ধীরে ধীরে মাঠটা পেরিয়ে গ্রামে প্রবেশ করতে হবে।

অমল বলল, গ্রামের মানুষ আমাদের যদি আটক করে !

করবে। এপারে আমরা নিরুপায়। অবৈধ প্রবেশকারী। তবে বাস-স্ট্যাণ্ডের চা-ওলা যা বলল তাতে মনে হয় ওরা ভারতীয়দের ওপর বিশেষ কোন জুলুম করবে না। ভারত থেকে অফুরন্ত অসামরিক বস্তু তো পৌঁছচ্ছে শুনছি। তা হলে ওদের কাছে সদ্ব্যবহারই আশা করতে পারি। তাড়াতাড়ি পা ফেলতে হবে। নিরাপদ স্থানে পৌঁছানো আমাদের প্রথম কাজ।

চাযবাস তো হচ্ছে এখানে।—বলল অবিনাশ।

অর্থাৎ নরম্যাল লাইফ। সব কাজই চলছে, এই তো তোমার কথা। আমরা কিন্তু সীমান্তের দু-তিনশ' গজের মধ্যে আছি। সারা বাংলা দেশে অশান্তি থাকলেও কোন সময়ই আন্তর্জাতিক

সীমানায় কোন হাঙ্গামা হবে না, অন্তত আইন অনুসারে হওয়া উচিত নয়। অবশ্য পাকিস্থানের স্বৈরাচারী রক্তপিপাসুদের কথা আলাদা। তারা কোন দিনই আন্তর্জাতিক বিধি মানে নি, এখনও হয়ত মানবে না। তবে ভারতও কোনক্রমেই পাকিস্থানীদের সীমান্ত এলাকায় হানাদারী সহ্য করবে না। কূটনীতিক ঝগড়া হবে, শেষে ঝগড়া লড়াইতে পরিণত হতে পারে। তবুও সীমান্ত এলাকা নিরাপদ, সেজন্য এখানকার জীবনে অস্বাভাবিকতা বিশেষ কিছু নজরে পড়বে না। আমার মনে হচ্ছে সেই কারণেই ঐ রাখাল ছেলেটা দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিছুই বলতে পারল না।

অবিনাশ বলল, যুদ্ধ যে কত দিন চলবে তারই বা ঠিক কি!

বললাম, অনেক দিন চলবে।

অমল সঙ্গে সঙ্গে বলল, শত্রুপক্ষ খুবই শক্তিশালী, সেজন্য তাদের হটাতে সময় দরকার হবে। যদি কোন বিদেশী রাষ্ট্র যুদ্ধ-বিরতির জন্য এগিয়ে না আসে, তা হলে ভিয়েতনামের চেহারা এখানেও দেখা যাবে।

বললাম, সে আশঙ্কা আমারও আছে। যতই দিন কাটবে, ততই উভয় পক্ষ শক্তি সঞ্চয়ের জন্য বিদেশী সাহায্য নেবে। বিদেশী শক্তি যখনই অস্ত্রসাহায্য দিতে থাকবে, তখনই যুদ্ধের মোড় ঘুরবে। এর মধ্যে চীন তো এহিয়াকে সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

অমল বলল, এটাই আশ্চর্য ঘটনা, কালাচাঁদ-দাদা। চীন নিজেকে সমাজতন্ত্রী দেশ বলে দাবি করে, অথচ তার বেশি মিতালি স্বৈরাচারী পাকিস্থানী জঙ্গীবাজদের সঙ্গে। যে মাও সে-তুং জঙ্গীবাজদের উচ্ছেদ ঘটাতে এতদিন প্রচার করে এসেছে, সেই মাও সে-তুং কি করে জঙ্গীবাজ এহিয়া গ্রুপকে সাহায্য করছে, তা ভেবে ঠিক করতে পারছি না।

কারণ ভারত-বিদ্বেষ।

এই বিদ্বেষের কোন কারণ তো নেই।

তোমার আমার কাছে না থাকতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রনীতিতে আছে। ওরা স্থির করেছে ভারত হল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র, সেজন্য তাদের ক্রোধ স্বাভাবিক।

অবিনাশ বলল, ঠিক তা নয়। সীমান্ত নিয়ে ঝগড়া ছিল। সেটাই কারণ ; আবার দলাই লামাকে নিয়ে নাচা-নাচিটা চীন সহ্য করতে চায় না। আমেরিকার প্রাধান্যও কিছুটা আছে এদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায়। এই সব নানা কারণে চীন ভারতের ওপর খুশী নয়।

তাই যদি হয় তাহলে পাকিস্থানের ওপরই বা তারা খুশী কেন ? পাকিস্থান তো আমেরিকার ঘাঁটি। আবার চীন নিজেও তো ক্রমেই আমেরিকার দিকে ঝুঁকছে। ঠিক বুঝা যাচ্ছে না অবস্থাটা। যাই হোক, চীন হোক আর আমেরিকা হোক, এরা বাঙলাদেশের অশান্তি দমনে যদি নৈতিক মানবিকতাবোধকে কাজে না লাগিয়ে বন্দুক কামান যোগান দেয়, তাহলে ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখা দেবে।

অমল আমাদের দৃষ্টি গ্রামের দিকে আকর্ষণ করে বলল, এই তো নরম্যাল লাইফ। ঐ দেখুন, মেয়েরা পুকুর থেকে স্নান করে কলসীভর্তি জল নিয়ে ঘরে ফিরে চলেছে। একেবারে খাঁটি বাঙলার ছবি।

কোথায় যাবেন ?

শহরে।

কোথা থেকে আসছেন ?

কলকাতা থেকে।

সাইকেল-আরোহী আমাদের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় প্রশ্ন করে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল।

আপনারা বুঝি রিপোর্টার ?

আজ্ঞে না। আমরা দেখতে এসেছি বাঙলাদেশকে। আপনারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, আপনাদের স্বাধীন দেশ দেখতে এসেছি।

সাইকেল-আরোহী ভদ্রলোক খুশী হলেন। বললেন, আমিও শহরে যাব। চলুন একসঙ্গে যাব।

আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ?

ভারতে। ওপারে, সওদা করতে। আজকাল পথঘাট তো বন্ধ। জিনিসপত্র আর আসছে না। তাই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস আনতে হচ্ছে ওপার থেকে।

কেউ বাধা দেয় না ?

না। কেন দেবে। আমাদের বিপদের কথা সবাই জানে।

ন্যায্য মূল্যে জিনিস পাচ্ছেন তো ?

এখনও তো পাচ্ছি। তবে রাষ্ট্রবিপ্লবে সবচেয়ে লাভবান হয় কালোবাজারী আর চোরাকারবারীর দল। কিছুকালের মধ্যেই তারা কামড় দেবে।

আপনাদের এখানে চোরাকারবারী কালোবাজারী নেই ?

যথেষ্ট আছে। তবে আমাদের আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের শায়েস্তা করে রেখেছে। যদি কোনরকম কালোবাজারীর সন্ধান পায়, তাকে কঠিন শাস্তি দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেজন্য চোর-বদমাশগুলো মাথা তুলতে পারছে না। ওরা তো সংখ্যায় সামান্য। আজ দেশের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক যেভাবে কাজ করছে, তাদের চোখে ধুলো দিয়ে বদমাইশী করা সহজ নয়।

শহর এখান থেকে কতদূর ?

খাল বরাবর গেলে আড়াই তিন মাইল। সড়ক পথে গেলে চার সাড়ে-চার মাইল। আমি খালের পাশ দিয়েই যাব। তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব আশা করছি।

এই সব গ্রামে হিন্দু নেই বুঝি ?

লজ্জিতভাবে ভদ্রলোক বললেন, না। আগে ছিল বহু হিন্দু। সবাই এক্স্‌চেঞ্জ করে চলে গেছে। আমরাও করিমপুরে ছিলাম, আমরাও বদল করে এখানে এসেছি।

কতদিন ওপার থেকে এসেছেন ?

তা হবে আঠার-উনিশ বছর।

দেশ ভাগ হবার পরেই এসেছেন। তা হলে পাকিস্থানের আদি বাসিন্দা আপনি।

পাকিস্থান নয়, মশায়। আগে পাকিস্থান ছিল, এখন আমরা বাঙলা দেশের মানুষ। বাঙলা দেশের আমরাই প্রথম মানুষ।

এদিকে পাকিস্থানী ফৌজ আসেনি বুঝি ?

আসেনি, আসতে আর ক'দিন। কখন যে খানের দল আসবে তা কে বলতে পারে। তবে সহজে ঢুকতে পারবে না। রক্ত দিয়ে আমরা বাঙলা দেশ রক্ষা করবই করব।

আপনার নামটা জানতে পারি কি ?

আমার নাম কাদের মিঞা। বুড়ীপোতায় আমার বাড়ি। বাড়ি হয়েই আমি শহরে যাব। দেশের খবরাখবর নিয়ে আবার বাড়ি ফিরব। রাতে কি ঘুমোতে পারছি মশায়। একজন করে জেগে পাহারা দিতে হচ্ছে। কখন যে খানরা আসে তার কি ঠিক আছে ?

আপনারা কেন এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নেমেছেন ? আপনারা আলাদা দেশ চেয়েছিলেন, আলাদা দেশ পেয়েছেন, আর তো হিন্দুদের গোলামি আপনাদের করতে হয় না। তবুও আপনারা খুশী নন কেন ?

কাদের মিঞা চলতে চলতে থেমে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার চলতে আরম্ভ করল।

শুনতে চান ?

বললাম, শুনতে আর দেখতে এসেছি। আমরা মনে করি—এটা হল মুক্তিযুদ্ধ। বাঙলার মানুষের মুক্তি অবশ্যই আমাদের মুক্তি নয়, তবুও আপনাদের মুক্তি মানেই আমাদের আরেকটি গোষ্ঠীর মুক্তি। এতে আমরা নিশ্চয়ই আনন্দিত হব।

কাদের মিঞা বলল, অবশ্যই। তবে শুনুন। রাজনীতির প্যাঁচগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারি না, তবুও ঘটনাগুলো বলতে পারি।

মুসলীম লীগ দাবি করে তারা পাকিস্থানের স্বাধীনতা এনেছে। আমরা বললাম, ঠিক। তোমাদের কাজ মঞ্জুর। আমরাও পোকা-খাওয়া পাকিস্থান পেয়ে খুশী। কিন্তু ভারত থেকে জমি কেটে নিয়ে যে স্বাধীনতা, তার দাম কতটুকু যদি না আমরা দুবেলা পেট ভর্তি খেতে পাই, স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারি, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারি ?

লীগওলারা বলল, কে তোমাদের বাধা দিচ্ছে ?

আমরা বললাম, তোমরা বাধা দিচ্ছ। তোমাদের লীগ হল আমীর-ওমরাহ্‌দের পুঁজিবাদীদের। সেখানে সাধারণ মানুষদের কোন অধিকার নেই। তোমরা কি সাধারণ মানুষের কথা শোন ? তা হলে তোমরা আমাদের যথাযোগ্য জায়গা দাও তোমাদের লীগে।

ওরা রাজী হল না। কায়েমী স্বার্থ তাতে নষ্ট হবার ভয়। আর কায়েমী স্বার্থের মালিকানা ছিল পশ্চিম পাকিস্থানীদের কব্জায় ; তারা কতকগুলো পা-চাটা বাঙালীর মারফতে ইসলামের নামে বাঙলাদেশটার সর্বনাশ করছিল। আর এই মীরজাফরের দলের প্রথম তিনজনের একজন এখনও বেঁচে আছে। এখনও এই মীরজাফর ইসলামের নাম নিয়ে খানদের সাহায্য করছে।

কে এই তিনজন মীরজাফর ?

খাজা নাজিমুদ্দিন, নুরুল আমিন আর আক্রাম খান। এদের মধ্যে নাজিমুদ্দিন আর আক্রাম খানের এন্তেকাল হয়েছে, বাকি নুরুল আমিন। সে-ই বিষ ছড়াচ্ছে এখন। আমরা আজও বুঝতে পারছি না, বাঙলাদেশের যে সর্বনাশ খানরা করেছে, এমন কি নাজিমুদ্দিনকেও ঘোল খাইয়েছে, সেই সত্যটা এরা কেন বুঝতে

চাইছে না। বাঙলার এই মর্মান্তিক দুর্দশার জন্য যে-সব বাঙ্গালী মুসলমান প্রত্যক্ষভাবে দায়ী, যারা খাল কেটে পাঞ্জাব থেকে বাঙলাদেশে কুমীর ডেকে এনেছে, তাদের নেতা হল এই তিনজন মীরজাফর। নাজিমুদ্দিন তো বাঙলা ভাষায় কথা বলতে লজ্জাবোধ করত। এরা যেভাবে ডালপালা ছড়িয়ে ছিল বাঙলাদেশে, অশিক্ষিত মুসলমানদের ইসলামের নামে ইসলাম-বিরোধী কাজে নামিয়েছিল, তার শাস্তি ভোগ করছি আমরা। সময়মত আমরা বাধা দেইনি, এটাই আমাদের অপরাধ।

তবে খোদার ইচ্ছায় হাওয়া বদল হল।

মওলানা ভাসানী আসাম থেকে বাঙলাদেশে এল। দাবি জানাল মুসলীম লীগের দরজা সবাইয়ের জন্য খুলে দেবার। তা কি হয় মশায়। লীগ হল আমীর ওমরাহ আর অবাঙালী শিল্পপতিদের ব্যক্তিস্বার্থ পূর্ণ করার দুর্গ। সেখানে আমাদের মত মুসলমানদের স্থান হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে বাঙলার মুসলমানদের ওরা মোটেই মুসলমান মনে করে না। ওরা মনে করে, ওরা এসেছে খাস আরব-পারস্য থেকে, ওরা যে আমাদের মতই ভারতের ধর্মান্তরিত হিন্দু, সে-কথা ভুলেই গেছে। না ভুলে তো উপায় নেই। ওপরতলার মানুষ নীচের তলার মানুষকে কোন সময়ই নিজের লোক মনে করে না। অনেক অর্থবান পুত্র দরিদ্র পিতার পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে, এরাও তেমনি।

ভাসানী এসেই বুঝল লীগে যথোপযুক্ত স্থান তাকে দেবে না লীগের নেতারা। আরও বুঝল লীগের নামে অবাঙালী মুসল-মানদের শোষণ কায়েম রাখার এজেন্ট হল কয়েকজন দালাল বাঙলার নেতা। ভাসানী গড়ে তুলল আওয়ামী মুসলীম লীগ। অর্থাৎ জনসাধারণের মুসলীম লীগ।

সোরাবুর্দির মত লোককেও ওরা লীগে স্থান দেয় নি। বুঝুন মজা। ভাসানীর ডাকে সোরাবুর্দি এসে হাত মেলালো। নতুন

দলের পত্তন হল। ভাসানী প্রেসিডেণ্ট, সামসুল হক জেনারেল সেক্রেটারী, আর আমাদের বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান হলেন যুগ্ম-সম্পাদক। বঙ্গবন্ধু তখন ছিলেন জেলখানায়। ভাষা-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় এবং নেতৃত্ব দেওয়াতে তাঁকে কয়েদ করে রেখেছে মুসলীম লীগ।

হয়ত একমাত্র আওয়ামী মুসলীম লীগের পক্ষে মুসলীম লীগকে কাবু করা সম্ভব হত না, কিন্তু তাকে সম্ভব করলেন ফজলুল হক সাহেব। বৃদ্ধ বয়সে দেশের মানুষের দুর্দশা দেখে ফজলুল হক সাহেব আর ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। হক সাহেব গড়ে তুললেন কৃষক-শ্রমিক পার্টি। তার এই কাজে সঙ্গী পেলেন আবদুল লতিফ বিশ্বাস আর মোহন মিঞাকে।

মুসলীম লীগের অন্তিমকাল এসে গেছে। মুসলীম লীগ বুঝতে পারল তাদের সামনে লড়াই। এ লড়াই হিন্দুবিতাড়নের নোংরা নরঘাতন ও অত্যাচারের লড়াই নয়। তাদের বড়শত্রু দেশের যারা খাঁটি বাঙ্গালী মুসলমান। মানুষ যাদের চোখের সামনে ইসলামের নামে অ-মুসলমান পীড়নের আদর্শ তুলে ধরে এতকাল বোকা করে রাখা হয়েছিল, সেই বোকা মুসলমানরা আর বোকা নেই। তারা তাদের দাবি আদায় করতে বদ্ধপরিকর। আর যারা তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে তারাও নেহাত বাজে লোক নয়, বরং তারা তাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

মুসলীম লীগ সহজে আর নির্বাচনে নামতে চায় না।

বাহান্ন সালের ভাষা-আন্দোলন বুঝিয়ে দিয়েছিল, লীগ জুলুমবাজি করে কিছুই করতে পারবে না।

আচ্ছা, আপনারাই বলুন, পাকিস্থানের শতকরা পঞ্চান্ন জন লোক বাঙলায় কথা বলে, আর পঁচিশ জনও উর্দু ভাষায় কথা বলে না, সেই উর্দু ভাষা হবে রাষ্ট্রভাষা। কারণ, ঐক্য। পাকিস্থান এক এবং অখণ্ড প্রমাণ করতে সবাইকে মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে

উর্দু ভাষায় কথা বলতে হবে। বেলুচ, পাঠান, সিন্ধীরা প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না। তাদের মানসিক গঠন সেভাবে মোটেই তৈরী নয়। উর্দুর দাসত্ব তারা স্বীকার করে নিল বিনা প্রতিবাদে।

আটচল্লিশ সালের মার্চ মাসে বিধান সভার অধিবেশন বসল। বাজেট অধিবেশন। এই অধিবেশনেই লীগের সদস্যরাই নাজিমুদ্দিনের বিরোধিতা করতে থাকে। নাজিমুদ্দিন বুঝতে পারল, তার পক্ষে লীগের অনুচরদের সামলানো দায়। নাজিমুদ্দিন ডেকে পাঠাল লীগের পিতা জিন্নাহ্‌কে।

জিন্নাহ্ পাকা লোক। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলতে বেছে বেছে দুইজনকে মন্ত্রী করে দিলেন আর একজনকে বর্মায় রাষ্ট্রদূত করে পাঠালেন। জিন্নাহ্ এত সহজে গোলমাল মেটাতে পারবেন তা কেউ ভাবতেও পারেনি। নাজিমুদ্দিন আপাতত নিষ্কণ্টক।

কিন্তু মশায়, কাঁটা গাছের মাথা অন্যত্র দেখা দিল।

জিন্নাহ্ সাহেব রেসকোর্সে মিটিং করেছিলেন। লাখ লাখ লোক ময়দানে উপস্থিত। সেখানে জিন্নাহ্ সাহেব বলেছিলেন, পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। লোকে তারিফ করল। কেউ প্রতিবাদ করল না। তখন জিন্নাহের প্রতিবাদ করার অর্থ হল দোজকে যাওয়া, মুসলীম লীগের গুণ্ডাদের হাতে প্রাণ দেওয়া। তাই সবাই তারিফ করেই ঘরে ফিরে এল। জিন্নাহ্ বুঝল তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

বাঙলাদেশে জনজাগরণের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল স্বাধীনতালাভের এক বছর হতে না হতেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের কার্জন হলে সমাবর্তন উৎসবে জিন্নাহ্ সাহেব খুশ মেজাজে এসেছেন। ময়দানে তাঁর ঘোষণা মেনে নিয়েছে দেশের লোক। সেই আনন্দে ভারসাম্য রাখতে না পেরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাবেশে জিন্নাহ্ সাহেব বললেন, Urdu and nothing but Urdu, shall be the state language of Pakistan.

উর্দু, আর কিছু নয়, কেবলমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

হঠাৎ শোনা গেল,—No, No, না না। তা হবে না।

ছাত্ররা জিন্নাহের জয়ধ্বনি দিল, পাকিস্তানের জয়ধ্বনি দিল, কিন্তু উর্দুর জয়ধ্বনি দিল না। তারা বাঙলা ভাষার জয়ধ্বনি দিল।

জিন্নাহ্ তখন পাকিস্থানের একচ্ছত্রপতি বাদশাহ, কায়েদে আজম, তাঁর মুখের ওপর 'না' বলার ক্ষমতা কারও নেই। অথচ বিনামেঘে বজ্রপাতের মত 'No, No' ধ্বনি শোনা গেল ছাত্র-সমাজের অভ্যন্তর থেকে। এতকাল হিন্দুরা বাঙলা ভাষাকে মর্যাদা দেবার কথা বলেছে, কিন্তু তাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়েছে। যারা দাবি জানিয়েছে, তারা যে ভারতের চর এবং পাকিস্থানের শত্রু, তাও বলা হয়েছে। কিন্তু এবার দাবি উথাপন করেছে বাঙলার মানুষ, তারা কেবলমাত্র হিন্দু নয়, বরং বলা যায় তাদের শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জনই মুসলমান।

এখানেই বাঙলার জনজাগরণের প্রথম বীজটি বপন করা হল।

জিন্নাহ্ হয়ত বুঝতে পারেন নি, কিন্তু লিয়াকত আলি বুঝে-ছিলেন করাচিতে বসে বাঙালাদেশ শাসন চিরকাল সম্ভব নয়। ইসলাম আর কৌম, তমুদ্দুন—এইসব বড় বড় কথার অসারতা বাঙালীরা যখন বুঝবে, তখন আর বাঙলাদেশকে পাকিস্থানের চৌহদ্দিতে রাখতে পারা যাবে না, ফলে বাঙলাদেশ হাতছাড়া হবেই। সেজন্য লিয়াকত আলি স্পষ্টই নির্দেশ দিয়েছিল, পূর্ববঙ্গের উন্নয়নে বেশি ব্যয় করে লাভ নেই।

পশ্চিম পাকিস্থানীরা হল সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি। ওদের বিবেক বিকিয়ে দিয়েছে মোল্লা আর জঙ্গীশাহীর কাছে। লিয়াকত আলিকে হত্যা করল। কেন করল তা আজও জানা যায়নি। বেগম লিয়াকত আলি অনেক চেষ্টা করেছে তদন্ত করে চক্রান্তকে খুঁজে বের করার। সে চক্রান্তের জাল ছিন্ন করা যায় নি আজও।

নাজিমুদ্দিন গদিতে বসল।

পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী বাঙ্গালী, লোক গদগদ হয়ে গেল। পূর্ববাঙলার গদীতে বসল নুরুল আমিন। কিন্তু পাঞ্জাবী জঙ্গী-চক্র ভেদ করার ক্ষমতা নাজিমুদ্দিনের ছিল না। তাদের নির্দেশে নাজিমুদ্দিন ঢাকাতে এসে পল্টন ময়দানে সভা করে ঘোষণা করল, উর্দু ই হবে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা।

বাঙ্গালীরা বাদশাহের মত যে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, তা বলার নয়। যারা সেদিনের মিটিং দেখেছে তারা তুরস্কের খলিফার মর্যাদায় মণ্ডিত নাজিমুদ্দিনকে দেখে অবাক হয়ে গেছে। কিন্তু নাজিমুদ্দিনের বাঙলা-বিরোধী ঘোষণা শোনামাত্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সভার মানুষ একবাক্যে ধ্বনি দিল—"রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চাই।"

নাজিমুদ্দিনের মুরুব্বী হল সিভিলিয়ান চৌধুরী মহম্মদ আলি আর আজিজ আমেদ। একজন গভর্ণর জেনারেল, আরেকজন চিফ সেক্রেটারী, পেছনে আছে সামরিক জুন্টা। তাই নাজিমুদ্দিন কারও কথা শুনতে রাজী নয়। বাঙলার দাবির বিরুদ্ধে নাজিমুদ্দিন বলল, 'না', পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন বলল, 'না'। তারই প্রতিবাদে ছাত্ররা ডাক দিল হরতালের।

একুশে ফেব্রুয়ারী, বাহান্ন সাল।

পূর্ববঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন বসবে। সেইদিন 'হরতাল' ঘোষণা করল ছাত্রসমাজ, বাঙলা ভাষার দাবিতে।

কাদের মিঞা খালের ধার ছেড়ে মাঠের পথ ধরল।

আমরাও পেছনে পেছনে চলছি।

খালের ধারে একটা গাছের সঙ্গে সাইকেল হেলান দিয়ে সিগারেট বের করে একটা আমাকে এগিয়ে দিল। সিগারেটের প্যাকেটের ওপর স্পষ্ট করে বাঙলায় লেখা "রাইফেল্‌", দামটাও লেখা আছে।

বললাম, আমি সিগারেট খাই না। আপনিই খান।

আমাদের বাঙলা দেশের সিগারেট, তবে আর এখন পাওয়া যাবে না। খুলনা থেকে সিগারেট আসে। রাস্তা বন্ধ। এই দেখুন ওপার থেকে সিগারেট নিয়ে এসেছি। তবে দাম খুবই বেশি।

বললাম, আপনাদের একটাকা আমাদের প্রায় দেড়টাকার সমান। সেই হিসাবে দাম কিন্তু খুব বেশি নয়। আপনাদের সাপ্লাই না এলেও ভারত থেকে যথেষ্ট পরিমাণ সিগারেট ন্যায্য-মূল্যেই পাবেন। এর জন্য ভাবনা নেই। আপনার বাড়ি আর কত দূর ?

সামনের গ্রাম। চলুন। রোদে তো হয়রান হয়েছেন। বিশ্রাম করে নিতে পারবেন। কদিন খুব রোদ ছিল। কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছে। দেখেছেন তো চাষীরা মাঠে নেমে পড়েছে। কাল বৃষ্টি হওয়াতে আজ রোদের তাত একটু কম। আল্লা করে, এই বৃষ্টি কয়েকদিন নাগাড়ে হয়।

গ্রামে প্রবেশ করার পথেই বহুজনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হল। উত্তর আমাদের বিশেষ দিতে হয় নি। কাদের মিঞাই মোটামুটি উত্তর দিয়েছিল। আমরা কাদের মিঞার বাড়ির বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম। গ্রামের জোয়ান ছেলেরা হুমড়ি দিয়ে পড়ল।

কাদের মিঞার ছোট্ট দোকান যেমন আছে, তেমনি বৃত্তি হিসাবে মাষ্টারীও করে জুনিয়র হাইস্কুলে। তার ছাত্র দু'চারজন এসে মেহমানের সেবায় নেমে পড়ল।

একজন নারকেল গাছে উঠে তিনটে ডাব পেড়ে আনলো।

এই পথেই ক'জন রিপোর্টার গেছেন কয়দিন আগে। তাই ভারতের লোক দেখলেই ওরা রিপোর্টার মনে করে। পশ্চিম বাঙলা থেকে সংবাদপত্র আসে রোজই। সেই সংবাদপত্র পড়ার জন্য ভিড় জমে যায়। বাঙলাদেশের বিভিন্ন এলাকার খবর পশ্চিম বাঙলার পত্র-পত্রিকায় বের হচ্ছে। পাকিস্থানী জঙ্গীশাহীর দাপটে

বাঙলাদেশের কোন সংবাদপত্র বের হয় না, সেজন্য সংবাদ পাওয়ার একমাত্র উপায় আকাশবাণীর সংবাদ ও পশ্চিম বাঙলার সংবাদপত্র। তাই রিপোর্টার এলে ওদের কাছে বেশি খাতিরযত্ন পায়।

বললাম, এখানে বিলম্ব করে তো লাভ নেই। আমরা আরও ভেতরে যেতে চাই।

কাদের মিঞা বলল, আমিও তো যাব। আমার কয়েকটা কথা বলে আসার দরকার। আপনারা এদের সঙ্গে কথা বলুন, আমি এক্ষুনি আসছি। সাইকেলটাও রেখে আসছি।

অমল আগ্রহ সহকারে পাশের লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, আপনার নাম কি ভাই?

আমার নাম হানিফ।

আপনি কি করেন?

আমি চাষী। কিছু জমিজমা আছে তাই চাষাবাদ করে দিন কাটে কোনরকমে।

বাঙলাদেশে যুদ্ধ হচ্ছে তা জানেন তো?

নিশ্চয়। আমরাই তো লড়াই করছি খানদের এদেশ থেকে বিদায় করতে।

ওদের অত বন্দুক-কামান। পারবেন কি ওদের সঙ্গে লড়াই করতে?

ইনশাল্লা, দেশের জন্য সব পারব। আমাদের প্রয়োজন মত হাতিয়ার নেই বাবু। হাতিয়ার দিন আপনারা। সাতদিনের মধ্যে খানদের শেষ করে দেব। কাউকে ফিরতে দেব না লাহোরে আর করাচিতে। ওরা অনেক অত্যাচার করেছে। এবার আমাদের পালা। শোধ নিতেই হবে।

আমার পাশে বসেছিল একজন কিশোর। সে বলল, আমরা সবাই তৈয়ার। খোদার কসম 'খান' না মারলে আমাদের জিউ ঠাণ্ডা হবে না।

এবার বহু জন তাদের বক্তব্য পেশ করতে থাকে। সবটা বুঝতে না পারলেও মনে হল, সবাই 'খান' বিতাড়নে খুবই আগ্রহী কিন্তু বাস্তববোধ ওদের মোটেই যে নেই, তা বুঝতে বিলম্ব হল না। কারণ খুঁজতে হল না। বিগত তিন চারশ বছরের মধ্যে বাঙলাদেশকে কোন সময়ই যুদ্ধের ধাক্কা সহ্য করতে হয় নি, সেজন্য যুদ্ধটা ছেলেখেলা মনে করেই ওরা কথা বলছিল। যেন হাতের কাছে একটা লাঠি থাকলেই ওরা শত্রুকে মারতে পারে, এমনই ওদের মনের অবস্থা। তবে 'খান' সম্বন্ধে যে তীব্র ঘৃণা জন্মেছে আপামর জনসাধারণের মনে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। এই ঘৃণাই 'খান'-দের বিদায় নিতে বাধ্য করবে। অস্ত্র যে কাজ করতে পারবে না, তার অধিক কাজ করবে এই ঘৃণাবোধ।

ধীরে ধীরে উঠলাম। কাদের মিঞা তার কাজ শেষ করে আমাদের সঙ্গে আবার চলতে থাকে। চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলাম, এসব গ্রামে কোন হিন্দু নেই?

না। সবাই মুসলমান।

আগেও কি এই গ্রামে হিন্দু ছিল না?

কাদের মিঞা হাসল।

হেসে বলল, এ সবই হিন্দুর গ্রাম ছিল। রোয়েদাদে এসব এলাকা পাকিস্থানে পড়েছিল। তখনই আরম্ভ হল এপার ওপারের মানুষের চলাচল। এপার থেকে হিন্দুরা চলে গেল, ওপার থেকে মুসলমানরা আসতে লাগল। দেখতে দেখতে গ্রামের পর গ্রাম খালি হল, আবার ভর্তিও হল।

সবাই কি ঘরবাড়ি জমিজমা বদল করে গেছে?

সবক্ষেত্রে নয়। কোথাও এনিমি প্রপার্টি বলে আটক করা হয়েছে হিন্দুর সম্পত্তি, মুসলমানরা এসে দখল করেছে, আবার কোথাও সরকার থেকে আটক করে মুসলমানদের দিয়েছে, আবার কোথাও কোথাও এক্সচেঞ্জও হয়েছে, আবার কোথাও জবরদখলও

হয়েছে। ঠিক ন্যায়সঙ্গত ভাবে কতটা কাজ হয়েছে তা বলা কঠিন। তবে সবাই এখন এদিকে মুসলমান যার ফলে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধিটা আর প্রবল নয়।

সামনেই শহর। আমবাগানটা পেরোলেই শহর দেখা যাবে। এই আশা নিয়ে এগিয়ে চলেছি। পথে বহু লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে। সবাই ধুতি-পরা মানুষটির দিকে বেশ সতর্ক দৃষ্টিপাত করছে। পাকিস্থান হবার পর ধুতি-পরা মানুষের দেখা পাওয়া যায় না সহজে। হিন্দুরাও লুঙ্গি, পায়জামা পরছে। বুঝতে পারা যায় না কে হিন্দু আর কে মুসলমান। প্রতি সাতজনের একজন হিন্দু, তাই বাকি ছয়জনের আড়ালেই তারা থেকে যায়। তাদের মধ্য থেকে সহজে আবিষ্কার করা সম্ভব নয় সামান্যসংখ্যক হিন্দুদের, বিশেষ করে অপরিচিত স্থানে তো সম্ভবই নয়।

অমল এইসব দেখে একদিন মন্তব্য করেছিল, যাই বলুন কালাচাঁদ-দাদা, পাকিস্থান পয়দা হবার পর বাঙলাদেশের জাতীয়তাবোধ দৃঢ় করেছে উগ্র হিন্দুবিদ্বেষ। হিন্দু আর মুসলমানের মাঝে যে পার্থক্য তা দূর করেছে এই বিদ্বেষ। হিন্দুরা মুসলমানের পোশাককে মেনে নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এর ফলে সবাই মহামানবের সাগর-তীরে মিশে একাকার হয়েছে।

বলেছিলাম, এটা এমন কিছু আশ্চর্য ঘটনা নয়। মোগল-পাঠান আমলে হিন্দুরা চোগা-চাপকান পরে রাজদরবারে কুর্নিশ করেছে, রাষ্ট্রের সেবা করেছে। বর্তমানে তারা লুঙ্গি-পায়জামা পরে মুসলমান ভাইদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাঙালী জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার ব্রতে অংশ গ্রহণ করেছে খুব স্বাভাবিক ভাবে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যদি এখানকার হিন্দুরা মনে করত, ধুতি না পরলে হিন্দু হওয়া যায় না, তাহলে সাম্প্রদায়িকতার অবসান এত তাড়াতাড়ি ঘটত না। বর্তমানে লুঙ্গি-পায়জামা মুসলমানের পোশাক নয়, বাঙ্গালীর পোশাক। এই অনুভূতি

জেগেছে সবার মনে, সেইজন্যই বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধ এত তীব্র হয়ে উঠেছে।

অমল আমার মন্তব্যে সমর্থন জানিয়েছিল।

কিন্তু আমার পরিধানে ধুতি। পশ্চিম বাঙলায় একদিন পরিসংখ্যান নেবার জন্য কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়েছিলাম। যুবক-সম্প্রদায়ের প্রতি একশত জনের পাঁচজনও আজকাল ধুতি পরে না। আবার সবচেয়ে অনুন্নত জেলা পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলেও দেখেছি শতকরা পঁচিশজন মধ্যবিত্ত ঘরের যুবক ধুতি পরে, অবশ্য চাষীশ্রেণীর শতকরা পঁচিশজনের পরিধেয় কোন বস্ত্রই নেই, বাকি পঁচাত্তর জনের শতকরা বিশজন ধুতি পরে না।

কিন্তু বাঙলাদেশের মানুষদের ধুতি পরতে দেখেছি এক হাজার হিন্দুর মধ্যে দুই থেকে তিন জনকে।

আমরা ধুতিপরা বাঙ্গালী, আমরা প্যাণ্টপরা বাঙ্গালীর ছেলে দেখতেই অভ্যস্ত। সেজন্য লুঙ্গি-পাজামা পরা লোক দেখলে বিশেষ খুশী হয়ত হই না, কিন্তু লুঙ্গি-পাজামার ছড়াছড়ি পশ্চিম বাঙলায় তথা ভারতের হিন্দুদের মাঝেও। আমরা পশ্চিমী বিদেশী পোশাক পরি, লুঙ্গি-পাজামা পরি, আবার ধুতিও পরি। বাঙ্গালী চরিত্র হল সবকিছু মেনে নিয়ে শান্তিতে বাস করা। সেই চরিত্র এই বাঙলাদেশেও আমরা দেখতে পেয়ে, অখুশী হবার কোন কারণই নেই।

আমাদের সঙ্গী হলেন 'পরিবার পরিকল্পনা' কেন্দ্রের ফিল্ড ওয়ারকার।' গ্রাম থেকে ফিরছিলেন। আমাদের দেখেই সাইকেল থেকে নামলেন।

কোথায় যাবেন আপনারা ?

বাঙলা দেশ দেখতে।

কোন্ সংবাদপত্র থেকে আসছেন ?

আমরা সাংবাদিক নই। দর্শক মাত্র।

সবাই ও-কথা বলেন। সেদিন যুগান্তরের একজন রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফার এসেছিলেন। তাঁরাও বলেন নি। তবে নামটা বলেছিলেন। কদিন পরে যুগান্তরে ওঁদের রিপোর্ট দেখলাম। নামও দিয়েছিলেন। তখনই তো জানতে পারলাম ওঁরা রিপোর্টার।

অবিনাশ বলল, আমরা রিপোর্টার নই। তবে এখন থেকে রিপোর্টার বলেই পরিচয় দেব। অবশ্য সেই পরিচয় হবে সম্পূর্ণ মিথ্যা পরিচয়। তবে আমরা দর্শক, আমাদের দেখার সুযোগ দিলেই আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

চলুন আমার ওখানে। সেখানে বিশ্রাম করে আওয়ামী লীগ অফিসে যাবেন। সেখান থেকে কোন স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে নিয়ে আপনারা চারিদিকে ঘুরে দেখবেন। দরকার মনে করলে কুষ্টিয়া হয়ে ফরিদপুর পর্যন্ত যেতে পারবেন। এ সবই মুক্ত অঞ্চল।

নিশাত চৌধুরীর বাড়িতেই উঠতে হল।

বাজারের মাঝ দিয়ে চলছিলাম। দুপাশে দোকানের মাথায় বাঙলা দেশের পতাকা উড়ছে। আমাদের দেখে অনেকেই এল সাহায্য করতে। নিশাত চৌধুরী সবাইকে নিরস্ত করে আমাদের নিয়ে উঠলেন তাঁর বাড়িতে।

একটু চা খাবেন? আর কি-ই বা দেব। এখন তো ভারতের ওপর আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে। যদি আপনাদের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে 'খান'-রা আমাদের ভাতে-পানিতে মারার চেষ্টা করবে। তবে কি জানেন, আমরা এই দেশের মানুষ আর ওরা হল লুটেরার দল, লুটপাট করতে এসেছে, আমাদের পান্তা আর বেগুনপোড়াই যথেষ্ট। ওদের রুটি কাবাব জোটানোই মুস্কিল হবে।

কাদের মিঞা বললেন, এবার আপনারা যোগ্য লোক পেয়েছেন। আমি আমার কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে চাই। আপনারা অনুমতি দিলে যেতে পারি।

হেসে বললাম, আপনার অসীম দয়া। মোটামুটি একটা ভাল

আশ্রয় পেয়েছি বলেই মনে হয়। আপনি আমাদের পথ দেখিয়ে না আনলে গোলক-ধাঁধার মত ঘুরতে হত। আপনার দয়ার কথা অনেকদিন মনে থাকবে।

কাদের মিঞা বিদায় নিলেন।

নিশাত চৌধুরী পর্দা ঠেলে ভেতরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে আবার চেয়ার টেনে আমাদের সামনে বসে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিলেন। সিগারেট ভারতে তৈরী 'পানামা'। আমি যে ধূমপান করি না তা নিবেদন করে বললাম, একটু জল পেলেই ভাল হয়।

অবশ্যই। আমারই ভুল হয়ে গেছে। আপনারা অনেক পথ হেঁটে এসেছেন। পিপাসা নিশ্চয়ই পেয়েছে। বলতে বলতে আবার পর্দা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলেন। এবার ফিরে যখন এলেন তখন তাঁর পেছন পেছন এলেন তাঁর স্ত্রী কাঁচের জগে জল আর কাঁচের গেলাস নিয়ে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। মুসলমান পর্দানশীন মেয়েদের কথাই শুনেছি। আজ সাক্ষাৎ মুসলমান মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহবধূকে জল হাতে করে আসতে দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না। পর্দাটা খানদানী মুসলমানদের একচেটিয়া, কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম একটা কথা। বাঙ্গালী অর্থবান মুসলমানদের যে পর্দাব্যবস্থা, তা নীচের তলার মানুষের মধ্যে প্রবেশ করেনি। অবাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে এটা ব্যাধিরূপেই দেখা যায় ভারতের যত্রতত্র। বাঙলার মুসলমানদের, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী মহলে, এই পর্দা বিশেষভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। যাও বা ছিল ভারত বিভাগের আগে, তা আর নেই।

আমার খেয়াল ছিল না। মিসেস চৌধুরী জলের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে। তাঁর কণ্ঠস্বরে খেয়াল হল, আমি পিপাসার্ত। মিসেস চৌধুরী বললেন, এই নিন, পানি খান।

আমি গেলাসটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে জলে চুমুক দিলাম।

নিশাত চৌধুরী বোধহয় আমার মনের অবস্থা কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন, আমার স্ত্রী।

বললাম, আদাব।

মিসেস চৌধুরী মৃদু হেসে অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দিয়ে আবার গেলাস ভর্তি করে অমলের হাতে তুলে দিলেন।

নিশাত চৌধুরী বললেন, আমরা জল খাই। ওরা জল পান করে। আমরা পর্দা ছিঁড়ে মেয়েদের মুক্ত আলোবাতাসে আসতে দিয়েছি, ওরা পর্দা শক্ত করে মেয়েদের চার দেওয়ালের মাঝে আটকে রাখতে বদ্ধপরিকর। আমাদের আর খানদের কোথায় তফাত, তা এ থেকেই বুঝতে পারছেন।

আপনারা তো পাকিস্থান চেয়েছিলেন।

আমার কথা বলতে পারি, তখন আমার বয়স সাত বছর। তখন পাকিস্থানও বুঝতাম না, হিন্দুস্থানও বুঝতাম না। মুরুব্বীরা পাকিস্থান চেয়েছিল। তারা পেয়েওছিল; তবে পোকাখাওয়া পাকিস্থান, যা গত বাইশ তেইশ বছর ধরে পচতে পচতে দুর্গন্ধে ভর্তি করেছে বাঙলার আকাশ বাতাস।

মনে করুন যদি তা না হত।

অত জানি না মশায়। এই যে চা এসে গেছে। খেয়ে নিন। তারপর কথা হবে।

মিসেস চৌধুরী তাড়াতাড়ি ডিম ভেজে এনেছেন চায়ের সঙ্গে।

নিশাত চৌধুরী বললেন, আমিও ঢাকার ছাত্র। আমার স্ত্রী রাজসাহী থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। আমরা বাঙলা দেশের দুই প্রান্তের খবর বলতে পারব।

মিসেস চৌধুরী বললেন, পাঞ্জাবী আর বাঙ্গালী, পাঠান আর বাঙ্গালী, বেলুচ আর বাঙ্গালী, সিন্ধী আর বাঙ্গালী,—একই কৌমের অংশীদার, কারণ তারা মুসলমান। এই তত্ত্বকথা আমাদের শোনানো

হয়েছে প্রথমাবধি। কিন্তু একই কৌমের মানুষের অধিকার যে সমান হবে, একথা স্বীকার করল না পশ্চিম পাকিস্থানীরা। তারা জোর করে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করছিল তাদের ইচ্ছা। সংঘর্ষ আরম্ভ এইখানেই।

নিশাত চৌধুরী বললেন, সমস্বার্থ, সমমর্যাদা, সমান অর্থনৈতিক বণ্টন, সমভাবে উন্নতিলাভের জন্য প্রগতিশীল ব্যবস্থাই ঐক্য এবং সংহতিকে বজায় রাখে। ধর্ম দিয়ে কোন ঐক্য ও সংহতি গড়ে ওঠে না, এই সহজ সরল সত্যটি আমাদের মুরুব্বীরা কেন বুঝতে পারে নি তা আজ আমরা ঠিক করতে পারছি না। তাদের অন্ধ সাম্প্রদায়িক বোধ আজ যে জটিলতার সৃষ্টি করেছে, তার ভয়ঙ্কর চেহারা দেখলে ভয়ে শিউরে উঠতে হয়। আমরা এখনও মুক্ত, কিন্তু যে-কোন সময় 'খান'-রা আমাদের ওপর হামলা করতে পারে। পরিণাম হয়ত ঢাকার চেয়েও খারাপ হতে পারে।

নিশাত চৌধুরী থেমে গিয়ে কি যেন ভাবলেন।

পাশের ঘরে শিশুর কান্নার শব্দ। মিসেস চৌধুরী পর্দা ঠেলে ভেতরে গেলেন।

নিশাত চৌধুরী বললেন, আমরা মরতে প্রস্তুত।

বললাম, আপনারা মানে বুদ্ধিজীবীরা তো? পাকিস্থানের বড় শত্রু হল বাঙলার বুদ্ধিজীবীরা। শিক্ষার প্রসার ঘটতেই বিগত বিশ বাইশ বছরে বাঙলায় নতুন একটা শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। সেই শ্রেণী হল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। এক সময় এদের একটা অংশকে চাকরি দিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে, মুসলীম লীগের প্রচার কাজে নামিয়েছিল, এখন এই বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীই অর্থনীতির ক্ষেত্রে পাকিস্থানীদের শঠতা তুলে ধরেছে জনসাধারণের সামনে, যার পরিণতি হল আজকের রাজনৈতিক আবর্ত আর সশস্ত্র প্রতিরোধ।

নিশাত চৌধুরী বললেন, কথাটা ঠিক। সেইজন্য সর্বপ্রথম

পাকিস্থানী হানাদাররা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আওয়ামী লীগের নেতা, শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীদের হত্যা করেছে। এদের বর্বরতার কাহিনী লেখার মত কলঙ্কিত পৃষ্ঠাও হয়ত ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ধর্ষণ করেছে, হত্যা করেছে। চিন্তা করতে পারেন বর্তমান সভ্য জগতে এই রকম পাপকার্য আজও হতে পারে!

অনেকক্ষণ ছাদের দিকে তাকিয়ে থেকে নিশাত চৌধুরী বললেন, ভাবছি আমার স্ত্রীকে সন্তানসহ ভারতে কোন নিরাপদ এলাকায় পাঠিয়ে দেব, আর আমি রইব লড়াই করতে।

আমাদের ছোটবেলা থেকে শেখাবার চেষ্টা হয়েছে, হিন্দু আমাদের মহাশত্রু, ইসলামের একমাত্র দুশমন হল ভারতীয় হিন্দুরা। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস দেখুন, আজ যারা প্রাণ ও মান বাঁচাতে ভারতে যাচ্ছে হিন্দুদের আশ্রয়ে, তাদের শতকরা সত্তর ভাগই হল মুসলমান। এই মুসলমানদের সাদরে আশ্রয়, আহার্য, বস্ত্র দিচ্ছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে হিন্দুরা। ভারতের মুসলমানরা কিন্তু এগিয়ে আসেনি এখনও। অতি নগণ্য সংখ্যক ভারতীয় মুসলমান আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছে। ওরা পাকিস্থান চায়, যে পাকিস্থান বাঙ্গালীদের শোষণ করবে, পুরুষদের ক্রীতদাসের জীবন যাপন করতে বাধ্য করবে, নারীদের বাধ্য করবে গণিকার জীবন যাপন করতে। এরা ভারতে বসেও পাকিস্থানের মঙ্গল চায়। বাঙ্গালী হয়েও বাঙ্গালীর মঙ্গল চায় না।

পাকিস্থান সৃষ্টি হতে-না-হতেই বাঙলার মুসলমানরা বুঝতে পেরেছিল তাদের অসহায় অবস্থার কথা। তখনও পাকিস্থানীরা হিন্দুনিধন, হিন্দুর সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া, হিন্দু নারী ধর্ষণের অবাধ সুযোগ দিয়েছিল সমাজবিরোধীদের, সেইসময় আমাদের দেশে যে সামান্য সংখ্যক বুদ্ধিজীবী পাকিস্থানীদের এই অপকার্যের প্রতিবাদ জানিয়েছিল, তাদের কথা কেউ শোনে নি। অথচ অসন্তোষ সৃষ্টি

হয়েছিল আটচল্লিশ সাল থেকেই। স্বাধীনতা প্রাপ্তির এক বছরের মধ্যেই।

আগুনটা জ্বলল বাহান্ন সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। নাজিমুদ্দিন তখন প্রধানমন্ত্রী, আর নুরুল আমিন হল মুখ্যমন্ত্রী। ক'দিন আগে যে নুরুল আমিনের বক্তৃতা শোনাল পাকিস্থান সরকার, এই সেই নুরুল আমিন। পূর্ব পাকিস্থান শান্ত, সর্বত্র স্বাভাবিক জীবন, এই ফতোয়া দিল নুরুল আমিন। তাকে এই ফতোয়া দিতে বাধ্য করেছে বলে গুজব রটেছে, কিন্তু যারা নুরুল আমিনকে চেনে, তারা নির্দিষ্টভাবে বলতে পারবে ব্যক্তিস্বার্থের জন্য নুরুল আমিন যে-কোন পাপকার্য করতে পারে। জালিম মীরজাফর ওই নুরুল আমিন। ওকে বিশ্বাস নেই। পাকিস্থান সরকার এই মীরজাফরকে সামনে রেখে বাঙলার সর্বনাশ করতে চায়।

নাজিমুদ্দিন আর নুরুল আমিন বলল, উর্দু হবে রাষ্ট্রভাষা। প্রতিবাদ করল ছাত্ররা।

আমার বয়স তখন বার তের বছর।

আমরা স্বাধীন দেশে প্রথম শুনলাম টিয়ার গ্যাসের শব্দ, চোখ-মুখ-নাক-জ্বালানো বাতাসের সঙ্গে পরিচয় হল সেই স্মরণীয় দিনে, একুশে ফেব্রুয়ারী।

হরতাল ডেকেছে ছাত্ররা। আমি ছাত্র, তবে নওজোয়ান নই। তাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ, দোকানপাট বন্ধ, সব কিছুই বন্ধ!

বিধানসভার অধিবেশন চলছে জগন্নাথ হলে। তখনও বিধান-সভা ভবন তৈরী হয় নি।

নুরুল আমিন সহজে নতি স্বীকার করার মত লোক নয়।

একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারী করল বিধানসভার চারদিকে।

দরকার ছিল না এই ব্যক্তিস্বাধীনতা দমনের আইনের। নুরুল আমিন ইতস্ততঃ করেছিল, কিন্তু অবাঙ্গালী মুখ্য সচিব আজিজ

আমেদ নানা যুক্তি দিয়ে বাধ্য করেছিল এই বিধিনিষেধ জারী করতে।

বিধানসভার সদস্যরা বলেছিল, কি দরকার এই বিধিনিষেধের। যত বেশি বিধিনিষেধ দেওয়া হবে, আন্দোলন তত বেশি জোরদার হবে। এটা হবে provocation, কিন্তু ক্ষমতামদমত্ত অবাঙ্গালীর পদলেহী দেশদ্রোহী নুরুল আমিন কোন যুক্তিই শোনে নি।

ইংরেজের পুলিশ। পূর্ববঙ্গে আর পশ্চিমবঙ্গে এদের একই চরিত্র। নুরুল আমিন পুলিশের উপরই নির্ভরশীল। ছাত্ররা বিধিনিষেধ মানতে রাজী নয়। তাদের দাবি বাঙলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। এই দাবি জানাতে তারা বিধানসভায় আসবেই।

দল বেঁধে তারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হবে স্থির করল।

অকস্মাৎ তারা মত বদলে স্থির করল, দশজনের এক একটা দল গড়ে তারা আইন ভঙ্গ করবে। এতে কোন হাঙ্গামা হবে না, অথচ তাদের আন্দোলনকে জোরদার করা হবে।

দশজনের এক একটি দল বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনা পেরিয়ে বেরিয়ে আসতেই, পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করল আইনের মর্যাদা রক্ষা করতে। এইভাবে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করার পর জনসাধারণ দেখতে পেল এইসব অহিংস আন্দোলনকারীদের ওপর শারীরিক বলপ্রয়োগ করছে পুলিশ।

ইতিমধ্যে পাকিস্থান সরকার থেকে প্রচার করা হয়েছে, ভাষা-আন্দোলন আর কিছুই নয়, হিন্দুদের আন্দোলন এবং ভারতীয় কম্যুনিস্টরা গোপনে এই আন্দোলন পরিচালনা করছে।

লীগের সমাজবিরোধীরা হিন্দু শায়েস্তা করতে হাজির।

তারাই সক্রিয় হল ছাত্রদের শায়েস্তা করতে। ইটপাথর ছুঁড়তে থাকে তারা। তাদের ইট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কিছু পুলিশের গাড়িতেও পড়ল। পুলিশ তার তাণ্ডব শুরু করার সুযোগ পেল।

ভাষা-আন্দোলনকে চিরতরে কবরস্থ করার সুযোগ খুঁজছিল। সমাজবিরোধী মুসলীম লীগের অনুচররা সেই সুযোগ সৃষ্টি করে দিল। পরিকল্পনা অনুসারেই কাজ হাসিল।

পুলিশী তাণ্ডব শুরু হল।

প্রথমে টিয়ার গ্যাস, তারপর গুলী।

বাঙলা মায়ের মর্যাদা রক্ষা করতে, মায়ের মুখের ভাষাকে রক্ষা করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তিনটি অমূল্য জীবন। বরকত, রফিক ও জব্বার। তিন শহীদ রক্ত দিয়ে রাঙালো বাঙলার মাটি, মায়ের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করতে।

একুশে ফেব্রুয়ারীর ডাক।

'মোদের গরব মোদের আশা, আ-মরি বাঙলা ভাষা।'

সেই ডাক শুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঙলার তিন তুলাল বুকের রক্ত দিতে।

একুশে ফেব্রুয়ারীর সকাল তখনও হয়নি। বিশে ফেব্রুয়ারীর রাতে দেওয়ালে দেওয়ালে ছাত্রদের দৃপ্ত লেখনী লিখেছে, "আওয়াজ তুলুন, রাষ্ট্রভাষা বাঙলা ভাষা চাই।" "বাঙলা ভাষা জিন্দাবাদ!"

আমি যত সহজে ও সংক্ষেপে বলছি ঘটনাটা, অত সহজে কিন্তু তা ঘটেনি।

বাঙলা ভাষার বড় সমর্থক ছিল 'পাকিস্থান অবজারভার' পত্রিকা। ভাষা-আন্দোলন দমনের জন্য সরকার ঐ পত্রিকা বন্ধ করে দিল। মুসলীম লীগ বাঙলা ভাষা বিরোধী। তাদের কথা বাদ দিন। যারা আইনসভায় বিরোধী পক্ষ, তারা স্থির করল, ছাত্ররা যদি আইন অমান্য করে, তা হলে তাদের কেউ সমর্থন করবে না।

সবচেয়ে সত্যকথা হল, এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল ছাত্রদের, প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল ছাত্রদের। সেদিন সরকার বিরোধীদের ভূমিকা খুব প্রশংসনীয় ছিল না। তারা একশ'

চুয়াল্লিশ ধারার নিষেধ-আজ্ঞা অমান্য করার বিরোধী ছিল। লড়তে হয়েছিল ছাত্রদের এককভাবে।

প্রথম বিঘ্ন—বিধিনিষেধ; দ্বিতীয় বিঘ্ন—হিন্দুদের ও কম্যুনিস্টদের আন্দোলন বলে একে সমাজবিরোধীদের হাতে তুলে দেবার চেষ্টা; তৃতীয় বিঘ্ন হল,—আইনসভার বিরোধীদলের উদাসীনতা। এইসব বিঘ্ন সত্ত্বেও সেদিন ছাত্ররা তাদের ন্যায্য দাবিতে ছিল অটল। তারা আইন অমান্য করতে বদ্ধপরিকর।

ছাত্রনেতা আব্দুল মতিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসভায় বললেন, "মা সজল চোখে তাঁর অপমানের প্রতিকার করতে ডাক দিয়েছেন। আপনারা সেই ডাকে সাড়া দিয়ে একশ' চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করবেন, অথবা ভাল ছেলেটির মত ঘরে ফিরে যাবেন? আপনারা স্থির করুন।"

উত্তেজিত ছাত্রা চিৎকার করে উঠল, আমরা একশ' চুয়াল্লিশ ধারা মানি না, মানব না।

নিশাত চৌধুরী থামলেন।

মিসেস চৌধুরী আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, আজও হাজার হাজার মায়ের চোখ ভেঙে অশ্রুর বন্যা নেমেছে। এই অশ্রু মোছাতে হবে আমাদের বুকের রক্ত দিয়ে, স্বেচ্ছায় শত্রুকে মেরে কোরবানী হতে হবে। জান কোরবানী না করলে খোদার রাজ্যে কোন মঙ্গল আসতে পারে না।

নিশাত চৌধুরী আবার বললেন, আমি তখন ছোট ছিলাম। অত বুঝতাম না।

দূর থেকে শুনতে পেলাম পুলিশের শাসানি। মিছিল করলেই গ্রেপ্তার করা হবে।

ছাত্ররা অটল।

তারা কোন বাধা মানবে না বাঙলা মায়ের দাবি স্বীকার না করা অবধি।

পুলিশ আইনের মর্যাদা রক্ষা করতে টেনে-হেঁচড়ে ছাত্রদের তুলতে থাকে বন্দী গাড়ীতে। তার পরের ঘটনা তো আপনাদের বলেছি।

টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা রক্ষা করা যাদের কর্তব্য, তারাই অপবিত্র করল বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর। ছাত্ররা ভাবতেও পারেনি এইভাবে ছাত্রদের ওপর আক্রমণ চালাতে এগিয়ে আসবে পুলিশ। টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর ছুটোছুটি আরম্ভ হল। ছাত্ররা আরও দৃঢ় হল আইন ভঙ্গ করতে।

ছেলেরা আশ্রয় নিচ্ছে নিরাপদ স্থানে।

পুলিশ তাদের পেছু নিচ্ছে লাঠি বন্দুক হাতে করে।

মেডিক্যাল কলেজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়াতে রুগীরা পর্যন্ত অস্থির। টিয়ার গ্যাসে আহতদের আনা হচ্ছে মেডিকেল কলেজে, কিন্তু কে তাদের সেবা করবে? ডাক্তার, নার্স সবাই তখন প্রাণ বাঁচাতে অস্থির।

পুলিশ ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ আক্রমণ করেছে। ছাত্ররা ছুটছে আত্মরক্ষার জন্য। চিৎকার শোনা যাচ্ছে, বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে। আমরা বাঙলা চাই,—চাই,—চাই।

পুলিশের একজন দারোগা এসে বলল, ছাত্রদের দুজন বিধান-সভায় যেতে পারবে তাদের বক্তব্য বলতে।

বক্তব্য বলতে যাবার অবসর দিল না। শোনা গেল গুলীর শব্দ। পুলিশের জহ্লাদ তখন সক্রিয়।

একজন কিশোরকে ধরাধরি করে নিয়ে এল মেডিক্যাল কলেজে। ভাষা আন্দোলনের প্রথম আহত। রক্তে তার জামা-পাজামা ভিজে লাল হয়ে গেছে।

গুলী! গুলী!

গুলী করছে পুলিশ। ত্রাস সৃষ্টি হল সর্বত্র। ডাক্তার, নার্স

চোখে প্যারাফিন দিয়ে চোখ মুছছে আর কাজ করছে। আরেক-জনকে আনা হল হাসপাতালে।

ডাক্তার বলল, প্রথম শহীদ জব্বার।

দ্বিতীয় শহীদ এল তারপর। রফিক।

আহতে ভরে গেল হাসপাতাল। জায়গা নেই। একস্ট্রা বেড দাও। চিৎকার করছে ডাক্তাররা।

মুখের ভাষা কেড়ে নেবার এই তাণ্ডব চলছে।

সবার শেষে এল বরকত। চিৎকার করে বলল, আমার বাড়িতে একটু খবর দেবেন। একটু পানি।

পল্টন লাইনে বরকতের মায়ের কাছে সংবাদ পৌঁছল। পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র বরকত। আর একটা বছর পরেই সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ পাশ করে হয়ত পুলিশসাহেবই হতে পারত। তা আর হল না। পাগলের মত বরকতের বৃদ্ধা মা ছুটে এল। তখন সব শেষ। বিধবার শেষ সম্বল, অন্ধের নড়ি কবরে স্থান নিল শহীদের গৌরব নিয়ে।

তারপর যখন বড় হলাম তখন বুঝতে পারলাম, আমরা বাঙ্গালীরা দাসের জাত। আমাদের দাসত্ব করতে হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্থানের জঙ্গী শাসকদের। আর এই জঙ্গীশাসন কায়েম রাখতে যেমন তৎপর মুসলীম লীগ, তেমনি তৎপর সব ধর্মধ্বজীরা।

এরপর এল নির্বাচন।

তিন শহীদের রক্ত ব্যর্থ হল না। মানুষ বুঝতে শিখেছে কিছুটা। মুসলীম লীগ যে বাঙলাদেশের সর্বনাশ করেছে, এ-বিষয়ে সন্দেহ আর কারও রইল না। তাই সবার আগে দেশের শত্রু মুসলীম লীগকে নির্মূল করার শপথ নিল বাঙলার নওজোয়ানরা। তারা বুঝেছিল, হিন্দুদের আর কম্যুনিস্টদের ওপর দোষারোপ করে এতকাল যে শাসনব্যবস্থা চলছে, তা কেবলমাত্র কতকগুলো জোচ্চোর শোষকের স্বার্থরক্ষা করতে। এর শেষ চাই।

অসংখ্য আহতের রক্ত, তিনজন শহীদের রক্ত ব্যর্থ হয়নি কালাচাঁদবাবু। পর পর ওরা চেষ্টা করেছে দাঙ্গা বাধাতে, আমরা বার বার বাধা দিয়েছি। আমরা চাই না হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হোক, আর সেই সুযোগে বাঙলার মানুষদের ওপর শোষণ কায়েম থাকুক।

নিশাত চৌধুরী কিছুক্ষণ থামলেন।

মিসেস চৌধুরী বললেন, আপনাদের কোন আশ্রয় আছে কি ?

আমাদের আশ্রয় গাছতলা। গাছতলাকে আশ্রয় করেই পথে বেরিয়েছি।

তা তো ঠিক, কিন্তু খাবেন কি ? এখানে বাজার-হাট বেলা বারোটায় বন্ধ হয়ে যায়। হোটেলে খেতে পাবেন না, তা তো জানেন না !

বললাম, বাঙলা দেশে আমাদের মা-বোনের কি অভাব আছে ? তারা নুন-ভাত খেলে আমাদেরও একটি অংশ না দিয়ে পারবেন কি ! —বলেই হাসলাম।

মিসেস চৌধুরী হেসে বললেন, জোর করে দাওয়াত নেবেন বুঝি !

আমরা যে আপনাদের অতিথি, সারা বাঙলা দেশের অতিথি। আপনাদের আশ্রয়ে এসেছি, আমাদের কি শুধুহাতে বিদায় করতে পারবেন ?

নিশাত চৌধুরী বললেন, নিশ্চয় নয়। কিন্তু আপনারা যে উদ্দেশ্যে এসেছেন, তা সফল করতে হলে কয়েক দিন বাঙলা দেশে থাকতেই হবে।

থাকার জন্যই এসেছি। তবে এখানে নয়। রাতের বেলায় পথ চলব। নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখব। রাতের বেলায় পথ চলা নিরাপদ তো ?

নিশাত চৌধুরী বললেন, থানার বড়-দারোগা কালকে বলছিলেন,

no crime report from 25th March. চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি কে করবে ? সবাই এখন দেশের জন্য লড়াই-এ নেমে পড়েছে।

এই শহর দেখে তো মনে হচ্ছে না বাঙলাদেশে যুদ্ধ চলছে। তবে ঘরে ঘরে বাঙলাদেশের পতাকা দেখে মনে হচ্ছে এটা মুক্ত অঞ্চল, এখানে পাকিস্থানী শাসনব্যবস্থা আর নেই।

বড়-দারোগা বললেন, আগে গরু চুরি করে নিয়ে আসত ভারত থেকে। তার হদিস আর হত না। এখন ওপার থেকে গরু-ভেড়া-ছাগল চুরি করে আনলে সঙ্গে সঙ্গে তা মালিককে ফেরত দেওয়া হচ্ছে। ওপারের থানায় রিপোর্ট হলে তারাও বাঙলাদেশের গরু-ভেড়া-ছাগল এপারে ফেরত পাঠাচ্ছে। অর্থাৎ সদ্ভাব ও সম্প্রীতি রক্ষার চেষ্টা করছি আমরা ও আপনারা। 'খান'দের মগের মুল্লুক আর নেই। চলুন এবার আওয়ামী লীগের অফিসে। পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসি। বিবিসাহেব, তিনজন মেহমানের জন্য নুন-ভাতের ব্যবস্থা যেন হয়।

চারজনে পথে বের হলাম।

অন্ধকার নেমেছে। আকাশে চাঁদের মৃদু আলো। শহরের দোকানপাট বন্ধ। ইলেকট্রিক সাপ্লাই বন্ধ। পথে লোক-চলাচলও বিশেষ নেই। রিক্শা দু'চারখানা চলছে।

বললাম, একেবারে শ্মশানের মত নিস্তব্ধ!

উপায় নেই। যে-কোন সময় হাওয়াই হামলা হতে পারে। আমরা বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু আমাদের সামর্থ্য অতিশয় সীমাবদ্ধ; জনবল আছে, অস্ত্রবল নেই। সেজন্য সতর্ক থাকাই আমাদের প্রধান শক্তি মনে করি।

অমল বলল, না চৌধুরীসাহেব। সতর্ক থাকার চেয়ে বড় শক্তি অপরপক্ষকে সব সময় আক্রমণ করে সতর্ক রাখা। আপনাদের জনবল আছে, মনোবল আছে,—কিন্তু নেই অস্ত্র। অস্ত্র যা পেয়েছেন তাই যথেষ্ট। তবে যেভাবে আপনারা শত্রুর মোকাবিলা

করতে চান, সেভাবে জয়লাভ সম্ভব হবে কিনা বলা কঠিন। অবশ্য যুদ্ধ করেই যুদ্ধ শিখতে হয়। আপনারাও শিখবেন। স্ট্রাটেজি ও ট্যাকৃটিস বদলাবে।

আমরা যদি অস্ত্রের সাহায্য পেতাম, তাহলে আগামী তিরিশ তারিখের মধ্যে খানদের সমুদ্রের পানিতে ঠেলে দিতে পারতাম।

সেটাও কল্পনা। যুদ্ধ চলবে। খানরা পর্যুদস্ত হবে শুধু বুলেটে নয়—অর্থনৈতিক অবরোধে, রসদ বন্ধ হলে, অসহযোগে অর্থাৎ চারদিক থেকে তাদের আক্রমণ করতে হবে। তবেই সাফল্য এবং তার জন্য প্রয়োজন দৃঢ় নেতৃত্ব। ইংরেজিতে যাকে বলে logistic, অর্থাৎ সমর সম্বন্ধীয়; এবিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ তিনি যেমন নেবেন যুদ্ধ পরিচালনা করার দায়িত্ব, তেমনি রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে হবে। অবশ্য দুটো কাজই একটি সামগ্রিক নেতৃত্বের অধীনে কাজ করবে। যুদ্ধে democracy নেই, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে; এখানে শক্ত হাতে হাল ধরার লোক চাই।

কথা বলতে বলতে আওয়ামী লীগের অফিসে হাজির হতেই সবার দৃষ্টি পড়ল আমাদের দিকে।

হাত বাড়িয়ে দিলেন ডাক্তার সাহেব। বললেন, আপনাদের পরিচয়?

আমরা কলকাতা থেকে আসছি। বাঙলা দেশের মুক্তিযুদ্ধের অবস্থা দেখতে।

আপনারা রিপোর্টার?

না, আমরা রিপোর্টার নই। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আপনাদের সংবাদ আমরা ছাপতে দিতে পারব না। তবে আমরা আপনাদের অবস্থা ও তার পরিণতি যে দরদভরা মন নিয়ে দেখব, তার সুদূরপ্রসারী কোন ফল হয়ত হবে। আমরা কলকাতা ফিরে সবাইকে বলতে পারব, বলব বাঙলা দেশের কথা। এইটুকুই আমরা পারব। তবে যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে, যে বাস্তবতাবোধ দিয়ে

আপনাদের আমরা দেখব, ঠিক সেই দৃষ্টিভঙ্গী আর বাস্তবতাবোধ সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের সাধারণতঃ থাকে না। তারা ঘটনা যা দেখে তাই লেখে, যা শোনে তাই শোনায়। আমরা বোধহয় তা করব না।

এই যে আমাদের জয়েণ্ট সেক্রেটারী গোলাম সাহেব এসেছেন। এর সঙ্গে কথা বলুন। এরা কলকাতা থেকে এসেছেন বাঙলা দেশের মুক্তিযুদ্ধ দেখতে।

রিপোর্টার ?

আজ্ঞে না। আপনারা রিপোর্টারকে বোধহয় বেশি পছন্দ করেন ? শুনছিলাম, রিপোর্টারদের নাকি বেশি খাতির-যত্ন করেন।

দেখুন, আমাদের কোন প্রচার-ব্যবস্থা নেই। ভারতের সংবাদ-পত্রের সাহসী রিপোর্টাররা আমাদের দুঃখদুর্দশার বিষয়, পাকিস্থানী হানাদারদের নারকীয় কাণ্ডের বিষয় যদি প্রকাশ ও প্রচার না করতেন, তা হলে বিশ্বজনমত গঠন হত না। সেজন্য আমাদের প্রয়োজনেই তাদের সবকিছু দেখাতে চেষ্টা করি। অবশ্য এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, অন্যরা আমাদের প্রতি সহানুভূতিহীন এবং তারা আমাদের সবকিছু না জানুক। সবাইকে আমরা ডেকেছি হানাদারদের অত্যাচারের রূপ দেখতে, সবাইকে আমরা বলছি—দেখুন, সবাইকে বলুন, প্রতিকার করুন।

অমল বলল, আমরাও এসেছি আপনাদের ডাক শুনে। আজ আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার সুযোগ দিলেও আমরা তা করব।

গোলাম সাহেব বললেন, অবশ্যই এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। ভারতবর্ষ আমাদের যেভাবে সাহায্য করছে, তার জন্য বাঙলা দেশের মানুষ চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। তবে আমরা চাই না ভারতের মানুষ বাঙলা দেশে এসে যুদ্ধ করুক। তেমন কেউ চেষ্টা করলে আমরা বাধা দেব। যুদ্ধ আমরা করব, তবে আমাদের সাহায্য

করুন। আমাদের অস্ত্র দিন, ওষুধ দিন, অন্যান্য জিনিস দিন। আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ চালাতে সাহায্য করুন।

আমি বললাম, অস্ত্র দেওয়াটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে ভারত সরকারের ওপর। ভারত সরকার অস্ত্র না দিলে, অথবা অন্য কোন দেশের অস্ত্র ভারতের মধ্য দিয়ে আসতে না দিলে, দেশের মানুষের বর্তমান অবস্থায় কিছু করার নেই। অন্য যে-সব সাহায্য জন-সাধারণ করছে, তা অবশ্যই পাবেন। কোটি কোটি টাকার মাল পাবেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পাবেন। তবে তার জন্য মূল্যও দিতে হবে না।

আমাদের আশঙ্কা আছে বর্ষাকালে খাদ্যের অভাব ঘটতে পারে। 'খান'-রা যেভাবে খাদ্যশস্য নষ্ট করছে, লুটতরাজ করছে, তাতে খাবারের অভাব দেখা দিতে পারে।

অমল বলল, যদিও ভারতে খাদ্যাভাব, বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করতে হয়, তবুও প্রতিবেশী বাঙলার মানুষ না খেয়ে থাকবে এটা ভারতের মানুষ সহ্য করবে না। আপনাদের জন্য আমরা একবেলা খেয়েও সাহায্য করব, অবশ্য এটা কোন অফিসিয়াল ঘোষণা নয়, বাঙলাদেশের জন্য পশ্চিমবাঙলার সাধারণ মানুষের এই হল মনের কথা। আপনারা জয়লাভ করুন, আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে সাহায্য করব ঠিকই, আর আপনাদের সঙ্গে আমরাও বিজয়-উৎসব করব।

আমি বললাম, আজ তো রাত হয়ে গেছে। আগামীকাল আপনাদের প্রস্তুতিটা দেখলে খুশী হব। কাল বিকালেই এই শহর ছেড়ে এগিয়ে যেতে চাই। এটা তো বর্তমানে শান্তিপূর্ণ মুক্ত অঞ্চল। আমরা অশান্ত অঞ্চলে যেতে চাই—কুষ্টিয়া অথবা যশোহরে। আমরা প্রত্যক্ষ করতে চাই যুদ্ধের অবস্থা।

এতবড় বিপদের ঝুঁকি নিতে চান কেন? আপনারা ভারতীয়। ধুতিপরা ভারতীয়। খানরা দেখামাত্র আপনাদের হত্যা করবে

তা কি জানেন না! বাঙালী মাত্রেই ওদের শত্রু। সেজন্য ওদের প্রয়োজন হয় না শত্রু-মিত্র বিচার করার। বাঙলা-ভাষাভাষী দেখলেই তাকে হত্যা করছে। রাস্তার দুপাশের বাড়িঘর পুড়িয়ে চলাচলের রাস্তা নিরাপদ করে রাখছে। যাতে কোন গ্রাম থেকে হামলা না আসে, তার জন্য রাস্তার ধারের কোন গ্রামেই একটিও জীবন্ত মানুষকে রেখে আসছে না।

যেভাবে আপনি গোলাম সাহেব বলছেন, তা শুনে হৃদ্‌কম্প হওয়াই উচিত; কিন্তু আমরা মরব বলেই এসেছি। অবশ্য যুদ্ধ করে মরব না, যুদ্ধ দেখে মরব। ভারতবর্ষে দুটো ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কথা জানি। একটা হল চীন-ভারত সংঘর্ষ, অপরটি হল ভারত-পাক সংঘর্ষ। এ দুটো দেখা আমাদের ভাগ্যে জোটে নি। হিমালয়ের বরফে গিয়ে যুদ্ধ দেখা তো সম্ভব নয়, আর কাশ্মীর-পাঞ্জাব সীমান্তে যাবার সুযোগও হয়নি। সেজন্য নিজের বাড়িতে আর ভাড়াটিয়া বাড়ির পাশে যে যুদ্ধ তা না দেখে আর যাব না। পলাশীর মাঠে যে দাঙ্গা হয়েছিল, তার আগে একশত বৎসর ও পরে প্রায় দুইশত বৎসরে বাঙলাদেশে কোন যুদ্ধ হয়নি বলেই জানি। বাঙলার মানুষ যুদ্ধটা যে কি জিনিস তা আজও জানে না। সেজন্য যুদ্ধটা দেখা দরকার মনে করেই আমরা এসেছি।

গোলাম সাহেব দুঃখের হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন, আপনারা যুদ্ধকে নেহাত ছেলেখেলা মনে করেন মনে হচ্ছে। তবে বাঙলা দেশের যুদ্ধ হিংসায় আর অহিংসায়। অস্ত্রশালী ও নিরস্ত্রদের। দেখবেন শক্তিশালী খানদের অত্যাচারে হাজার হাজার মানুষের লাশ পথে-ঘাটে পড়ে আছে, শেয়াল-কুকুরে টানাটানি করছে। এটা ঠিক যুদ্ধ নয়। হানাদারী। হানাদারদের রুখতে আমরা সমবেত-ভাবে চেষ্টা করছি। দেখা যাক কি হয়। তবে আপনারা যদি নেহাত যেতে চান, তাহলে কাল সকালে এস্.ডি.ও. সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন। সেটাই ভাল হবে। উনি আপনাদের সব বুঝিয়ে

দিতে পারবেন। আমরা সংগঠন চালিয়ে চলছি। এস্.ডি.ও. সাহেব যুদ্ধ পরিচালনা, প্রশাসন পরিচালনা—সবকিছুর দায়িত্ব নিয়েছেন। আমাদের পরামর্শমত উনি কাজ করছেন।

লণ্ঠনের মৃদু আলোতে গোলাম সাহেবের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। আমরা অবাক হয়ে তাঁর মুখের চেহারাটা দেখছিলাম। ফোন বেজে উঠতেই গোলাম সাহেব ফোন তুলে ধরলেন।

হ্যালো, হাঁ। দেখুন, আপনারা যারা হিন্দু, তারা যদি এসময় দেশ ছেড়ে চলে যাবার চেষ্টা করেন। হাঁ। মেয়েদের পাঠিয়ে দিতে চান? দেখুন, তাতে আমাদের আপত্তি কিছু নেই। তবে আপনারা যদি মাল পাচার—মানে সোনা-গহনা পাচার করেন, তাহলে বাধা দেবে বই কি। বুঝেছি। আপনি যা বলতে চান, তা বাঙলাদেশের স্বার্থবিরোধী। আমাদের এখানে হিন্দু-মুসলমান সবাই সমান। আমরা মরলে আপনিও মরবেন, আমরা বাঁচলে আপনিও বাঁচবেন। আপনি যদি নিজেকে বাঙলাদেশের লোক মনে করেন, তাহ'লে আমাদের সবার ভাগ্য এক। তা বটে। আমার কোন আত্মীয়স্বজন পশ্চিমবঙ্গে নেই, এমন কেন মনে করছেন। আমি তো আমার স্ত্রী-পুত্রকে পাঠাইনি। যদি সেরকম দরকার হয়, সবার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকেই পাঠাতে হবে। আমরা থাকব লড়াই করতে। যদি এখনই দলে দলে লোক সীমান্তের ওপারে যেতে থাকে তাহলে লোকের মনে হতাশা সৃষ্টি হবে। তা তো বুঝলাম। গরীব মানুষরা মনে করবে বড়লোকদের আশ্রয় আছে তাই পালাচ্ছে। আপনি পরিকল্পনাটা স্থগিত রাখুন। আচ্ছা পরে এম-এন-এ সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করে কাল সকালে সব ঠিক করব। আচ্ছা। আদাব।

মুখ গম্ভীর করে গোলাম সাহেব বললেন, শুনলেন তো। এরা না হয় হিন্দু, কিন্তু যাদের কিছু অর্থসংস্থান আছে এমন কতকগুলো মুসলমানও ওপারে যাবার চেষ্টায় আছে। সীমান্ত এখন খোলা,

সেজন্য কে যে কোন্ পথে পালাচ্ছে, তা বলা কঠিন। আমরা দেখছি, গরীব চাষী মেহনতী মানুষদের নৈতিক বল এদের চেয়ে অনেক বেশি। এরা মরতে ভয় পায় না, এরা দুশমন হানাদার 'খান'দের সামনে বন্দুক হাতে দাঁড়াতে পারে। আর এরা অতি স্বার্থপর। নিজের কথাই ভাবতে শিখেছে।

অমল কি যেন বলার চেষ্টা করছিল। অলক্ষ্যে তার হাত টিপে মানা করলাম।

আচ্ছা, আদাব। কাল আবার দেখা হবে।

রাতে কোথায় যাবেন ?

এখনও ঠিক নেই। হোটেল নিশ্চয়ই পাব।

রাতে থাকার মত হোটেল পাবেন কি! তার চেয়ে, ও ভাই ইব্রাহিম, আমাদের আশুবাবুর কাছে একটা খবর দাও তো। রাতের বেলায় তিনজন থাকবেন ওঁর বৈঠকখানায়। তার ব্যবস্থা যেন করে রাখেন। আপনারা ঘুরে-ফিরে দেখুন। আর রাতের বেলায় কি আর দেখবেন !

দেখলাম তো রাস্তাঘাট বেশ পাকা কংক্রিট করা। কিছু বাড়িঘর স্বাধীনতার পরেই তৈরী হয়েছে। বেশ মজবুত বাড়িগুলো।

রাস্তাঘাট প্রথম যখন নজর পড়েছে, তখন সেই কথাই বলতে হয়। রাস্তাঘাট খুব বেশি তৈরী হয়নি। মহকুমা শহরগুলোকে জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। আমাদের প্রয়োজন মেটাতে নয়। তাহলে গ্রামের রাস্তাগুলোরও সংস্কার করা হত। গ্রামের রাস্তাগুলো বর্ষাকালে চলাচলের অযোগ্য হয়ে যায়। এই যে কংক্রিটের রাস্তা, এগুলো তৈরী করেছে তাড়াতাড়ি সৈন্য চলাচল করাতে। যশোরে ওদের সৈন্যঘাঁটি। যশোর থেকে ঝিনাইদহ, খুলনা, মাগুড়া, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর—এই রাস্তার সঙ্গে যুক্ত। যে-কোন সময় হানাদার পাঠাতে পারবে বলেই এই রাস্তা।

দেশের মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য করবে, কৃষিপণ্য বিদেশে অথবা শহরে যাবে, এমন কোন ব্যবস্থাই করেনি। ওরা জানে শহর দখলে রাখতে পারলে দেশ দখল সহজ হবে। সেজন্য শহর দখলের রাস্তাগুলো খুলে রেখেছে। তবে এটা না করলে ওরা গ্রামের মধ্যে ঢুকবার সুযোগ পেত। আজ গ্রামে ওরা ঢুকতে পারছে না। পায়ে হেঁটে কোথাও তো যাবার সাহস নেই। যেখানে গাড়ি যাচ্ছে, সেখানেই ওরা যাচ্ছে। তাও আবার গাড়ি থেকে নামছে না। গোলাগুলী মেরে ধ্বংস করে আবার ঘাঁটিতে ফিরে যাচ্ছে। সেইজন্যই রাস্তা। সমগ্র দেশ যে ওদের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামবে, তা কখনও ভাবতেও পারে নি।

ডাক্তারসাহেব বললেন, পাকা মজবুত বাড়ি দেখে দেশের লোকের আর্থিক অবস্থা বিচার করবেন না। সীমান্তের ছোট ছোট শহরগুলো হল স্মাগলিং-সেণ্টার। কিছু চোরাকারবারী ভারতে মাল পাচার করে টু-পাইস করেছিল, তারাই পাকা মজবুত বাড়ি করেছে। আর শহরে কিছু টাকা তো চলাচল করে, কিছু উপার্জনও গ্রামের তুলনায় বেশি। সেজন্য কিছু পাকা বাড়ি আছে।

এই কালোবাজারী স্মাগলাররা তো এখনও আছে ?

বোধহয় নেই। ওরা যে কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছে, তা বলতে পারি না। দু একজন লুকিয়ে আছে। ওরা হল জামেতি ইসলামীর লোক, না হয় লীগের। ওদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। ওরা যে-কোন সময় আমাদের সবাইকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে। ‘খান’দের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে পারা খুবই কঠিন। আমাদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তো নেই, কিন্তু অন্যভাবে যুদ্ধ করতে গেলে এইসব মীরজাফররা পেছন থেকে আমাদের কোতল করতেও তো পারে।

নিশাত চৌধুরী চুপ করে বসেছিলেন। আমাদের কথার মাঝেই বললেন, চলুন, খেয়ে-দেয়ে আসুন। আমার গরীবখানায় রাতেও

শুতে পারেন। কোন অসুবিধা হবে না। আশুবাবুকে অনর্থক কষ্ট দিয়ে লাভ কি ?

আপনাদের কাছে এসেছি। আপনাদের ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা। গোলাম সাহেব কি বলেন ?

গোলাম সাহেব বললেন, ওখানে থাকতে পারেন, কোন অসুবিধা হবে না বলেই মনে হয়।

নিশাত চৌধুরীর সঙ্গেই তাঁর বাড়িতে এলাম।

ঘড়িতে দেখলাম রাত সাড়ে আটটা।

মিসেস চৌধুরী খাবার নিয়ে বসে আছেন। আমাদের আওয়াজ পেয়েই দরজা খুলে দিলেন।

খেতে বসে নিশাত চৌধুরী গল্প শুরু করলেন

দেশ স্বাধীন হল।

ভারতবর্ষের সঙ্গে তখন প্রতিযোগিতা চলছে। পাকিস্থানের উন্নতি ঘটাতেই হবে। এখানেও গণপরিষদের অধিবেশন হবার কথা, ভারতেও গণপরিষদের অধিবেশন বসছে। পঞ্চাশ সালেই ভারতের সংবিধান তৈরী হল। বাহান্ন সালে নির্বাচন হল। কিন্তু আমাদের কোন পরিবর্তন হল না।

নাজিমুদ্দিন পূর্ববাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ছিল। জিন্নাহ্ সাহেবের মৃত্যুর পর তাকে প্রেসিডেণ্ট করা হল, কিছুকালের মধ্যেই নাজিমুদ্দিন হল প্রধানমন্ত্রী। আর আমাদের ঘাড়ে বসল নুরুল আমিন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে।

কেন নির্বাচন হল না ?

মুসলীম লীগ হল আজাদী আনার বড় শরিক। অর্থাৎ মুসলীম লীগ বলল, হিন্দুর হাত থেকে পবিত্র ইসলামকে তারাই রক্ষা করেছে। অতএব সব কিছু তার প্রাপ্য। প্রাপ্য বুঝতে গিয়ে টাঙ্গাইলে হল উপ-নির্বাচন, তাতে মুসলীম লীগ ভয়ঙ্কর অমর্যাদাকর ভাবে হেরে গেল। তাই আরও যে-সব উপনির্বাচন প্রয়োজন ছিল তা বন্ধ রইল।

একুশে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা তো জানেন।

বাঙলাভাষার জন্য কিভাবে জান দিয়েছিল বাঙলার তরুণরা। তাই দেখেই মুসলীম লীগের জ্ঞান ফিরল। তারা বুঝল, তাদের দিন শেষ হয়েছে ; তাই নির্বাচনে তারা এগোল না।

বাঙলাদেশ তো পাঞ্জাব অথবা সিন্ধুদেশ নয়। ওরা গোলামী করেছে সাম্রাজবাদের, পেটের রুটি পেলে ওরা মানবতার গণ্ডী ছেড়ে পশুত্বের সর্বনিম্নস্তরেও নামতে কখনও দ্বিধা করে না। ওই সব মাথামোটারা তো জানে না স্বায়ত্তশাসন কাকে বলে। কতকগুলো খেতে পেলেই খুশী। আর প্রয়োজন ওদের মেয়েমানুষ। সেই মেয়েমানুষ ওদের সন্তান পেটে ধরলেই যথেষ্ট। ওরা নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামায় না। কে রাজত্ব করল আর কে না করল, তা দিয়ে কোনদিনই ওদের ব্যক্তিগত জীবনে কিছু আসে যায় না। কুলি আর চাষা তাও ক্রীতদাসের সামিল।

কিন্তু বাঙলাদেশের মানুষ খুবই সজাগ।

পঁচিশ তিরিশ বছর ধরে সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে ওরা বাঙ্গালীদের বোকা করে রেখেছিল।

যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন দেখল, ইসলাম ওইসব পশ্চিম-পাকিস্থানীদের এক চেটিয়া সম্পদ, ধর্ম বড় কথা নয়, ওদের বড় কথা হল বাঙলাদেশ শোষণ। সে কাজে ওরা খুবই তৎপর। বাঙলার সম্পদ দুহাতে লুটে নিয়ে চলেছে। এই লুণ্ঠন বন্ধ করতে হলে প্রয়োজন বাঙ্গালীর হাতে ক্ষমতা নেওয়া।

বাঙ্গালীকে ঠকাতে নাজিমুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী করেছিল। তারপর যেদিন নাজিমুদ্দিনকে গলাধাক্কা দিয়ে গদি থেকে নামিয়ে দিল চৌধুরী মহম্মদ আলি, তখন বাঙালীরা তাদের মর্যাদা কতটা তাও বুঝল। উপরন্তু নাজিমুদ্দিন নবাবজাদা, বাঙলা ভাষায় কথা বলে না, বাঙলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই, তাকে প্রধানমন্ত্রী করে বাঙ্গালীকে ঠকাতে ওরা পারল না।

বাহান্ন সালে ফেটে পড়ল বাঙলার ছেলেরা।

আটচল্লিশ সালে জিন্নাহ্ সাহেবকে ভাল করে ওয়ারনিং দেওয়া হয়েছিল, বাঙলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে। অগ্রাহ্য করেছিল জিন্নাহ্। তার ফল দেখা দিল বাহান্ন সালে।

বাঙলাভাষাকে আর ধামাচাপা দিতে পারল না মুসলীম লীগ আর পশ্চিম পাকিস্থানী সামরিক জোট। প্রাদেশিক ভাষার মর্যাদা তাকে দিতে বাধ্য হল। বাঙলা অক্ষরের বদলে আরবী আর রোমান অক্ষর ব্যবহার, বাঙলাভাষায় আরবী আর ফারসী শব্দ আমদানি —এসব বন্ধ হল। মায়ের ভাষা নিজের মর্যাদালাভ করল। এটাই আমাদের প্রথম জয়।

মুসলীম লীগকে আমরা চাই না। তাকে বিদায় করতে হবে ক্ষমতা থেকে। সেজন্য চাই নির্বাচন। হাঁ, নির্বাচন। গণতান্ত্রিক অধিকার চাই আমরা। আমাদের দেশ শাসন করবে আমাদের দেশের মানুষ। আমরা যতটা পারি নিজেদের অবস্থাকে নিজেরা পরিচালনা করব।

আওয়ামী মুসলীম লীগ আন্দোলনে নামল। আন্দোলনে নামল কৃষক-শ্রমিক পার্টি। আন্দোলনে নামল পাকিস্থা-- কংগ্রেস, আন্দোলনে নামল ডেমোক্রাটিক পার্টি।

অবশেষে সামরিক প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা বলল, বেশ, নির্বাচন হবে। স্বাধীনতালাভের সাত বছর পর এই নির্বাচন। চারিদিকে আলোড়ন উত্তেজনা সৃষ্টি হল।

কিন্তু এককভাবে লড়লে মুসলীম লীগকে হটানো সম্ভব নয় বুঝে আওয়ামী মুসলীম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ইত্যাদি মুসলমানদের পার্টিসমূহ একজোট হল।

স্বাধীন দেশে তখনও সংবিধান রচিত হয় নি, তখনও Communal Electorate অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতিনিধিকে মুসলমানরা নির্বাচিত করবে, হিন্দুর প্রতিনিধিরা হিন্দু দ্বারা নির্বাচিত হবে।

প্রতিবাদ জানাল হিন্দুরা।

হিন্দুরা লঘিষ্ঠ, তবুও তারা সাধারণ নির্বাচন চায়।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিবাদ জানাল। কামিনীকুমার দত্ত প্রতিবাদ জানাল। প্রতিবাদ জানাল শ্রীশ চ্যাটার্জি। এতসব নেতাদের কণ্ঠরুদ্ধ করার অমোঘ ঔষধ হল ওদের ভারতের গুপ্তচর ও দেশদ্রোহী বলা। তাতেও যখন ক্ষান্ত হল না, তখন শাসকগোষ্ঠী বলল, খবরদার, হিন্দু-মুসলমানের যুক্তভাবে সাধারণ নির্বাচনের কথা বললে ভাল হবে না।

আওয়ামী মুসলীম লীগ থেকে 'মুসলীম' শব্দটা উঠে গেছে। তারাও দাবি জানাল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধারণ নির্বাচন চাই।

সমর্থন জানাল না সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানরা, কিন্তু ধীরেনবাবু আর কামিনীবাবু তৎসহ শ্রীশবাবু সমর্থন জানিয়েছিল, কিন্তু মুসলীম লীগের হুমকিতে ধীরেনবাবু ও কামিনীবাবু আর বেশি অগ্রসর হল না, কিন্তু শ্রীশবাবু কোনক্রমেই তার দাবি পরিত্যাগ করল না।

Communal Electorate মেনেই নির্বাচন হল।

বাইরে একটা শব্দ হতেই নিশাত চৌধুরী কান পেতে রইল। কারা যেন ফিসফিস করে রাস্তায় কথা বলছিল। নিশাত চৌধুরী বাইরে গেল। কিছুক্ষণ বাদেই এসে বলল, আর আলো জ্বেলে রাখা হবে না। শত্রু এগিয়ে আসছে। অবশ্য এখনও শতাধিক মাইল দূরে আছে, কিন্তু শত্রুর বোমারু বিমান যে-কোন সময় আলো লক্ষ্য করে বোমা ফেলতে পারে। আমরা আলো নিভিয়ে গল্প করব।

আমি বললাম, পাকিস্থানীরা এখান থেকে একশত মাইল দূরে। তাহ'লে কয়েক ঘণ্টার পথ মাত্র। কিন্তু ওরা কি বিনা বাধায় এগিয়ে আসতে পারবে?

বাধা তো সর্বত্র। এত বাধা ভেঙ্গে এ পর্যন্ত পৌঁছাতে কয়েক

দিনের দরকার। আচড়া ঘাট আর নগরবাড়ি দিয়ে নদী পার হতে চেষ্টা করছে। মুক্তিবাহিনীও বাধা দিচ্ছে। চলুন এবার শুয়ে পড়ুন।

মশারী টাঙ্গিয়ে বিছানা পেতে রেখেছিল মিসেস চৌধুরী। তাতে গা এলিয়ে দিয়ে ভাবছিলাম, বাঙলাদেশে এত সুখে ও শান্তিতে রাত কাটাবার এটাই বোধ হয় আমাদের শেষ রাত। এরপর এভাবে অভ্যর্থনা পাব কিনা সন্দেহ। অমূলক নয় আমার আশঙ্কা। পরদিন থেকে কঠিন জীবনের সঙ্গে পরিচয় হতে থাকে। সেইটেই হল বাঙলার রণাঙ্গনের সবচেয়ে মূল্যবান অভিজ্ঞতা।

পাঁচটা না বাজতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল।

সবাইকে ডেকে তুললাম। মুখ ধুয়ে রাস্তার ধারে গিয়ে বসলাম। তখনও শহরের মানুষ জেগে ওঠেনি, কিন্তু শহরের প্রহরীরা জেগে উঠেছে, জেগেছে দেশরক্ষার বাহিনী।

তারা তখন সারিবদ্ধ হয়ে রাস্তায় double march করছে।

চেহারা দেখে মনে হল সবাই গ্রামের মানুষ। কালো উর্দী-পরা কয়েকজন তাদের শিক্ষা দিচ্ছে। শুনলাম ওরা মুজাহিদ। খাকি পোশাক যাদের তারা আনসার। পুলিশ আর আনসারের পোশাকের তারতম্য বিশেষ নেই। এরা এদের শিক্ষক। বাকী সবাই প্রায় লুঙ্গি প'রে, গেঞ্জি গায়ে, দুচারজনের পায়ে রবারের জুতো।

একদল ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেল।

চুপ করে একটা ক্যালভার্টে বসে ওদের কথাই ভাবছিলাম।

পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই আরেক দল মার্চ করতে করতে এল। তারাও আমাকে পাশ কাটিয়ে গেল। এইভাবে দু পাঁচ মিনিট পর পর প্রায় আঠারটা দল মার্চ করতে করতে এগিয়ে গেল। প্রত্যেক দলে তিরিশ থেকে চল্লিশ জন। সবাই তরুণ, বয়স

আঠার থেকে তিরিশের মধ্যে। নওজওয়ানরা সামরিক শিক্ষা নিচ্ছে। আজ দেশের প্রয়োজনে ওরা এগিয়ে এসেছে।

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, এই লোকগুলো এত উৎসাহ-উদ্দীপনা কি করে লাভ করল! নিজের জন্মভূমিতে বাঙলার মানুষ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে বাস করতে যে চায় না, ন্যায্য অধিকারলাভের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তা স্পষ্ট হল আমার কাছে।

সবাই প্রস্তুত হয়ে বের হবার আগে নিশাত চৌধুরী বলল, আপনাদের সঙ্গে লুঙ্গি আছে তো?

বললাম, সবার নেই।

তা হলে প্রত্যেকে নিজের নিজের পোশাক বদল করে লুঙ্গি পরে নিন। লুঙ্গি পরলে আপনারা মোটামুটি নিরাপদেই পথ চলতে পারবেন। আশা করি আমার সাজেসানটা আপনারা বিরূপ মনে করবেন না। এখনও শত্রু প্রবল, তারা বারবার আঘাত করবে। আমাদের স্থান বদল করতে হবে। স্ট্র্যাটেজি বদল করতে হবে। এখনই করাচী থেকে প্রচার করা হচ্ছে হিন্দুস্থান থেকে দুষ্কৃতকারী অনুপ্রবেশ করেছে, তারা কোথাও কোথাও অশান্তি সৃষ্টি করছে, তাদের নির্মূল করা হচ্ছে। যদি সত্যিই আপনাদের ভারতীয় রূপে গ্রেপ্তার করতে অথবা হত্যা করতে পারে, তাহলে ওদের পোয়াবারো। জোর গলায় ওরা প্রচার করতে পারবে। সেজন্য আপনাদের অনুরোধ করছি।

আমরা আপনার এই উপদেশের জন্য কৃতজ্ঞ। আমরা যে সহজে ফিরে যাব না তা তো বুঝতে পারছেন। সেজন্য সতর্ক হওয়া উচিত।

মিসেস চৌধুরী বলল, কিছু খেয়ে নিন। এরপর খাবার কোথাও জুটবে কিনা সন্দেহ।

আমাদের সকালের খাবার ব্যবস্থা করার অবসরে আমরা গিয়ে

বসলাম সামনের মুদিখানায়। মুদি আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বললাম, কি মনে করছেন মিঞাসাব ?

কিসের ?

এই যে লড়াই চলছে তারই কথা জানতে চাই।

লড়াই তো দেখছি না বাপু। দেখছি কেবল ছুটোছুটি। অশান্তি বিনা আর কিছুই তো দেখছি না।

অবাক হয়ে গেলাম তার কথা শুনে। এই লোকটি নিশ্চয়ই বর্তমান অবস্থার সঙ্গে পরিচিত। এই লড়াইয়ের মূল কারণও জানে, অথচ সে উপেক্ষা করতে চাইছে। আমাদের বোধহয় লোকটি বিশ্বাস করতে পারেনি।

আবার বললাম, অশান্তি বিনা তো শান্তি আসতে পারে না, মিঞাভাই। ত্যাগ স্বীকার না করলে কি ভোগের পথ খোলে ? সেজন্য অশান্তি মনে করছেন কেন ?

মুদি আর কথা বলতে চায় না। খদ্দের আসতেই সে খদ্দের বিদায় করতে ব্যস্ত হল।

আমরা এক প্যাকেট বিস্কুট কিনে ফিরে এলা্ম নিশাত চৌধুরীর বাড়িতে।

আমাদের জলখাবারের ব্যবস্থাই শুধু করেনি মিসেস চৌধুরী। পনর ষোল বছরের ছেলে আহসানকে ডেকে এনেছে আমাদের শহর ঘুরিয়ে দেখাতে।

বললাম, গাইডের দরকার হবে কি ?

দরকার হবে। আপনারা অপরিচিত লোক। নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু আহসান আওয়ামী লীগের কর্মী। প্রশ্নের উত্তর যা দেবার তা আহসানই দিতে পারবে। আপনারা কোনরকম অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হবেন না।

আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাব।

ধন্যবাদ জানাতে হবে না, আপনার এই মেয়েটিকে ভবিষ্যতে স্মরণ করলেই খুশী হব। আমরা আশা করব, যেদিন আমাদের এই বাঙলাদেশ হানাদারমুক্ত হবে, সেদিন আপনি আবার সদলে এসে এখানে আমার কাছে আতিথ্যগ্রহণ করবেন। ইনশাল্লা, আমি যদি বেঁচে থাকি।

আপনাদের সাফল্য কামনা করি। জয় বাঙলা।

বিদায় নিয়ে রাস্তায় এলাম। আহসান আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছিল।

রাস্তায় বাধা দিল জামাল মিঞা।

বন্দুক-বাহিনীর নেতা।

আহসানই পরিচয় করে দিয়েছিল। আমাদের পরিচয় পেয়ে ডেকে নিয়ে গেল তাদের অফিস-ঘরে। বসতে দিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করল।

বন্দুক-বাহিনীটা কি ?

আমাদের প্রথম নম্বর ফৌজ লড়াই করছে। দ্বিতীয় নম্বর ফৌজ নতুন সামরিক শিক্ষা দিয়ে নওজোয়ানদের তৈরী করছে। তাদের কাজ হল ডিফেন্সিভ লড়াই। এরপর রয়েছে গোটা এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পুলিশ বাহিনীর। তাদের পক্ষে সামলানো কঠিন। আমরা হলাম ফোর্থ লাইন অব ডিফেন্স। আমাদের অনেক কাজ। গ্রামে শহরে যত বন্দুক পেয়েছি, তাই আমরা সংগ্রহ করেছি। আমরা গ্রামের সংগঠন গড়ছি। নিত্যপ্রয়োজনীয় মালের সরবরাহ ঠিক রাখছি। কালো-বাজারী চোরাবাজারীদের শায়েস্তা করছি, আর যে-সব খান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, তাদের খুঁজে বের করে আল্লার নামে কোরবানি করছি।

একজনের হাত থেকে একটা বন্দুক তুলে নিয়ে পরীক্ষা করলাম।

একনলা বন্দুক। Made in Pakistan লেখা তার গায়ে। অপর দিকে লেখা আছে Sialkot.

বাঙলা দেশে বন্দুক তৈরী হয় না ?

কি যে বলেন! বাঙলা দেশে বন্দুক তৈরী! এই বন্দুক সংগ্রহ করতে কত হয়রানি হতে হয়েছে বন্দুকের মালিককে, তা শুনলে অবাক হবেন। বন্দুকের দাম বোধহয় আড়াইশত তিনশত টাকা। দরখাস্ত করার পর অন্ততঃ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে ঘুষ দিতে। তারপর কার্টিজ সারা বছরে পঞ্চাশটার বেশি কাউকে দেওয়া হয় না। পাঁচটা গ্রাম খুঁজলে একটা বন্দুক হয়ত পাওয়া যায়। এই বন্দুক দিয়েই আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে।

আরেকজনের হাতে একটা পাঁচ চেম্বারের রাইফেল ছিল। দেখতে অনেকটা থ্রি নট্ থ্রি রাইফেলের মত। জনসাধারণের কাউকে কাউকে এই রাইফেল দেওয়া হয়েছে। সংখ্যা হয়ত তিন অথবা চার। চেম্বার খুলে দেখলাম। রিভলবারের বুলেটের মত বুলেটভর্তি চেম্বার।

সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল, এখানে সিগারেট তো পাওয়া যায় না এখন। মাল আসছে না। আপনাদের Number 10, খেয়ে দেখুন।

হাত-জোড় করে বললাম, ওটাতে অভ্যস্ত নই। আপনাদের আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ।

জামাল মিঞা আহসানকে বলল, সব ভাল করে দেখাস, বুঝলি।

আশে-পাশের গলিতে দেখলাম আঁকাবাঁকা ট্রেনচ্ কাটা। এগিয়ে চলছি। চলতে চলতে শহর শেষ হয়ে এল।

আহসানকে বললাম, এবার তুমি ফিরে যাও। আমরা পাকা সড়ক দিয়েই এগিয়ে যাব।

এতক্ষণ আহসান আমাদের উৎসাহ সহকারে শহর রক্ষার

ব্যবস্থা দেখিয়ে চলছিল। আমরাও দেখছিলাম, কিন্তু খুবই অকিঞ্চিৎকর মনে হল এই রক্ষাব্যবস্থা। ভারত-পাক লড়াইয়ের সময় পাকিস্থানের পরাজয়ের কারণ তাদের আধুনিক অস্ত্র নয়, তাদের দুর্বল মনোবল। আঘাতের পর আঘাত তাদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। পাকিস্থানের সৈন্যদের জঙ্গীবাদীরা বুঝিয়েছিল যে হিন্দুরা ভীরু জাত। ওদের হটিয়ে দিয়ে ভারত দখল করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। সাতশত বৎসর মুসলমানরা ভারত শাসন করেছে তাদের শৌর্যবীর্য দিয়ে। সেজন্য জোর আঘাত করতে পারলেই হিন্দুরা পালাবে।

ভারতীয় বাহিনী লাহোর উপকণ্ঠে পৌঁছামাত্র পাকিস্থানী ফৌজ বুঝতে পারল, যতটা সহজ বলা হয়েছিল তার একশত গুণ কঠিন হল ভারতের ফৌজ। যেদিন মুসলমানরা ভারত জয় করেছিল সেদিন ভারতে কোন ঐক্য অথবা সংহতি ছিল না, ছিল না জাতীয়তাবোধ। সেদিন পাণিপথের যুদ্ধে অথবা খানুয়ার যুদ্ধে ভাগ্য নির্ধারণ হতে পারত; কিন্তু বর্তমানে শত শত খানুয়া ও পাণিপথের যুদ্ধেও কোন দেশকে পদানত করা যায় না। সেজন্য অস্ত্রের দিক থেকে বলবান পাকিস্থানীদের রুখতে হলে তাদের মনোবলের ওপর আঘাত হানতেই হবে, সেদিকে বেশি নজর দেবার প্রয়োজনীয়তা নেতাদের রয়েছে। সামান্য বিবর-ঘাঁটি অথবা আত্মরক্ষার ট্রেন্চ দিয়ে তাদের দানবীয় শক্তি রোধ খুবই কঠিন কাজ।

আহসান আমাদের কাছ থেকে যখন বিদায় নিল, তখন আমাদের ভারতীয় বলে সনাক্ত করার মত ক্ষমতা কারও ছিল না। যাবার সময় আহসান বলল, পাকা সড়ক ছেড়ে আমরা যেন গ্রাম দিয়েই চলাচল করি। সড়ক নিরাপদ নয়।

আমরা শহর পেরিয়েই পাকা সড়ক ছেড়ে গ্রামের পথ ধরলাম। পাকা সড়ক ডান-পাশে রেখে প্রায় দু'মাইল ভেতরে প্রবেশ করে সড়ককে লক্ষ্য বস্তু করে দু'মাইল তফাত দিয়েই চলছিলাম।

অমল বলল, ঠিক বুঝতে পারছি না কালাচাঁদ-দাদা।

আর বুঝে কাজ নেই। দেখ।

অবিনাশ বলল, মুদিকে তো দেখলাম। আমার মনে হয় লোকটা আওয়ামী লীগ বিরোধী। সে স্বাধীন বাঙলার কথা শুনতে রাজি নয়।

সবাই আওয়ামী লীগ সমর্থক হবে এটা কি করে ভাবতে পারলে? বিরোধী পক্ষ নিশ্চয়ই আছে। শহরে শুধু নয়, গ্রামেও আছে। হয়ত এখন মুখ খুলে বলতে পারছে না, তবে সুযোগ পেলেই নিজের মীরজাফরী চেহারা দেখাতে মোটেই ত্রুটি করবে না।

আমার কথা শেষ হতেই অমল বলল, কাল-পরশু ছুটো দিন বৃষ্টি হয়েছিল বলেই রক্ষা। নইলে রোদে চলতে পারতাম না। এই দেখুন দাদা, চাষীরা মাঠে নেমেছে।

বললাম, এখানে তো নরম্যাল লাইফ। অভ্যন্তরে গেলে বুঝতে পারব কতটা নরম্যাল। বোতলে জল আছে তো?

আছে। খাবেন?

দাও। পিপাসা অনুভব করছি। সামনের গ্রামে নিশ্চয়ই টিউবওয়েল পাব। আবার বোতল ভর্তি করে নিতে হবে। কোথায় যে কি পাব তার ঠিক নেই। পশ্চিমবঙ্গের ছোট ছোট গ্রামেও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ছোটখাট দোকান দেখা যায়। এখানে তা পাওয়া যায় না, তা লক্ষ্য করেছ! ছু'তিনটে গ্রাম পেরিয়ে তবে হয়ত এরকম দোকান দেখতে পাবে। কারণ, লোকের আর্থিক অবস্থা। ক্রয়ক্ষমতা খুবই কম। প্রয়োজনও কম। আজ-কাল পশ্চিমবঙ্গের সব গ্রামেই কিছু না-থাকলেও একটা চায়ের দোকান থাকে। চা-পান বিলাসিতা নয়, আজকাল সেটাও একটা প্রয়োজন। বাঙলা দেশে তা নেই। না থাকার কারণ আর্থিক সঙ্গতি নেই লোকের, তাই কতকগুলো লোক কোন ক্রমেই

জীবিকার ছোট পথও পায় না। এদের মেনে নিতে হয় শোষণ, আর দমন করতে হয় জীবনের সবকিছু প্রয়োজনকে, সেই প্রয়োজন যত সামান্যই হোক।

অবিনাশ বলল, বিলম্বে হলেও বাঙলার মানুষ বুঝেছে পাকিস্থান বেহেস্ত নয়, গরীব মানুষদের গোরস্থান। এটাই ওদের মনে এত শক্তি জুটিয়েছে। তবে প্রতিক্রিয়াশীলদের খুব অভাব হবে না, তারা যে-কোন উপায়ে 'খান'দের সাহায্য করবে এই মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করতে।

অমল বলল, পৃথিবীর সর্বদেশেই এটা হয়েছে, পাকিস্থানও বাঙলাদেশে বিশ্বাসঘাতকের দল সৃষ্টি করবে।

কিন্তু কেন এই অবস্থা? উৎপত্তির কারণ কি? সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে জাতীয়তা গঠন সম্ভব হয় নি বলেই তো এই অবস্থা। অশান্তির স্রষ্টা হল অবাঙ্গালী মুসলমান আর অবাঙ্গালী হিন্দু কায়েমী স্বার্থের মানুষ ও তাদের দালালরা।

বহু শতাব্দী থেকে হিন্দু-মুসলমান বাস করছে বাঙলাদেশে। তারা শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই বাস করেছে। শোষকের বিরুদ্ধে সমবেত ভাবেই প্রতিবাদ জানিয়েছে। বাঙলার মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে, ধর্মীয় জীবনে পরস্পরের সমন্বয় ঘটিয়েছে। তার ঐতিহ্য রয়েছে বাঙলার জীবনে। কিন্তু পাকিস্থান নামক অপূর্ব পদার্থের স্বাদ গ্রহণ করতে হঠাৎ একদিন বাঙলার মুসলমানরা বাঙলার হিন্দুদের শত্রু হয়ে দাঁড়াল।

অবিনাশ বলল, সবার আগে সোচ্চার হল আক্রাম খান। একত্রিশ সালে আক্রাম খান আবিষ্কার করল রবীন্দ্রনাথ হিন্দু এবং তাঁর রচনাবলী মুসলীম বিরোধী। তখনকার দিনেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই অমূল্য আবিষ্কারের জন্য আক্রাম খানকে কেন যে ডক্টরেট ডিগ্রি দিল না, সেইটেই আশ্চর্য; কিন্তু তার আবিষ্কারের বিষফল খেতে বাধ্য হল বাঙলার মানুষ। ধর্মের গোঁড়ামি এমন

ভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যার জন্য সত্যকে স্বীকার করার মত সৎসাহসও ওদের ছিল না।

আমি বললাম, আরও মজার ঘটনা ঘটেছে পাকিস্থান কায়েম হবার পর। দেশের মানুষ যাতে তাদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে কোন-প্রকার ক্ষোভ প্রকাশ না করে, অথবা আন্দোলনের সুযোগ না পায়, সেজন্য প্রথম থেকেই শিশুদের মনে সাম্প্রদায়িকতার বিষ প্রবেশ করানোর অপচেষ্টা করছিল পাকিস্থানের শিক্ষাবিভাগ। নতুন নতুন বই লেখা হয়। প্রত্যেক বইয়ে প্রথমপাঠ্য হল ইসলাম ও রসুল সম্বন্ধীয়। পাকিস্থানের শিশুদের শেখানো হল, পাকিস্থান মুসলমাদের পবিত্র 'ওয়াতন'। স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে ইতিহাস শেখানো হল, তা নিতান্ত বিকৃত। শিশুদের শেখানো হল, স্বাধীনতা মুসলীম লীগ ছিনিয়ে এনেছে মুসলমানদের জন্মশত্রু হিন্দুদের কাছ থেকে। হিন্দুরা বাস করে হিন্দুস্থানে। 'ভারত' নামে কোন দেশ যে আছে তা তাদের জানতে দেওয়া হয় না। এইভাবে শৈশব থেকে হিন্দুবিরোধী করে তোলার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো।

পাকিস্থানের জঙ্গীশাসকরা এটা তো করেনি, করেছে তাদের দালালরা। এই দালালদের দলে ছিল বুদ্ধিজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, খ্যাতনামা কবি তালিম হোসেন, প্রসিদ্ধ গায়িকা লায়লা অর্জুমন্দে। দালালের অভাব ছিল না বলেই এই অপপ্রচার চালু রাখা সম্ভব হয়েছিল স্বৈরাচারীদের। অবশেষে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষেধ করা হল পাকিস্থানে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে এইসব দালালরা নিজের স্বার্থ বজায় রেখেছিল।

অমল বলল, তবুও জনমনে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, তার প্রমাণ হল এই ব্যাপক বিদ্রোহ আর স্বাধীনতা ঘোষণা।

ঘটনাটা অত সহজে হয় নি। বুদ্ধিজীবীরা ভীতসন্ত্রস্ত ছিল

জঙ্গীশাসকদের দাপটে। হঠাৎ তারা একদিন গা-ঝাড়া দিয়ে, ভয় ও সন্ত্রাস জয় করে, খোলাখুলি প্রতিবাদ জানাল শাসকদের অন্যায় জুলুমের। এই সংগ্রামের সম্মুখ সারিতে এসে দাঁড়ালেন বিশ্ব-বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ। আবদুল হাই, হবিবুল্লা, সারওয়ার মুরশেদ, আহম্মদ শরীফ, আনিসুজ্জমান প্রমুখ শিক্ষকগণ। তার মূল্য তাঁদের দিতে হল বুকের রক্ত দিয়ে। হানাদাররা সবার আগে এইসব বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে বাঙলার মানুষের প্রতিবাদের মুখ বন্ধ করতে। কিন্তু সেদিন তাদের সংগ্রামের সঙ্গীও ছিল। 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন ততই টুটবে।' আজ বাঁধন ছিঁড়তে সমবেতভাবে হাতিয়ার-হাতে নেমেছে দেশের আপামর জনসাধারণ।

মাঠ পেরিয়ে গ্রাম। গ্রামের বাইরে আমবাগান। আম-বাগানে বসলাম। বেলা বারটা বাজতে বেশি বিলম্ব নেই। অমল তার সাইড-ব্যাগ থেকে বিস্কুটের প্যাকেট বের করে বলল, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। জলও পাওয়া যাবে।

হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে বিস্কুট খেতে থাকি।

আকাশে বিমানের শব্দ।

বিমানের শব্দ শুনেই সতর্ক হতে হল। আমরা গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে হাত-পা ছড়িয়ে মাথা নীচু করে বসে পড়লাম। চোখ ছিল ওপরের দিকে। সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনটি বিমানকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে দেখা গেল। বিমান-গুলো বেশ নীচু দিয়েই যাচ্ছিল। স্পষ্টই দেখতে পেলাম। বিমানগুলো পেরিয়ে যেতেই আমরা উঠে বসলাম। জলের প্রয়োজন। এগিয়ে গেলাম গ্রামের দিকে।

এটা মনে হচ্ছে প্রাইমারী স্কুল, একটা ঘরের দিকে আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করে অবিনাশ মন্তব্য করল।

অমল হাসতে হাসতে বলল, সর্বত্রই সমান। দেখুন কালাচাঁদ-

দাদা, পশ্চিমবঙ্গে আমরা গ্রামে ঢুকে যখনই দেখতে পাই এমন একটি ঘর যার কোন দরজা-জানালা নেই, দেওয়ালের অবস্থা ভগ্নপ্রায়, চালে খড় নেই, তাকেই আমরা যেমন মনে করি ঐটি বোর্ডের স্কুল, ঠিক তেমনি অবস্থা এখানেও। অর্থাৎ বিদ্যাস্থানের এই রকমই দুরবস্থা হয় আমাদের উভয় দেশে। অবিনাশ ঠিকই বলেছে।

সামনেই টিউবওয়েল।

অমল বোতল নিয়ে এগিয়ে গেল। গ্রামের মেয়েরা মাটির কলসী ভর্তি করছিল। আমাদের অপেক্ষা করতে হল জল নেবার জন্য।

কতকগুলো কিশোর ছিল দাঁড়িয়ে। তাদের জিজ্ঞেস করলাম গ্রামের নাম। তারা পাল্টা জিজ্ঞেস করল, আমরা কোথায় যাব।

বললাম, কুষ্টিয়ার দিকেই যাব ঠিক করেছি।

ছেলেরা বলল, ওদিকে খুবই গোলমাল।

তোমরা প্লেন দেখতে পেয়েছ ?

এই তো তিনটে হাওয়াই জাহাজ গেল।

তোমরা তখন কি করছিলে ?

আমরা দেখলাম, গাঁয়ের সব লোকই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখল।

মনে মনে ভাবলাম, সর্বনাশ। ওরা জানে না ওগুলো মৃত্যু-দূত। হুজুক করে মজা দেখা যে কি বিপজ্জনক, তা ওরা জানে না।

তোমাদের ইস্কুলের মাস্টার সাহেব কোথায় থাকে ?

উই হোথায়, সোজা যান। বাঁ-দিকে আতা গাছের তলায় টিনের বাড়ি। তসলিম মাস্টার।

অমল জল ভর্তি করে বোতল নিয়ে আসতেই আমরা জল খেয়ে তসলিম মাস্টারের বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

কিশোরদের মধ্যে একজন বলল, তসলিম মাস্টার ঘরে বোধহয় নেই, ইস্কুল এখন ছুটি। শহরে গেছে বোধ হয়। মাস্টার আবার পোস্টমাস্টার। ডাক আনতে সাইকেলে গেছে বোঁধ হয়।

তাদের কথা শুনেও নিরুৎসাহ না হয়ে এগিয়ে গেলাম গ্রামের ভেতর।

খুঁজে পেলাম তসলিম মাস্টারকে। শহরে যুদ্ধের আগে সে রোজই যেত। এখন আর যায় না। এখন গ্রামেই অনেক কাজ, তাই গ্রাম ছেড়ে বাইরে যেতে পারে না।

তসলিম মাস্টার ঘরেই বসে ছিল। তার খোঁজ করছি জেনে বাইরে এসে বলল, আমি তসলিমউদ্দিন। কি দরকার?

সালাম আলেকুম, বলে আমি এগিয়ে গেলাম।

ওয়ালেকুম সালাম বলেই তসলিম মাস্টার আমাদের সাদরে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসাল।

কোথা থেকে আসছেন?

ভারত থেকে।

রিপোর্টার?

তা মনে করতে পারেন।

তসলিম মাস্টার বলল, দেখেশুনে কি মনে হচ্ছে?

বললাম, কিছুই মনে করার মত অবস্থা হয়নি এখনও। It is only beginning of the start. ঘটনার গতিপ্রকৃতির ওপর ফলাফল নির্ভর করছে।

ঘটনার শেষ হবে শীঘ্রই। আমরা মনে করছি আগামী এক মাসের মধ্যেই ফয়সালা হবে। 'খান'দের আর বিষদাঁত ফুটাতে হবে না। কুষ্টিয়া আমরা দখল করেছি তা তো জানেন। এবার আমরা অগ্রসর হব যশোরকে খালাস করতে।

বললাম, যতটা সহজ মনে করছেন, ততটা সহজ হবে বলে আমাদের মনে হচ্ছে না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চেহারা আমরা

ভাল করে জানি না, জানে কোরিয়ার লোক, ভিয়েতনামের লোক, কাম্বোডিয়ার লোক, আফ্রিকার মোজাম্বিকের ও এঙ্গোলার কালো মানুষরা। সেজন্য হঠাৎ কোন স্থিরসিদ্ধান্তে আসা ভুল হবে।

চিন্তিতভাবে তসলিম মাস্টার বলল, তাহ'লে কি 'খান'-রা জিতবে?

না-ও বলতে পারছি না। তবে শতকরা নিরানব্বই ভাগ সম্ভাবনা খানদের পরাজয়ের। শতকরা একভাগ যে সম্ভাবনা আছে তাও ভেঙ্গে পড়বে যত দিন এগোতে থাকবে। এটা সম্ভব হবে এই কারণে, যে উগ্র ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে বাঙলার মানুষের মনে, সেই ঘৃণা কয়েকশত বৎসরে জয় করতে পারবে না কোন শক্তি। অস্ত্রে খানদের মৃত্যু যদি নাও ঘটে, মৃত্যু ঘটবে মানুষের ঘৃণায়।

তসলিম মাস্টার আমার কথা ঠিক অনুধাবন করতে পারছিল না বলেই মনে হল। বললাম, এখনই তিনখানা পাক বিমান এখান দিয়ে উড়ে গেল, দেখেছেন বোধহয়। এদের একটা বম্বার, অপর দুটো ফাইটার। ওরা কোন লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করতে গেল, পেছনে আসছে খান সৈন্য ট্রাক বোঝাই দিয়ে। ওরা দখল করতে না পারলেও ধ্বংস করতে পারবে। যাবার আগে বাঙলাদেশকে শ্মশানে পরিণত করতে চায়, তাই করবেও। বাঙলার স্বাধীন সত্বাকে আঘাত দিয়ে ভাঙ্গতে না পারলেও, খানরা দেশে হাহাকার সৃষ্টি করে তবেই বিদায় নেবে। নতুন করে বাঙলাদেশকে গড়ে তুলতে হবে ভবিষ্যতে।

যে-সব খবর আমরা এ পর্যন্ত পেয়েছি তাতে তাই মনে হচ্ছে।

কিন্তু আপনারা বিমান আক্রমণ থেকে বাঁচার তো কোন ব্যবস্থাই করেন নি, উপরন্তু বিমান দেখতে গ্রামের লোক বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। এতে বিপদ হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। বিমানের শব্দ পেলেই নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে বলুন। প্লেন নীচে এসে গুলী চালাবে। নিরীহ গ্রামবাসী মরবে। আর যারা মুক্তিফৌজ,

তারা সব সময় সতর্ক থাকবে এবং তা যদি থাকে, প্লেন নীচে এলেই ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী করতে হবে। তার ব্যবস্থা করুন।

আমাদের য়্যান্টি-এয়ারক্রাফ্ট নেই।

য়্যান্টি-এয়ারক্রাফ্ট উত্তর ভিয়েতনামেও খুব বেশি নেই। সে দেশের গ্রাম যখন আমেরিকার বিমানবহর আক্রমণ করে, তখন চাষী পুরুষ মেয়ে ট্রেন্চে নেমে রাইফেল থেকে গুলী চালায়। এইভাবে আড়াই হাজারের ওপর শত্রুবিমান জখম করেছে ভিয়েতনামীরা। পাকিস্থানের পঞ্চাশ-ষাটখানা প্লেনকে অনবরত আঘাত করলে দু'মাসেই ওদের শক্তি শেষ হয়ে যাবে। পাকিস্থানে তো ভারতের মত প্লেন তৈরী হয় না। আমেরিকা, রাশিয়া, ইংরেজ আর চীনের দয়াতে ওদের চলতে হয়। যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে একমাত্র চীন ছাড়া অন্য কেউ জঙ্গীবাদীদের সাহায্য করবে বলে ভরসা কম। চীন উত্তর-ভিয়েতনামকে সাহায্য করছে, কাম্বোডিয়া লাওসকে সাহায্য করছে, তার ওপর তার নিজের দেশরক্ষার প্রয়োজনও আছে। এমত ক্ষেত্রে খুব বেশি সাহায্য দিতে পারবে বলে ভরসা কম।

তসলিম মাস্টার বলল, আপনার কথা হাই-কম্যাণ্ডকে বলব।

বলার আগে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন। খানরা বুঝতে পেরেছে পূর্ববঙ্গকে বন্দুক দিয়ে শাসন করতে তারা পারবে না, কিন্তু মানুষ মেরে শায়েস্তা করবে যাবার আগে। সেজন্য প্রতিটি গ্রামে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা করুন।

তসলিম মাস্টার হতাশভাবে বলল, জিততে পারব কি?

জেতা নির্ভর করছে দুটি বস্তুর ওপর। প্রথমটি হল, জনসাধারণের মনোবল; দ্বিতীয়টি হল, যদি এটা জনতার যুদ্ধ হয়। জনসাধারণের মনে হতাশা যাতে না জন্মায় তার জন্য অবশ্যই সচেষ্ট থাকবেন, আর যুদ্ধটাকে জনতার যুদ্ধে পরিণত করতে হবে। প্রতিটি মানুষ হবে যোদ্ধা যে হানাদারদের সর্বপ্রকারে ঘায়েল

করার চেষ্টা করবে। আরেকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সামরিক ধর্ম হল, single command, নেতৃত্ব বিভক্ত হলেই সর্বনাশ হবে। এই দুইটি বস্তুকে দৃঢ় করুন, আর সামরিক ধর্ম মেনে চলুন, তাহ'লে জয় অবশ্যম্ভাবী এবং অতি শীঘ্র, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আমাদের অস্ত্র নেই। তাই জেলা-শহরগুলো দখলে রাখা যাচ্ছে না।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাস পড়তে হবে, মাস্টার সাহেব। সব সময় মনে রাখবেন, সাম্রাজ্যবাদী জঙ্গীশাহীরা তাদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করে শহরে, বন্দরে, রাজধানীতে। তাদের পুঁজিবাদী স্বার্থ এসব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। সেটাই ওরা পাহারা দেয় আগে। গ্রামে প্রবেশ করতে পারে না। মনে করুন, পাকিস্থানী হানাদারদের যা সংখ্যা রয়েছে এই বাঙলাদেশে তা হল এক লক্ষ। বাঙলাদেশের জেলা, মহকুমা শহর ও বন্দর নিয়ে যদি সত্তরটিও থাকে, তা রক্ষা করতেই ওদের সত্তর হাজার সৈন্যের দরকার হবে। গ্রামে তিরিশ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে স্থায়িভাবে দখলদারী রাখতে পারবে না। তাদের ওপর হামলা করলে তারা গ্রাম ছেড়ে পালাবে ; তবে মাঝে মাঝে আসবে দলবদ্ধ হয়ে এক এক এলাকায়, অত্যাচার করবে, আবার পালাবে। তার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং সেই জন্যই single command-এর প্রয়োজন। সেই single command-এর নির্দেশেই লড়াই চলবে। আর শহরের ওপর বার বার হামলা করতে হবে চোরা গোপন পথে। এর ফলে শহরকে অরক্ষিত রেখে ওরা বের হতে পারবে না। মুখোমুখী যুদ্ধকে সবসময় এড়িয়ে যেতে হবে, সংবাদ ও যোগাযোগ-ব্যবস্থাকে শক্ত দৃঢ় করতে হবে, নিখুঁত করতে হবে। এই কাজে মেয়েরাই বেশি সাহায্য করতে পারবে।

আমাদের দেশের পর্দানশীন মেয়ে, যারা পর্দা ছিঁড়েছে তারা খুবই দুর্বল। পারবে কি ?

পারতেই হবে। দেশের জন্য সবরকম ত্যাগস্বীকার করতেই হবে। গরু-ছাগলের মত পুরুষরা মরবে, আর গণিকার মত মেয়েরা ধর্ষিতা হবে, এটা কোন সভ্য মানুষ চিন্তা করতেও পারে না। কিন্তু তাই ঘটছে। তাকে রোধ করার এটাই বড় ও নিরাপদ উপায়। আর আপনারা যদি মনে করে থাকেন এ শেষ হবে অতি শীঘ্রই, সেটা ভুল ধারণা। এটা চলবে বহুকাল।

বেশিদিন যুদ্ধ চললে সাধারণ লোকের মনোবল ভেঙ্গে যেতেও তো পারে।

বললাম, উল্টোটাও হতে পারে। যুদ্ধ ধ্বংস আনে। সমাজ-জীবন তছনছ হয়ে যায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রাপ্য হয়, মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। এসব জেনেই মানুষ স্বাধীনতা রক্ষা এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধ করে। বেশিদিন যুদ্ধ চললে অবর্ণনীয় কষ্টের সম্মুখীন হতেই হবে। যুদ্ধের গতিপ্রকৃতিও বদল হবে। একটা কথা মনে রাখবেন মাস্টারসাহেব, খানরা হানাদার এবং ওরা উপনিবেশ দখল করে রাখতে চায়। ইংরেজ খুব শক্তিশালী। তারাও তাদের উপনিবেশ রক্ষা করতে পারেনি। ইংরেজ তার অবস্থা বুঝেছিল, তাই মানে মানে বিদায় নিয়েছিল নিজের দেশের লোকদের বাঁচাতে। পাঁচ হাজার কিলোমিটার দূর থেকে এসে খানরা যুদ্ধ করছে। তাদের বেতন, রসদ, অস্ত্র জোগাতে পাকিস্থানের ট্রেজারী শূন্য হবে। প্রতিদিন ব্যয় হচ্ছে, আয় নেই। যুদ্ধ যত বেশিদিন চলবে অর্থনৈতিক বিপর্যয় তত বেশি দেখা দেবে।

তসলিম মাস্টার মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, অবশ্যই। আমাদের হাইকমাণ্ডের আদেশ—এক পয়সা খাজনা ট্যাক্স দেওয়া চলবে না। কোর্ট কাছারি আদালত স্কুল কলেজ বন্ধ। সরকারী Revenue বন্ধ। আর বন্দরগুলো ভেঙ্গেচুরে তছনছ হয়েছে, বাইরে মাল যাচ্ছে না। বিদেশী মুদ্রাও আসছে না। পূর্ব-বাঙলাকে কব্জায় রাখতে দৈনিক কয়েক কোটি টাকা খরচও হচ্ছে।

তাই যুদ্ধ যত বেশিদিন চলবে ততই হানাদারদের মধ্যে বিপর্যয় দেখা দেবে। তারপর একদিন শুনতে পাবেন, মিলিটারী জুণ্টা এহিয়া (ইয়াহিয়া)-কে কান ধরে গদি থেকে নামিয়ে দিয়েছে। আরও একটা ঘটনা ঘটবে, সেটা হল, পাকিস্থানের ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠবে। কোন পাকিস্থানী যে করাচী লাহোরে ফিরে যাবে, এ আশা কম। ইতিমধ্যে কয়েক হাজার পশ্চিম পাকিস্থানীকে মাটি নিতে হয়েছে, তাদের উৎকণ্ঠিত আত্মীয়স্বজন কোনমতেই যে গণহত্যায় খানরা নেমেছে তা সমর্থন করবে না। আমেরিকার মায়েরা প্রতিবাদ জানাচ্ছে ভিয়েতনামের যুদ্ধে তাদের সন্তানদের পাঠানোতে। নিকসন বাধ্য হয়েছে তার ভিয়েতনাম পলিসি বদল করতে। এখন শান্তির আলোচনা হচ্ছে। এ আলোচনা সফল হবে যখন আমেরিকার মিথ্যা মর্যাদাজ্ঞান লোপ পাবে। ঠিক এইভাবেই পাকিস্থানের মা, বোন, স্ত্রীর দল বিক্ষোভ জানাবে। সেদিন খুব দূরে নয়। বাঙলার মায়েরাই শুধু কাঁদছে, তা নয়। পাকিস্থানের খানদের মায়ের চোখের জল মোছাবার লোক থাকবে না। এখানকার সংবাদ ওখানে পৌঁছে দেবার লোকও সেদিন থাকবে না। সেজন্য যুদ্ধ যত বেশিদিন চলবে, বাঙলাব স্বাধীনতার শেকড় তত দৃঢ় হবে। কারও মনোবল ভাঙ্গবে, কারও গড়বে।

বেশিদিন যুদ্ধ চললে বাঙলাদেশে ভিয়েতনামের অবস্থা হবে।

স্বাভাবিক।

তাতে দেশে তো কিছুই থাকবে না।

যদি বাইরের শক্তি এতে নাক না গলায়, তাহলে ভিয়েতনাম হবে না ; যদি নাক গলায়, তাহলে বাঙলার মাঠঘাট রক্তে কর্দমাক্ত হবে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ডাব কেটে এনে আমাদের সামনে রাখা হল।

দুটি নুনভাত মুখে দিতে কি আপত্তি আছে ? বেলাও অনেকটা হল।

অবিনাশ বলল, মন্দ কি। খেয়েদেয়ে আবার পথ চলতে পারব।

তসলিম মাস্টার বলল, আমার বড় চাচার ছেলে হানিফের আসার কথা আছে। যশোর থেকে পালিয়ে আসছে। সেখানে হাইস্কুলে মাস্টারী করত। স্কুল বন্ধ ছিল। তখনই আসতে পারত, কিন্তু তা না করে সে সেখানে ছাত্রদের মিলিটারী ট্রেনিং দেবার জন্য ছিল। যশোর দখল করেছে খানরা। সবাই শহর ছেড়ে চলে এসেছে। কাল একজনের কাছে শুনলাম, হানিফভাইও আসছে। আজই বাড়ি পৌঁছতে পারে। তার সঙ্গে কথা বললে অনেক জানতে পারবেন। সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সদ্য প্রত্যাগত। আপনারা আজ এখানেই থেকে যান।

আমরা পরস্পরের মুখ দেখলাম। সবাই সম্মত। রাজী হয়েও গেলাম।

আজ বৃষ্টি হয়নি। আকাশ পরিষ্কার। মাটি কিন্তু শুকোয়নি। ভিজা মাটিতে এক গাছতলায় বসে আমরা পাঁচজন। বক্তা হানিফ মাস্টার। শ্রোতা আমরা চারজন।

হানিফ মাস্টার বলল, শহর আমরা দখল করে নিয়েছিলাম সামান্য যুদ্ধের পর। আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। পঁচিশ তারিখে রাতের বেলায় ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে একদল পাকিস্থানী ফৌজ বের হয়ে প্রথম আক্রমণ করল পুলিশ লাইন।

দাবি করল আরমারির চাবি।

পুলিশদল বলল, আমরা ডেপুটি কমিশনার আর পুলিশ সাহেবের হুকুম বিনা চাবি দিতে পারব না। তাদের হুকুম নিয়ে আসুন।

খানরা যুক্তিটা মনে মনে মেনে নিলেও বাইরে তাদের অধিকার ছাড়তে রাজী হল না। তাদের কেউ কেউ বলল, একজনকে

এস.পি.-র কাছে পাঠাও, কিন্তু যে অফিসার এসেছিল সে তখন নেশার ঘোরে। মেজাজ তার অনেক উঁচু পর্দায়। সে বলে উঠল, নেহি। তুমলোগকো দেনে হোগা।

সামান্যক্ষণ মাত্র।

হঠাৎ গুলীবর্ষণ আরম্ভ করল লাইট মেশিনগান থেকে। যারা সামনে ছিল, তাদের মৃতদেহ গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। সঙ্গীরা পালাল না। তারা প্রত্যুত্তর দিল। একঘণ্টা চলল গুলী উভয় পক্ষের। পাকিস্থানীরা হটে গেল। বোধহয় গুলী আর ছিল না।

ইতিমধ্যে পুলিশ লাইনের সবাই প্রস্তুত হয়ে নিল। আরমারি খুলে সবাই রাইফেল তুলে নিল হাতে। তখনও তাদের আক্রমণাত্মক কোন ভঙ্গী ছিল না, ছিল আত্মরক্ষার চেষ্টা।

সকাল পাঁচটা আমাদের ঘড়িতে।

আবার আরম্ভ হল গুলী-বিনিময়। এবার সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল খানের দল।

শহর তখন সচকিত।

জনসাধারণ কিছুই বুঝতে পারছিল না। কেন এই গুলী চলছে তা জানার আগ্রহ ছিল সবাইয়ের। তারা রাস্তায় ভিড় করতে থাকে।

খানরা তখন পৈশাচিক আনন্দে মেতেছে। নিরস্ত্র মানুষদের হটিয়ে দিতে অজস্র গুলীবর্ষণ করল তাদের উপর। কত যে মারা গেল তার হিসাব নেই।

খানদের এই হত্যালীলার সংবাদ পেয়ে পুলিশবাহিনী, ই. আর. পি. ছুটে এল হাতিয়ার নিয়ে। আরম্ভ হল সম্মুখ সমর। ফৌজ হটতে থাকে। তাদের গাড়িতে আগুন লেগে যায়। কয়েকজন হতাহত হয়। তখন তারা পিছু হটে চোঁ-চা দৌড় দিল ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে।

শহরে তখন কোন সৈন্য নেই।

কিন্তু আপনারা বোধহয় জানেন, যশোর ক্যাণ্টনমেণ্ট অত্যধিক

সুরক্ষিত। এখানকার হাওয়াই আড্ডা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী আড্ডা। আমরা স্থির করলাম, একদল defence-এ থাকবে, আরেক দল offence-এ যাবে যাতে ক্যান্টনমেণ্ট থেকে খানরা বের হতে না পারে তার জন্য।

প্ল্যানটা ঠিকই হয়েছিল। হাতিয়ার আমাদের কম, আর আধুনিক ভারী অস্ত্র নেই বললেই হয়। তবুও দিনের পর দিন আমরা তাদের বাধা দিয়েছি। শহর মুক্ত ছিল বেশ কয়েকদিন।

খানরা পালিয়ে গিয়েছিল ক্যান্টনমেণ্ট এলাকায়। এরপর তাদের প্রস্তুতি চলল।

সমগ্র যশোর শহর আমাদের দখলে। জনজীবনকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছি, এমন সময় হানাদাররা ট্যাঙ্ক কামান সাঁজোয়া-গাড়ী নিয়ে আক্রমণ শুরু করল।

এক, অসামরিক জনসাধারণকে বেপরোয়া হত্যা আবালবৃদ্ধ-বনিতা বিচার না করে।

দুই, পথের ধারে যত গ্রাম সব পুড়িয়ে ছারখার করা।

তিন, যুবতীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার।

চার, শহরের দোকানপাট লুটপাট করা।

হানাদার বাহিনীর পেছনে আসে অবাঙালী মুসলমানরা, তাদের কাজ হল লুটপাট, নারীধর্ষণ ও আওয়ামী লীগের সমর্থক ও হিন্দুদের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার করা। এদের সাহায্য করছে জামাতি ইসলামী দল আর মুসলীম লীগ।

যশোরে মৃতের সংখ্যা কম করেও দশ হাজার।

শহরের রাস্তায় শকুন শেয়াল কুকুর এইসব লাশ টানাটানি করে ছিঁড়ে খাচ্ছে। দুর্গন্ধে বাতাস কলুষিত। নিশ্বাস নেওয়া সম্ভব নয়। শহরের যারা জীবিত অধিবাসী, তাদের শতকরা নব্বই জন পালিয়ে গেছে, বিশেষ করে যাদের ঘরে মেয়ে আছে তারা না পালিয়ে যেতে পারেনি। তাদের মানসম্মান রাখার প্রশ্নই বড় প্রশ্ন।

মেয়ে-কলেজের অধ্যাপিকা ডক্টরেট-পাওয়া মহিলাকে তার বাড়ি থেকে টানতে টানতে রাস্তায় নিয়ে এসে পরপর কয়েকজন ধর্ষণ করেছে, তারপর তার স্তন কেটে ফেলেছে, শেষ বেলায় তাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছে !

ঘটনা শুনেই অমল শিউরে উঠল।

বর্তমান যুগে একি সম্ভব !

প্রশ্নের উত্তরে হানিফ মাস্টার বলল, সম্ভব নয় বলেই জানতাম, কিন্তু তাও সম্ভব হয়েছে। আমরা যে পদানত একটা জাতি, আমাদের ইসলামের নামে যেভাবে শোষণ করেছে, তার তো এই সবই প্রমাণ। ওরা ইসলামের নামে এই পাপ কাজ করছে, যারা এই ঘৃণ্য বর্বর ঘটনা শুনবে অথবা দেখবে, তারা ইসলামকেও ঘৃণা করবে। পবিত্র ইসলামের ও রসুলের খেলাফী এই হানাদারদের গুণাহ্ খোদাতালা কোনদিন মার্জনা করবে না।

আমরা কিন্তু আইনানুগ নাগরিক। আমরা জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার দাবি করেছি। জনসাধারণ সব রকম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে অস্বীকার করে, আমাদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার দিয়েছিল। আমরাও আমাদের ওপর ন্যস্ত কর্তব্য পালন করতে চেয়েছি। এটা কোন সভ্য সমাজব্যবস্থায় অপরাধ নয়। অথচ আমাদের ওপর কী নিপীড়ন হচ্ছে, তা কল্পনা করা যায় না।

আমাদের দাবি ছিল ছয়টি।

এই দাবি পাকিস্থানী জঙ্গীশাসকরা স্বীকার করতে চায় না, কারণ তাদের একচেটিয়া শোষণ বন্ধ হবেই হবে।

আমাদের যে ছয়টি দাবি, তা অন্যায় নয়। স্বাধীন জাতির অংশীদার সবাই এই দাবি করতে পারে এবং যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তারা এই দাবি মেনে নিতে কখনই আপত্তি করত না।

প্রথম দাবি হল, পাকিস্থানের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং

পার্লামেন্টারী হওয়া চাই এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হবে।

এই দাবি কি অন্যায় দাবি ?

আমরা দাবি করেছিলাম, লাহোরে যে ঐতিহাসিক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল, সেই প্রস্তাব অনুসারে পাকিস্থানে একটি সত্যিকারের ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হোক। এই যুক্তরাষ্ট্রে থাকবে সংসদীয় পদ্ধতিতে একটি সরকার। সংসদের নির্বাচন হবে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে। অর্থাৎ ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ ইত্যাদি যে-সব দেশে গণতন্ত্র স্বীকৃত ও সম্মানিত, সেইসব দেশের মতই অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন আমরা দাবি করেছি।

এই প্রস্তাব গ্রহণে দেশের মানুষের আপত্তি ছিল না, আপত্তি ছিল সামরিক শাসকদের। এহিয়া বন্দুকের কুঁদো দেখিয়ে গদিতে বসেছে, সে জনমতের ধার ধারে না। সারাজীবন গোলামি করে, হঠাৎ সে সকল ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে, সেজন্য তার অধিকার পরিত্যাগ করতে সে রাজী নয়।

অবশেষে প্রথম দফা অনুসারে নির্বাচন স্বীকার করেছিল পাঞ্জাবী জঙ্গীশাহী।

অথচ দেখুন, লাহোর-প্রস্তাব পাকিস্থানের জনগণের নিকট কায়েদে আজম জিন্নাহ্ সহ অন্যান্য নেতাদের পবিত্র ওয়াদা। এই ওয়াদাতে আস্থা রেখে বাঙলার মানুষ ছয়চল্লিশ সালে লীগের সপক্ষে ভোট দিয়েছিল। বাঙলার মানুষ যদি লীগের অনুকূলে ভোট না দিত, তা হলে গুজরাতী জিন্নাহের পাকিস্থানের স্বপ্ন বাতাসে মিলিয়ে যেত। গুজরাতীরা কিন্তু জিন্নাহ্কে সমর্থন করে নি।

এহিয়া (ইয়াহিয়া) মনে করেছিল আওয়ামী লীগ, সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোট হলেও, বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না। বাঙলাদেশে কয়েকগণ্ডা দল আছে, বিশেষ করে মুসলীম লীগ, জামাতি

ইসলামী প্রভৃতি উগ্র সাম্প্রদায়িক দল নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগে ভাঙ্গন ধরাবে। সামরিক জঙ্গীশাহীর বর্বর রথচক্র যেমন চলছিল তেমনি চলবে।

কিন্তু বাঙলার মানুষ যেমন সমবেতভাবে মুসলীম লীগকে ভোট দিয়েছিল মুসলীম লীগের ওয়াদাতে বিশ্বাস করে, তেমনি ওয়াদা-ভঙ্গকারী মুসলীম লীগকে প্রত্যাখ্যান করেছিল চুয়ান্ন সালে।

সেবারও মুসলীম লীগ ছিল ক্ষমতায়।

মুসলীম লীগের ভাড়াটিয়া চাটুকার বগুড়ার মহম্মদ আলি মোল্লা মওলবী আলেম উলেমা লাহোর করাচী থেকে আমদানি করে বহু চেষ্টা করেছিল মুসলীম লীগকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু বাঙলাদেশের মানুষ বিশ্বাসঘাতক ওয়াদা-ভঙ্গকারী মুসলীম লীগকে নর্দমায় নিক্ষেপ করতে একটুও দ্বিধাবোধ করেনি। সেদিন দেশের মানুষের সামনে ছিল একুশ দফা দাবি পূরণের ওয়াদা, কিন্তু সংযুক্তদল কোন কাজই করতে পারেনি। মহম্মদ আলির জোচ্চুরি আর মীরজাফরের বংশধর এস্কান্দার মির্জার জালিম শাসনে বাঙলার মানুষের নাভিশ্বাস উপস্থিত।

বাঙলার মানুষ নীরবে সহ্য করেছিল কি? না, ক্ষোভ তাদের মনে ধীরে ধীরে জমে উঠছিল।

তারই প্রতিফলন হল সত্তর সালের নির্বাচনে।

আওয়ামী লীগ জনসাধারণের রায় নিয়েই ক্ষমতা লাভ করবে এই তো গণতন্ত্র। সেই নির্বাচিত সদস্যদের দেশদ্রোহী বলার অর্থ গোটা পূর্ববঙ্গের লোককে দেশদ্রোহী বলা। সাড়ে সাত কোটি লোক যদি দেশদ্রোহী হয়, তা হলে দেশপ্রেমিক কারা? যারা বাঙলাদেশে অনভিপ্রেত শোষক?

আশ্চর্য পাঞ্জাবী জঙ্গীবাদীদের যুক্তি!

আমাদের দ্বিতীয় দাবি হল, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা

দেশরক্ষা এবং বৈদেশিক নীতি পরিচালনা—এই দুইটি কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

কায়েমী স্বার্থের দালালরা এই দাবিকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। বঙ্গবন্ধু মুজিবর বলেছেন, "এই প্রস্তাবের দরুণই ওঁরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশি চটিয়াছেন। আমি নাকি পাকিস্থানকে দুই টুকরা করতঃ ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়াছি। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইঁহাদের এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে ইঁহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশন উনিশ শত ছয়চল্লিশ সালে যে 'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে 'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা—এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল, বাকি সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৃটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ সকলের মত এই যে, এই তিনটি বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তিভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। তা না হইলে এই তিনটি বিষয় লইয়াই আজও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি।" (শেখ মুজিবর রহমান, ১৯. ৩. ৭১).

অমল বলল, ভারতেও প্রায় সকল ক্ষমতা রয়েছে কেন্দ্রের হাতে। বলতে গেলে, রাজ্য-সরকারদের দুটো ক্ষমতা রয়েছেঃ একটি হল, পুলিশ দিয়ে লাঠি-পেটানো, দ্বিতীয় হল, দলবিশেষের টাকা চুরি করার আইনসঙ্গত (?) একচেটিয়া অধিকার। নইলে রাজ্য-সরকারগুলো হল তাসের রাজা। ঝড়ঝাপটা এলে মাটিতে গড়ায়।

হানিফ মাস্টার বলল, ভারত ও পাকিস্থানের অবস্থা এক নয়। আপনারা পাঠানকোট থেকে ট্রেনে চেপে কলকাতায় নামতে পারেন, কিন্তু পেশোয়ার থেকে ট্রেনে চেপে চট্টগ্রামে আসা যায় না। ভৌগোলিক দূরত্ব তার কারণ নয়, কারণ হল অখণ্ডতা। পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিম পাকিস্থানের সঙ্গে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থাই নেই। সেজন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা কেন্দ্রের হাতে রাখা নিরর্থক; কিন্তু ভারতে তা সম্ভব। রেলওয়ে, টেলিগ্রাম, টেলিফোন ব্যবস্থা প্রদেশের হাতেই থাকা উচিত। ভারতের সঙ্গে আপনারা তুলনা করতে পারেন ঠিকই, কিন্তু সে তুলনা খুবই বেমানান। আপনাদের গণতান্ত্রিক সরকার আছে। আপনাদের সংসদ আছে। আপনাদের সরকার কোন অন্যায় করলে আপনারা প্রতিবাদ করতে পারেন, আপনারা সংসদে ঝড় তুলতে পারেন। আমাদের কিছুই নেই।

এস্কান্দার মির্জাকে বন্দুক দেখিয়ে বিতাড়িত করেছিল আয়ুব খান।

আয়ুব খান ক্ষমতায় বসেই মার্শাল আইন জারী করল। মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে আর কিছুই থাকল না।

শুধু তাই নয়। অসামরিক শাসন-ব্যবস্থায় সামরিক অফিসারদের বসালো। আর অতি ঘৃণ্য একটি শাস্তির ব্যবস্থা করল। সেটি হল বেত্রাঘাত। কাকে বেত্রাঘাত করা হবে? যারা ভারত-পাকিস্থানে চোরা কারবার চালায় তাদের। ব্যক্তিগত শত্রুতা মেটাতে এবং হিন্দু-বিতাড়ন করতে এই শাস্তিপ্রয়োগ হল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আজ তার পৈশাচিক পরিণতি মনে করলেও বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়, ঘৃণা জন্মায় ঐসব পশ্চিম পাকিস্থানীদের ওপর।

কি ভাবে শাস্তি দেওয়া হত, সেটা শুনে রাখুন। ভারতে এরকম যদি হত, তাহলে আপনারা কি করতেন তাও বলবেন। শাস্তিদান ঘোষণা করা হল ঢোল বাজিয়ে—শহরে গ্রামে গঞ্জে

চ্যাঁরা দিয়ে। লোকদের ডাকা হত এই শাস্তিদান দেখতে। (A friend witnessing such a demonstration in Dacca told once that they were always made with a view to impressing the people. Not the victim to be whipped but the crowd witnessing the scene was the target.) অর্থাৎ যাকে শাস্তি দেওয়া হত, তার চেয়ে দর্শকদের মনে ভীতি সঞ্চার করার উদ্দেশ্যেই প্রকাশ্যে এই বেত্রাঘাত করা হত। এবারে আপনারা বলুন, কোন্ সভ্য সমাজ এটা সহ্য করে ?

অমল বলল, মুজাফরপুরে কিংসফোর্ডের গাড়িতে যে বোমা মারা হয়েছিল, তার পেছনে ছিল এই নৃশংস শাস্তিদান। শহীদ ক্ষুদিরাম অত্যাচারী বিচারককে শাস্তি দিতে যেয়ে কিছুটা ভুল করেছিলেন।

কিন্তু আমাদের মনে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল, সেদিন সে ক্ষতে প্রলেপ দেবার মত ওষুধ পাওয়া যায়নি। আমরা শুধু অপেক্ষা করেছি সুদিনের। আপনারা একবার দৃশ্যটা কল্পনা করুন :

> "A dais was built. The army man, the medical man, the condemned man and the 'Whip-man' stood on it. The stroke administered must cut deep into the flesh. Blood must gush out for spectators to witness. Any man must collapse if he received half a dozen lashes. The medical man would then treat him and as soon as he gained consciousness, the operation would be repeated until the sentenced passed against him was gone through * * * The main target to be hit on that occassion were members of minority community (Hindus)."

এবার চিন্তা করুন মধ্যযুগীয় এই বর্বরতা সভ্য জগতে কারও সমর্থন পায় কিনা। এ যেন সেই সুলতানী আমল। উঁচু বেদী তৈরী হল, হেকিম এল, কয়েদী এল, ঘাতক এল। জনসমক্ষে কয়েদীর শিরশ্ছেদ করা হল। সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজ ঠিক এইভাবে না হলেও, প্রকাশ্যে গাছের ডালে ফাঁসি লটকে হত্যা করেছিল বিপ্লবী সিপাহীদের ভারতীয়দের মনে ত্রাস সৃষ্টি করতে। এখানেও বাঙলার জনসাধারণের মনে ত্রাস সৃষ্টি করতে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আর এদের লক্ষ্যস্থল হল সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু। সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দু-বিতাড়নের এটাও একটা পথ বলেই ওরা গণ্য করত।

আকাশের চাঁদ ডুবে গেল।

আমি বললাম, অনেক রাত হয়েছে। এবার শোয়া যাক এইখানে। বেশ মিঠে বাতাস আছে।

হানিফ মাস্টার বলল, কাল সকালেই আপনারা রওনা হতে চান ?

বললাম, ইচ্ছা তো আছে।

ইতস্ততঃ করে হানিফ মাস্টার বলল, একটা দিন অপেক্ষা করুন, আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে। আমার বিবি ও বাচ্চাকে ওপারে আমার নানাশ্বশুরের বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা করেই রওনা দেব।

আপনি তো বিপদসঙ্কুল অবস্থা থেকে এলেন। আবার কেন যাবেন ?

আগে ভেবেছিলাম, নিজেকে বাঁচানোই বড় কাজ, কিন্তু এই বৃহৎ নরমেধযজ্ঞে আমি তো কিছুই নই। আমার বাঁচা মরা দুই-ই সমান। কিন্তু আমরা যারা শিক্ষিত সম্প্রদায়, আমরা যদি পালিয়ে যাই, তা হলে দেশের মানুষের মনোবল ভেঙ্গে যাবে। যারা নেতা, তারা যদি আগে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, তা হলে যারা লড়াই করছে তারা কেন বুকের রক্ত দেবে ? আসল যুদ্ধ তো মনোবলের। হাজার বছরেও এই মনোবল ভাঙ্গতে পারবে না এহিয়া। তাই

আবার আমি ফিরে যাব জনতার মাঝে। আপনারা একটা দিন অপেক্ষা করুন। হয়ত কাল রাতেই আমরা বেরিয়ে পড়তে পারব। তসলিম বলছিল, কুষ্টিয়া মুক্ত হয়েছে, আমরা সেদিকেই যাব। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, যদি একাও চলেন কখনও, পাকা রাস্তা দিয়ে যাবেন না। পাকা রাস্তার যেন কম করেও তিন মাইল দূর দিয়ে যাবেন। সংবাদ শুনবেন গ্রামের লোকের কাছে, তারা বলতে পারবে খানরা কোথায় আছে। সেই অনুসারে পথ চলবেন। মোটেই হঠকারিতা করবেন না। তবে আমি যখন থাকব, তখন ঠিকই নিয়ে যেতে পারব।

প্রাইমারী স্কুলের ভাঙ্গা ঘরেই রাত কাটিয়ে সকালবেলায় তসলিম মাস্টারের বাড়িতে হাজির হলাম। তার কাছেই শুনলাম হানিফ মাস্টার তার বিবি বাচ্চা নিয়ে গেছে সীমান্ত চৌকীতে। দুপুর নাগাদ ফিরে আসতে পারে।

তসলিম মাস্টারের দোকানে ছিল দেশী বিস্কুট। কতকগুলো বিস্কুট কিনে তিনজনে সকালের জলখাওয়া শেষ করলাম। চা বিনা মূল্যেই সরবরাহ করলেন তসলিম মাস্টার।

দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করার চেয়ে তসলিম মাস্টারের কাছ থেকে একখানা সাইকেল নিয়ে অবিনাশ ও অমল গেল শহরে। উদ্দেশ্য খাবার সংগ্রহ করা।

বারটার মধ্যেই ওরা ফিরে এল শহর থেকে রুমালে করে ভাত আর লাউয়ের তরকারী নিয়ে। দু' টুকরো মাছভাজাও ছিল সঙ্গে।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা খেয়ে এসেছ ?

হাঁ।

কত দাম নিল খাবারের ?

বার আনায় ভাত, ডাল, লাউয়ের তরকারী আর দু' টুকরো মাছ।

অবিনাশ বলল, খুব সস্তা। সারা ভারতে এ দামে খাবার পাওয়া সম্ভব নয়।

বললাম, তা ঠিক, তবে বার আনাটা আমাদের এক টাকা বিশ পয়সার সমান, সেটা ভুলে যেও না বন্ধু। পাকিস্থানী এক টাকার মূল্য ভারতের এক টাকা চল্লিশ পয়সা। তবুও সস্তা।

রুমাল খুলে ভাত-তরকারী মাছভাজা খেয়ে প্রাণ ভরে জল খেলাম।

বেলা দুটো অবধি হানিফ মাস্টারের দেখা নেই। প্রায় তিনটের পরে হানিফ মাস্টার ফিরে এল। এসেই বলল, কাজ শেষ করে এসেছি। সবাই করিমপুর পৌঁছে গেছে। আজই রওনা দেব। আপনাদের খাওয়া-দাওয়া হয়নি বোধ হয়। হয়েছে? আমি গোসল করে খেয়ে আসছি।

রাতের বেলায় চারজনে বের হলাম নিরুদ্দেশ পথে।

আকাশে জ্যোৎস্না। পথ চলতে অসুবিধা নেই।

কিছুটা পথ এগিয়ে যেতেই হানিফ মাস্টার বলল, এটা আমাদের দেশ।

বললাম, নিশ্চয়ই।

অনেক সময় মনে হয় এদেশে আমরা বিদেশী: নিজের ঘরে নিজের বাড়িতে নিজের দেশে আমরা চোরের মত চলছি। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি থাকতে পারে বলুন। সেই যে কথা আছে, নেপোয় মারে দই, সেই অবস্থা। অবশ্য এর জন্য আমরাই দায়ী। আমরা মানে আমাদের মুরুব্বীরা।

মুসলমানদের উচিত ছিল ইংরেজ-বিদ্বেষী হওয়া। ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশ ছিল মুসলমানদের দখলে। অবশ্য মুসলমানরাও এদেশে প্রথম অবস্থায় ছিল দখলদার, হানাদার। তুরুক, ইরাণী আর কাবুলী মুসলমানদের কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছিল না ভারতের ওপর। ভারতের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়াকে বিষাক্ত করেছিল মুসলমান সাম্রাজ্যবাদীরা। অবশ্যই আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন

মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন, তখন দখলদারীর প্রশ্ন না থাকলেও সাম্রাজ্যবাদীর চেহারা বদল হয়নি।

ইংরেজ দখল করল বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা। ছলে বলে কৌশলে মুসলমানদের কাছ থেকেই ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র হল ক্ষমতাসীনকে আঘাত করে ক্ষমতা-দখল। ঠিক একটা চেন দিয়ে এই ঘটনাগুলো বাঁধা থাকে। গণতন্ত্রী দেশে জনতার যে দাবি থাকে, সে দাবি থাকে না সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে। এখানেও এস্কান্দারকে হটিয়ে আয়ুব, আয়ুবকে হটিয়ে এহিয়া, এরপর পশ্চিম পাকিস্তানে পীরজাদা গদিতে বসবে অথবা হামিদ খাঁ বসবে অথবা করিম খাঁ বসবে—তা এখনও ঠিক জানা যায়নি। কিন্তু ইতিহাসকে উপেক্ষা করতে কেউ-ই পারে না। ইতিহাসের সত্য হল এহিয়ার পতন, তবে প্রশ্ন হল, কবে এবং কখন। সেটাও অনেকটা স্থির হয়ে এসেছে।

আমাদের মুরুব্বীদের মনে কিভাবে সাম্প্রদায়িকতা বীজবপন করেছিল তা তো কারও অজানা নয়। আমার বাবার ঠাকুরমা ছিলেন খুলনার একজন বারুজীবীর মেয়ে। তিনি যে-ঘর থেকে এসেছেন, সে-ঘরের সবাই তো মুসলমান হয়নি। রক্তের সম্বন্ধে আমরা আর ঐ পরিবার একই। অথচ আমাদের মনে ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছিল, একমাত্র নেতাদের স্বার্থ বজায় রাখতে।

আপনারা তো লড়াই করেছেন। স্বাধীনতার জন্য জেল জুলুম সহ্য করছেন, প্রাণ দিয়েছেন। আমরা, মানে বাঙালী মুসলমানরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছি, টিটকারী দিয়েছি। ইংরেজ-ভজনা করেছি। তাই খরচের পৃষ্ঠায় অনেক কিছু থাকলেও ব্যালান্স শীট টানা হয়নি সেইদিন। প্রথম হিসাব দিতে হয়েছে বাহান্ন সালে, তারপরই হিসাবের শেষ পৃষ্ঠা লেখা হচ্ছে বর্তমানে। আপনাদের পরম-পুরুষরা বলে গেছেন, ফাঁকি দিয়ে কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না।

যখন আপনারা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন, তখন আমরা ভাগ-

বাঁটোয়ারা করে বিনা পরিশ্রমে স্বাধীনতার নামে দেশকে টুকরো করার কাজে ব্যস্ত। শুধু তাই নয়। যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিল, তাদের সঙ্গে একটুকরো রুটির জন্য নরঘাতনে আমরা নেমেছিলাম। আজ সেইসব কাজের দাম নগদে দিতে হচ্ছে। ইতিহাস কাউকেই মার্জনা করে না।

দেখছেন মাঠ চষা হচ্ছে। কিন্তু পাট বুনতে হবে। ধান নয়। পাট পশ্চিম পাকিস্থানের সম্পদ বৃদ্ধি করবে, তার বদলে গম আসবে, আমরা বাঙ্গালীরা ভাতের বদলে গম খাব, পাটের টাকায় পকেট ভর্তি করে দেব আমাদের প্রভুদের। এবার পাট বোনা চলবে না। যে পাট বুনবে তাকে কষ্ট পেতে হবে।

আসল ঘটনা হল অর্থনৈতিক।

আমরা ছয় দফা দাবির তৃতীয় দফায় বলেছিলাম, "পাকিস্থানের তুই খণ্ডের মুদ্রা পৃথক্ হবে। একখণ্ডের মুদ্রার সঙ্গে অপর খণ্ডের মুদ্রা-পরিবর্তনের সহজ ব্যবস্থা রাখতে হবে। যদি এটা সম্ভব না হয়, তবে বিকল্প হিসেবে পাকিস্থানে একই ধরনের মুদ্রা প্রচলন করে পূর্বখণ্ড থেকে পশ্চিমখণ্ডে যাতে মূলধন পাচার করা সম্ভব না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।"

আমাদের টাকা নানাপথে চলে যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্থানে। এখানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, ওখানে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাচ্ছে। অথচ ওদের হাতে টাকা আছে, আমাদের হাতে টাকা নেই।

আওয়ামী লীগ প্রস্তাব দিয়েছিল, "পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের জন্য তুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এ ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। তুই অঞ্চলের জন্য তুইটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাঙ্ক থাকিবে। অথবা, তুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে 'এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে

যাহাতে পূর্ব পাকিস্থানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্থানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্থানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে" (ছয়দফা দাবি—আওয়ামী লীগ)।

ওরা তা স্বীকার করবে কেন! শোষণ বজায় রাখতে হলে এই প্রস্তাব বা দাবি গ্রহণ ওদের পক্ষে অসম্ভব। কোন সাম্রাজ্যবাদী জঙ্গীশোষক এটা তো মানতে পারে না। ওরা বলল, অসম্ভব। এটা হতে পারে না।

আমরা বললাম, এ যদি করা না হয় তাহলে পূর্ব-পাকিস্থান যে একটা স্বাধীন দেশের অংশ, তা মোটেই আমরা উপলব্ধি করতে পারব না। আমাদের নেতা বললেন, এটা সম্ভব। বললেন, "একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ ছাড়া পূর্ব-পাকিস্থানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার অন্য কোন উপায় নাই।"

আপনারাই বলুন, আমাদের পূর্ববঙ্গ যে টাকা আয় করে বিদেশের বাজার থেকে, তা জমা হয় ইসলামাবাদের কোষাগারে। টাকার গায়ে তো কোন চিহ্ন নেই। তাই কোন্ টাকা পূর্ব-বাঙলা থেকে যাচ্ছে, তার কোন হিসাবই পাওয়া যায় না। পূর্ব-পাকিস্থানের আয় পশ্চিম পাকিস্থানে চলে যাচ্ছে। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, ইন্‌সিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশন-সমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্থানে। এর ফলে পূর্ব-বাঙলা থেকে অর্জিত অর্থ সবই চলে যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্থানে। ব্যাঙ্কের ডিপোজিট, সিকিউরিটি মানি, শিল্প-বাণিজ্যের আয়, মুনাফা ও শেয়ার মানি—এক কথায় পূর্ব-পাকিস্থানের সব আর্থিক লেন-দেনের টাকা পশ্চিম পাকিস্থানে চলে যাচ্ছে। ফলে পূর্ববঙ্গের আর্থিক বুনিয়াদ ভেঙ্গে পড়েছে।

আমাদের নেতা বলেছেন; "মুদ্রাস্ফীতিহেতু পূর্ব-পাকিস্থানে নিত্য-

প্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্মূল্যতা, জনগণের, বিশেষতঃ পাট-চাষীদের দুর্দশা”—এ দুর্দশার মূল কারণই হল বর্তমান পাকিস্থানী মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনীতি। এর পরিবর্তন আমরা চাই। সেজন্য আলাদা মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রয়োজন। কিন্তু জঙ্গীশাসকরা কোন মতেই তা স্বীকার করছে না, করবেও না। তাদের একচেটিয়া শোষণ কোনক্রমেই রোধ করা সম্ভব নয়। আজ আমরা যে স্বাধিকার রক্ষা করতে লড়াই করছি, তা কি স্বেচ্ছায় করছি? আমরা বাধ্য হয়েছি। আমাদের ওপর জোর করে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বললাম, আপনারা তো গান্ধীনীতি অনুসরণ করেছিলেন। অসহযোগ ও আইন-অমান্য আপনাদের অস্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন, তাকে আঁকড়ে ধরে রইলেন না কেন?

একটা পিঁপড়েকে পা দিয়ে টিপে মারতে গেলে সেও কামড় দেবার চেষ্টা করে। আর সাড়ে সাত কোটি মানুষের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে, তারা বিনা প্রতিবাদে মরতে কেন রাজী হবে? নিশ্চয়ই তারা বাঁচার জন্য চেষ্টা করবে। আমরাও তা করছি। এই লড়াই তো সখের লড়াই নয়, এটা হল বাঁচার লড়াই। তবে ‘খান’দের আর বেশিদিন লড়াই করতে হবে না· এ মাসেই ‘খান’-রা পালাবে।

হেসে বললাম, আপনারা যেন একটু বেশি চিন্তা করেছেন। পাকিস্থানী জঙ্গীশাসকদের চরিত্র সম্বন্ধে আপনাদের জ্ঞানও দেখছি সীমাবদ্ধ। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করেছেন কি? প্রথম হল, ওরা সাম্রাজ্যবাদী এবং অস্ত্রের জোরে ওরা দাবিয়ে রাখতে চাইবে বাঙলা দেশকে। ওদের যুক্তি হল, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্থান একই পাকিস্থানের অচ্ছেদ্য অংশ। দেশের সংহতি ও ঐক্য বজায় রাখতে বিভেদকামীদের হত্যা করলে বিশ্বের জনমত বিরুদ্ধে যাবে না, অন্ততঃ কেউ-ই এবিষয়ে আপনাদের সাহায্য করতে আসবে না সহজে। সেজন্য যে গণহত্যা অর্থাৎ Genocide ঘটাচ্ছে,

তা নির্বিবাদে ঘটাবে। দ্বিতীয় হল, পূর্ববঙ্গ হাতছাড়া হলে যারা শোষণ করছে, তাদের রুটি-রুজির অভাব হবে, সেজন্য তারা সবরকম বর্বরতা প্রদর্শন করবে। এতে কোন ব্যতিক্রম হবে না।

হানিফ মাস্টার বলল, তাহলে ওরা আমাদের ওপর চিরকাল আধিপত্য বিস্তার করে থাকবে কি ?

তা সম্ভব নয়। প্রথমতঃ, ওদের প্রতি অর্থাৎ অ-বাঙলাভাষীদের ওপর যে ঘৃণা জন্মেছে, তা থেকে কোনসময়ই ওরা নিষ্কৃতি পাবে না। তবে আপনাদের দেশেই কিছু কিছু লোক আছে যারা ওদের সাহায্য করবে এবং পশ্চিম পাকিস্থানের দালালী করে বাঙলা দেশকে অশান্তির মধ্যে ঠেলে দেবে। বিশেষ করে বিহারী অথবা ভারত থেকে এসে যে-সব অবাঙ্গালী মুসলমান বসবাস করছে, তারাই বেশি ক্ষতি করবে বাঙলা দেশের। এইসব ভারতত্যাগী মুসলমানরা পূর্ববঙ্গে গিয়েছে ভাগ্য অন্বেষণে। তাদের স্থান ভারতেও নেই, আবার পূর্ববঙ্গেও নেই। কোনক্রমেই তারা গিয়ে করাচী-লাহোরে হাজির হতে পারছে না। তাদের সামনে দুটো পথ খোলা। একটা হল মীরজাফরের ভূমিকা গ্রহণ করে পশ্চিম পাকিস্থানে জঙ্গীশাসন কায়েম রাখার জন্য বাঙ্গালীর বিরুদ্ধাচরণ করা, আর দ্বিতীয় পথ্ হল মীরজাফরী করার জন্য দণ্ডভোগ করা। ওরা মীরজাফরী করে এহিয়ার রাজ্য কায়েম রাখতে সর্বপ্রকার নারকীয় কাণ্ড ঘটাবে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এর ফলে আরও বেশী ঘৃণা জন্মাবে সাধারণ মানুষের মনে। এই ঘৃণাকে জয় করার আর কোন পথ নেই ; তাই আজই হোক আর কালই হোক, এহিয়াকে ফিরে যেতে হবে। তবে যখন এহিয়া ফিরবে তখন শ্মশানে পরিণত করে দিয়েই যাবে।

তা তো দেখতে পাচ্ছি। ঢাকা শহরে এক রাতে পঞ্চাশ হাজারের ওপর নিরস্ত্র মানুষকে গুলী করে মেরেছে। এতে ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে, শ্রদ্ধা জন্মায় নি।

বললাম, সরকার চলে বিশ্বাসের ওপর। বিশ্বাস যখন থাকে না, সাধারণ মানুষের নিকট তখন সরকারের নৈতিক মৃত্যু ঘটে। সেই মৃত্যু ঘটেছে এহিয়া সরকারের। অসামরিক শাসন-ব্যবস্থা চালু করার নানা চেষ্টা করবে কিন্তু তাতে কোন ফল হবে না। যারা এহিয়া সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে, তারা মৃত্যুকে সামনে নিয়ে চলতে বাধ্য হবে। অর্থাৎ শাসন-ব্যবস্থা পঙ্গু হবে ও হয়েছে। যাকে বলে civil administration তা যদি না থাকে, তাহলে কলকারখানায় উৎপাদন বন্ধ হবে, বেকার বৃদ্ধি পাবে, চাষের জমি পতিত থাকবে; সেই সঙ্গে প্রতিরোধ চলতে থাকবে। অর্থাৎ কোন মতেই কোন শাসন-ব্যবস্থা কায়েম হবে না। যারা এহিয়াকে সাহায্য করবে, বাঙ্গালী স্বাতন্ত্র্যকামী প্রত্যেকের কাছেই তারা শত্রু বলেই গণ্য হবে।

হানিফ মাস্টার বলল, সামনে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। এখানে রাত কাটালে কেমন হয়?

বললাম, মন্দ কি। আপনার জানাশোনা আছে কি?

তা আছে। চলুন মাঠ পেরিয়ে গ্রামের দিকে। তারপর বলুন আমাদের কি হতে পারে।

আপনাদের কি হবে জানি না, তবে এহিয়ার সবচেয়ে বড় বিপদ হল অর্থনৈতিক বিপদ। ভাঁড়ারে টান ধরবে। যুদ্ধ চালাতে ব্যয় করতে হবে। অথচ আয়ের পথ বন্ধ। পূর্ব-বাঙলার পাট থেকে যে আয় তা বন্ধ, ট্যাক্স-খাজনা বন্ধ, বিদেশীরা এই ডামাডোল দেখে ঋণও দেবে না। বাঙলা দেশের নতুন সরকার এহিয়ার ঋণের দায়িত্ব নেবে না। জাহাজ বোঝাই অস্ত্র আসবে, সৈন্য আসবে, কিন্তু ফিরতি জাহাজে মাল যাবে না। ফলে অর্থনৈতিক সঙ্কট অনিবার্য।

সেইজন্যই আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখসাহেব বলেছেন, ওদের ভাতে মারব, পানিতে মারব।

শত্রুকে একদিক থেকে আক্রমণ করলে তার পতন হয় না। চারিদিক থেকে আক্রমণ করতে হয়।

হানিফ মাস্টার বলল, আমাদের টাকায় কেনা বন্দুক দিয়ে আমাদের হত্যা করছে। আমরা জানি এই ঘটনা ঘটাবে। সেজন্য মুদ্রাব্যবস্থা আমাদের হাতে রাখতে চেয়েছিলাম। আমাদের চতুর্থ দাবি ছিল, "কর স্থাপন এবং অর্থ আদায় করার ক্ষমতা প্রদেশ-গুলোকে দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে তার কার্য-পরিচালনার জন্য প্রদেশসমূহ প্রয়োজনীয় অর্থ দেবে।" ওরা তা স্বীকার করে না। বাঙলার পয়সায় বাদশাহী করা চলবে না, তা বুঝতে পেরেই ওরা বাদ-প্রতিবাদ করেছে।

হানিফ আবার বলল, ঘটনা কিন্তু অন্য রকম। আমাদের নেতা বলেছেন, "আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমী স্বার্থের কালোবাজারী ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশি চমকিয়া উঠিয়াছে। তারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরূপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাতে যে একেবারে খয়রাতি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে! খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশ রক্ষা করিবেন কেমনে? পররাষ্ট্রনীতিই বা চালাইবেন কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার তো অনাহারে মারা যাইবে। অতএব এটা নিশ্চয়ই পাকিস্থান ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র।"

কায়েমী স্বার্থ যাদের, তারা এই ধরনের কথাই বলে এবং বলছে। এর একমাত্র কারণ, ব্যক্তিস্বার্থ ও শ্রেণীস্বার্থ। সে স্বার্থ হল পূর্ববঙ্গের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লুণ্ঠন করার অধিকার।

শেখ মুজিবর বলেছেন, "ক্যাবিনেট মিশনের যে প্ল্যান বৃটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতেও সমস্ত ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল, কেন্দ্রকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই।

দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফেডারেশান সোভিয়েত ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী অথবা অর্থদপ্তর বলিয়া কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই। তাহাতে কি অর্থাভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? তাহার দেশরক্ষা-বাহিনী, পররাষ্ট্র দপ্তর কি সেজন্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে? পড়ে নাই।"

তবুও পশ্চিম পাকিস্থানীরা যুক্তি এবং আইনকে শ্রদ্ধা করে না। যে পূর্ববঙ্গ থেকে পাকিস্থানের সর্বাধিক অর্থ সংগ্রহ হয়, সেই পূর্ববঙ্গকে পঙ্গু করার এই যে নারকীয় ঘটনা, তার পরিণাম কি হবে বলতে পারেন? আমরা জয়লাভ করতে পারব তো?

প্রশ্নটা খুবই কঠিন, মাস্টারসাহেব। এক কথায় এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কয়েকটি অবস্থার ওপর এটা নির্ভর করছে। আপনি এগিয়ে যান, আমরা এখানে বসি। যদি আশ্রয় না পাওয়া যায়, তাহলে আমরা এখানেই থাকব মনে করেছি।

হানিফ মাস্টার গ্রামের মধ্যে এগিয়ে গেল।

আমরা খোলা মাঠে একটা আমগাছের তলায় বসলাম। সামনে দেখা যাচ্ছে খোলা মাঠ। আকাশে ভাঙ্গা মেঘ। বাতাস মিঠে। জ্যোৎস্না বেশ মিষ্টি। বহুদূরে অন্ধকারে আরেকটি গ্রাম দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও একটি আলোও দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে নিকটবর্তী গ্রাম থেকে কুকুরের ডাক ভেসে আসছে। শেয়ালের ডাক শোনা যায়নি সন্ধ্যা থেকে। হঠাৎ গাছের মাথায় ডেকে উঠল এক-জোড়া প্যাঁচা। ওপরের দিকে প্যাঁচাকে দেখবার চেষ্টা করছিলাম, এমন সময় হানিফ মাস্টার ফিরে এসে বলল, আমার খালাতো ভাইয়ের শ্বশুরবাড়িতে থাকার জায়গা পেয়েছি। কিন্তু সব বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করে সবাই শুয়ে পড়েছে, রাতে চাট্টি মুড়ি বিনা আর কিছুই পাওয়া যাবে না।

অমল ত্বরিতে বলল, খাবারের দরকার হবে না। আমরা শহর

থেকে কিছু পাঁউরুটি এনেছি। পাঁউরুটি আর চিনি-ই যথেষ্ট, জল হলেই চলবে।

আগে চলুন সেখানে। তারপর বিবেচনা করা যাবে।

হানিফ মাস্টারের পেছন পেছন গ্রামের ভেতর ঢুকলাম। অনেক দালানবাড়ি দেখে বুঝলাম গ্রামে অবস্থাপন্ন লোকের অভাব নেই। অনেকটা পথ হেঁটে হানিফ মাস্টারের কুটুম ওলিমামুদের বাড়ি পৌঁছলাম।

পাকা বাড়ির মালিক ওলিমামুদ। বৈঠকখানা ঘরে লণ্ঠন জ্বালিয়ে আমাদের অপেক্ষায় বসে ছিল। বৈঠকখানায় দু'খানা চৌকি পাতা। তার ওপর পাটি পেতে মশারীর ব্যবস্থা করেই রেখেছিল। আমাদের দেখে হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল।

বেশ কুণ্ঠিতভাবে বলল, অনেক রাতে এসেছেন। কি করে যে খেদমত করব!

আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, এই তো সবে দশটা।

আপনাদের ইণ্ডিয়া টাইম। এখানকার টাইমে সাড়ে দশটা। গ্রামে সাড়ে দশটা অনেক রাত। আপনারা শহরের মানুষ, কলকাতার লোক, আপনাদের কথাই আলাদা।

আমরা ভাল হয়ে বসলাম।

অমল জিজ্ঞেস করল, আপনি তো গ্রামেই থাকেন?

ওলিমামুদ বলল, তা থাকি, আবার থাকিও না। মাঝে মাঝেই মাল আনতে যশোরে যেতে হয়, কখনও খুলনায়।

ব্যবসা করেন বুঝি?

না। আবার ব্যবসাও করি। আমি ডাক্তার। গাঁয়ের ডাক্তার। তাই ওষুধপত্র ঘরে না রাখলে রুগীর চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না, তাই কিছু-কিছু ওষুধপত্র বিক্রির ব্যবসা করতে হয়। আগে সব পারতাম। এখন বয়েস হয়েছে, মেহনত করতে পারি না।

অবিনাশ আমার কানে কানে ফিসফিস করে বলল, হাতুড়ে।

গ্রামের হাতুড়ে যদিও হয়, তবুও এরা সমাজসেবায় অকুণ্ঠ। বিদ্যা কম, আগ্রহ বেশি। সেজন্য আমার হাতুড়ে সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রেজুডিস নেই। সন্দেহ মেটাতে বললাম, আপনি ঢাকা থেকে পাশ করেছেন বুঝি ?

আজ্ঞে না। তখন ঢাকাতেও মিটফোর্ডে পড়তে যেত অনেকে, কিন্তু আমি ক্যাম্বেলে পড়েছিলাম। তখনকার কলকাতা ছিল আমাদের কাছে একটা স্বপ্ন, সেই স্বপ্নের রাজ্য থেকে যেদিন চলে আসতে হল, সেদিনের কথা আজও ভুলব না। তবে তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলাম, তাই কটা বছর দুটো দানাপানি জুটছে। দেরি করলে কি হত তা জানি না।

ওলিমামুদ পুরানো দিনের কলকাতার গল্প শুরু করতেই বললাম, আপনি যে দিনের কথা বলছেন তার অনেক আগেই আমি কলকাতায় এসেছিলাম।

ওলিমামুদ বলল, সব তো আপনার জানা নেই! পার্ক সার্কাসের মানুষের জীবনের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় কতটা, তাও তো জানি না। তখন আমি ছিলাম মুসলীম লীগের বড় সমর্থক। ছাত্ররা সবসময় আবেগে ছোটে, তা তো জানে । আমরাও আবেগে ছুটেছিলাম। তার ফল এখন ভোগ করছি।

পৃথিবী পরিবর্তনশীল, ডাক্তার সাহেব। আজ আমরা যে অবস্থার সম্মুখীন তাতে একটি জিনিস স্পষ্ট, সেটি হল সারা দুনিয়ায় নির্যাতিত মানুষ নির্যাতনকারীদের আর সহ্য করতে চায় না।

ঠিক বলেছেন, মিঞাসাহেব। খোদার রাজ্যে সবার সমান অধিকার। সেই অধিকার থেকে যে বঞ্চিত করে, তাকে মানুষ আর ক্ষমা করবে না। ইসলাম হল সাম্যের ধর্ম, শান্তির ধর্ম ; কিন্তু তাকিয়ে দেখুন, যত ইসলামী রাজ্য আছে তাতে কোন সময়ই শান্তি নেই। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের শরবত পান করে মাতাল হয়েছে, তাই শান্তি আর আসছে না। নইলে সাহেব, পাকিস্থানী

হানাদাররা যেভাবে অত্যাচার করছে, নরহত্যা করছে, তা কি কখনও সম্ভব হত! এদিক থেকে আপনাদের ভারতবর্ষ অনেক অনেক ভাল। সেখানে বিচার আছে, গণতন্ত্র আছে, মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে।

বললাম, কথাটা ঠিক নয় ডাক্তার সাহেব, যে বিবি নিয়ে আমরা ঘর করি, তার রূপ ও গুণের ওপর অনেক সময় অশ্রদ্ধা জন্মায়, তাই পরের বিবিকে সুন্দরী ও গুণবতী মনে হয়। আপনারা আপনাদের জ্বালায় জ্বলছেন, আমরা জ্বলছি আমাদের জ্বালা নিয়ে। কোথাও শান্তি নেই।

ঠিক বুঝলাম না আপনার কথা। আমরা তো চোখের সামনে দেখছি আপনাদের নির্বাচন হচ্ছে, সরকার গঠন হচ্ছে, দেশের লোক নিজেদের ভাগ্য স্থির করার অধিকার পেয়েছে। আর আমাদের কথা ঠিক উল্টো। আমরা যখনই আমাদের দাবি জানিয়েছি, তখনই 'খান'-রা বন্দুক উঁচু করে এসেছে। আয়ুবের রাজত্বকালে যা হয়েছে, তা বলে শেষ করা যায় না। দেশের লোক গোলমাল আরম্ভ করতেই আয়ুবকে হটিয়ে এহিয়া এল। কেউ কেউ ভাবল, এহিয়া আমাদের দাবি মেনে নেবে। বিসমিল্লায় গলদ, মিঞাসাহেব। গদিতে বসেই এহিয়া হুঙ্কার দিল, 'মার্শাল ল'। অর্থাৎ closed door operation যেমন আয়ুব চালাচ্ছিল, তেমনি চলবে। তবুও এহিয়া বলেছিল নির্বাচন হবে। জনসাধারণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা দেওয়া হবে। হল নির্বাচন, কিন্তু জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দেবার বদলে জনপ্রতিনিধিদের পাইকারী হারে হত্যা করল।

বললাম, এহিয়া খুব ধূর্ত লোক, কিন্তু একটা ভুল করেছিল। সে ভুল করা উচিত হয়নি। চুয়ান্ন সালের নির্বাচনের ফল দেখেই স্থির করা উচিত ছিল বাঙলাদেশে শয়তানের রাজত্ব বাঙ্গালীরা চলতে দেবে না। এহিয়া মনে করেনি আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের বিরাট

সাফল্য হবে। ছয় দফার গুঁতোয় খানদের অস্থির করে তুলবে বলেই বাঙ্গালীরা একজোট হয়েছে, এটা কোন রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে না-জানাটা ঘোরতর অযোগ্যতা। যখন দেখল ছয়দফা দাবির জোরেই আওয়ামী লীগ জিতেছে, তখন বেসামাল হয়ে পড়ল। তারই প্রতিক্রিয়াতে এই নারকীয় ঘটনা ঘটাচ্ছে।

ওলিমামুদ বলল, আমাদের এই দেশ থেকে বহু মাল চালান যাচ্ছে বিদেশে। টাকাটা যাচ্ছে করাচীর কোষাগারে। আমরা দাবি করেছিলাম, পৃথক্ হিসাব রাখতে হবে। পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিম পাকিস্থানের পৃথক্ হিসাব রাখতে হবে বৈদেশিক বাণিজ্যের। আমরা কেন্দ্রকে তার প্রাপ্য দেব। সেই প্রাপ্য স্থির হবে আমাদের সংবিধানে। ওরা রাজী হল না। ভবি ভোলে না, জনাব। ওদের loaves and butter মার যাবে, তাইতে তো ক্ষেপে গেছে। কিন্তু কেন এই দাবি আমরা করেছি জানেন? আমাদের নেতা মুজিব সাহেব বলেছেন, "পূর্ব-পাকিস্থানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকিস্থানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে ও হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্থানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে।" এবার বিচার করুন, কত বড় শঠ ঐ খানের দল।

বললাম, ওরা তো প্রথমাবধি বাঙলাদেশকে শোষণ করছে। আপনাদের এটা জানতে এত বিলম্ব হল কেন?

ঠিক বলেছেন। কিন্তু আমাদের যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ছিল, দেশবিভাগের সময় তারা ছিল লীগের দালাল, হিন্দু-বিদ্বেষ ছড়িয়ে খানদের পা-চাটা কুকুর ছিল ওরা। তারপর বিগত বিশ বছরে চিন্তাধারা বদলেছে, তখন এই অন্যায়গুলো দেশের লোকের চোখের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। আমাদের নেতা কি বলেছেন শুনুন: "পূর্ব-পাকিস্থানে মূলধন গড়িয়া না উঠায় পূর্ব-পাকিস্থানের অর্জিত অর্থে বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব-পাকিস্থানের নাই—এই

অজুহাতে পূর্ব-পাকিস্থানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্থানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব-পাকিস্থান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।. পূর্ব-পাকিস্থান যে পরিমাণে আয় করে, সেই পরিমাণে ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব-পাকিস্থান যে পরিমাণ রপ্তানি করে, আমদানি করে সাধারণতঃ তার অর্ধেকের কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব-পাকিস্থানে ইন্‌ফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মত লাগিয়াই আছে। তাহার ফলে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশী। বিদেশ হইতে আমদানি করা একই জিনিসের, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানী দামের তুলনা করিলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারে থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা।” আমরা চাল কিনি চল্লিশ টাকা মণ, আর পশ্চিম পাকিস্থানে চালের মণ পঁচিশ টাকা। এইবার হিসাব করে দেখুন, সত্যিই ওরা কিভাবে অত্যাচার করছে। টাকা আমাদের, অথচ আমরা খেতে পাই না। এদিক থেকে ভারতের মানুষ অনেক সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে।

আমি হাসলাম। ঘুমে চোখ ভেঙ্গে আসছিল, বললাম, কাল সকালে এসব আলোচনা করব, ডাক্তার সাহেব।

ডাক্তার সাহেবের মুড়ি, চা আর বেগুনভত্তা খেয়ে শুয়ে পড়লাম। শোবার সময় ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞেস করল, আপনারা এখন কোথায় যাবেন ?

জানি না। কোনই ঠিক নেই। হানিফ সাহেব যেখানে নিয়ে যাবেন, সেখানেই যাব। তবে আপাততঃ আমাদের লক্ষ্যস্থল কুষ্টিয়া।

সে তো অনেক দূরে। হেঁটে যেতে হবে। গাড়ি তো বন্ধ। সামনেই আলমডাঙ্গা। সেখান থেকে সহজ রাস্তা আছে; তবে আজকাল পাকা রাস্তা মোটেই নিরাপদ নয়। আমরা নিরাপদে থাকতে পারব কি না জানি না।

সকালবেলায় ডাক্তার ওলিমামুদের ডাকে ঘুম ভাঙ্গল। উঠেই দেখি, তার ভৃত্য মুখ ধোবার জল নিয়ে প্রস্তুত। অতি বিনীতভাবে ওলিমামুদ বলল, মুখে-চোখে একটু পানি দিয়ে নিন। কাল সারা রাত উপোস গেছে, একটু চা-নাস্তা করে নিন। আবার তো পথ চলতে হবে। পেটে কিছু না থাকলে চলবেন কি করে ?

পরোটা ডিমভাজা আলুভাজা আর চা খেয়ে মনে হল না নাস্তা খেলাম, বেশ পেটভর্তি খাওয়াই হল। খাবার সময় ওলি-মামুদ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, আমরা হলাম ন'দে জেলার মানুষ। তখনকার দিনে ন'দে বলতে আমাদের বুকটা ফুলে উঠত। রাজা কেষ্টচন্দর, ভারতচন্দর, লালন ফকির, গোপাল ভাঁড় আর আপনাদের মহাপ্রভু সবাইয়ের দেশ হল এই ন'দে। এখন আর সে ন'দে নেই, জনাব। এখন কুষ্টে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওলিমামুদ।

আবার বলল, এই যে চোডাঙ্গা, এটা তো মহকুমা ছিল না আগে। মহকুমা ছিল দামুরহুদায়। আঠার শ' পঁয়ষট্টি সালে রেল লাইন বসল। দামুরহুদায় যাতায়াতের অসুবিধা, দেশের লোক বলল, চোডাঙ্গায় মহকুমা হোক। ইংরেজ তাই করলে। আর এই চোডাঙ্গা আর দামুরহুদা হল নীল-বিদ্রোহের ঘাঁটি। এখানকার চাষীরাই সবার পয়লা নীল বুনতে চাইলো না। নীলকর সাহেবদের সঙ্গে কাজিয়া লড়াই যা কিছু হয়েছে, তা এই চোডাঙ্গা মহকুমায়। দীনবন্ধুবাবুর নীলদর্পণের যা-কিছু মালমশলা এই চোডাঙ্গায়। এই সোনার দেশটা সাহেবরা ছারখার করেছিল, বাকিটুকু ছারখার করল খানরা।

হানিফ মাস্টার খাওয়া শেষ করে রুমালে হাত মুছতে মুছতে বলল, আমরা যাব আলমডাঙ্গা হয়ে কুষ্টিয়া।

কোন্ পথে যাবে হানিফ ?

এই সামনে গাঙ্গুনি। গাঙ্গুনি থেকে সোজা কাঁচা সড়কে আলমডাঙ্গা। তারপর রেলপথ ধরব।

তাহলে ঠিকই যাবে। গাঙ্গুনি গেলে বিমল ভট্‌চাজ আছে, তার সঙ্গে দেখা কোরো। সে-ই লোক দেবে। আমার কথা তাকে বললে খুশী হয়েই তোমাদের সাহায্য করবে।

আমি অত চিন্তা করি না, চাচা। রাস্তাঘাট চিনে ফেলেছি যশোর ছেড়ে আসতে। কাঁচা রাস্তা ধরে কিভাবে যে জীবনপুরে এসেছি, তা এক খোদাতালাই জানেন। এবার ভয় কমেছে। চলতে পারব ঠিকই।

দু' ঘণ্টার মধ্যেই গাঙ্গুনি এসে গেলাম।

মেহেরপুর মহকুমার থানা। বোধহয় পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে অনাদৃত স্থান। যা দু' চারখানা দোকান-পাট আছে, তারই মাথায় বাঙলাদেশের পতাকা উড়ছে। সামনে থানা। থানার সামনে ট্রেন্‌চ কাটা। ট্রেন্‌চের সামনে দুজন রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে, ট্রেন্‌চের ভেতরে দুজন রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

অমল বলল, ছবি তুলব ?

বললাম, না। ওদের হুকুম না নিয়ে ছবি তুলো না। আমাদের সন্দেহ করতেও তো পারে।

থানা পাশ কাটিয়ে বিমলবাবুর বাড়ির খোঁজ পেলাম।

ডাকাডাকি করতেই একজন মধ্যবয়সী লোক বেরিয়ে এলেন। পরণে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, গায়ের রঙ বেশ পরিষ্কার। চোখ দুটো ভাসা-ভাসা।

হানিফ মাস্টার পরিচয় দিয়ে, আসার উদ্দেশ্য বলতেই বসতে দিলেন তাঁর বাইরের ঘরের বেঞ্চে।

আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা কোথা থেকে আসছেন ?

কলকাতা থেকে।

গম্ভীরভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, কি নাম ?

নাম বলতেই চমকে উঠলেন। বললেন, আমি তো মনে করেছি—

বললাম, আমরাও আপনাকে তাই মনে করেছিলাম।

উভয়পক্ষ একচোট হেসে নিলাম।

তা কেমন আছেন এখানে ?

মন্দ কি। ভালই আছি। তবে কতদিন ভাল থাকতে পারব তা বলতে পারছি না। শুনছি 'খান'-রা নদী পেরিয়ে এদিকে আসার চেষ্টা করছে। আর নাকি আওয়ামী লীগের লোক ও হিন্দুদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে। তা একটু জলটল খেয়ে নিন। আলমডাঙ্গা যাবেন শুনলাম। সেখানে যেতে যেতে তো রাত হয়ে যাবে। আজকাল আবার ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। কে জানে কখন পৌঁছাবেন।

বিমলবাবু গেলেন বাড়ির ভেতর।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন।

আপনারা সপরিবারে বাস করেন বুঝি ?

সপরিবারে বললে ভুল হবে। আমরা চার ভাই। তিনজনই থাকে ভারতে। আমি আমার স্ত্রী আর দুটি শিশুসন্তান নিয়ে থাকি এখানে। আমার ছেলে-মেয়েরা যারা বড় হয়েছে, তারা ভাইদের কাছে থাকে।

আপনি ভারতবর্ষে যাননি কেন ?

মায়া। পৈতৃক বাড়িঘর ছেড়ে যেতে পারছি না। মাটির যে কি মায়া, তা আপনাকে বলে বুঝাতে পারব না। তবে নিশ্চিন্তে বাস করি না সেটাও ঠিক।

এখন তো কোন হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নেই।

নেই কয়েক মাস যাবৎ। আগে ছিল। তবুও মনে হয় মুসলমানরা আমাদের বিশ্বাস করে না।

হানিফ বাধা দিয়ে বলল, এটা ঠিক নয় বিমলবাবু। হিন্দুদের আমরা যারা আওয়ামী লীগের লোক, তারা কখনও অবিশ্বাস করি না। আমরা দ্বিজাতিতত্ত্বের সমর্থকও নই। যারা বাঙ্গালী, তাদেরই আমরা আপনজন মনে করি। অবিশ্বাস আমরা মুসলীম লীগকেও করি। মুসলীম লীগের প্রত্যেকটি লোককে আমরা বেইমান মনে করি।

বিমলবাবু তর্কাতর্কি না করে বললেন, আপনারা বিশ্বাস করেন ঠিকই, কিন্তু মুসলীম লীগ, জামাতি—এরা আমাদের মোটেই বিশ্বাস করে না। এদের সমর্থক তো কিছু আছে দেশে। এরা উস্কানি দিচ্ছে।

হানিফ বলল, তা তো দেবেই। এখানে একটা অশান্তি সৃষ্টি করতে পারলেই তো ওদের লাভ। আজ আমরা যৌথভাবে যে লড়াই করছি, তা ভেঙ্গে দিতে ওরা কম চেষ্টা করছে নাকি! কিন্তু বিমলবাবু, খানদের বন্দুক থেকে যে গুলী বের হচ্ছে, সেই গুলী কিন্তু সবাইকে অবিশ্বাস করে। হিন্দুকেও মারছে, আওয়ামী লীগের লোককেও মারছে, আর মুসলীম লীগের দু' দশ হাজার যে মরেনি এ কথাও জোর দিয়ে কেউ বলতে পারবে না। তবে যারা বেঁচে আছে, তারা আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবেই। আজ আমাদের অসহায় অবস্থা কেন? আমাদের রক্ষা করার মত কেউ নেই। "দেশরক্ষা ব্যাপারে পূর্ব-পাকিস্থানের স্বনির্ভরতা আনতে হবে।"—এই তো ছিল আমাদের ষষ্ঠ দাবি। আমাদের এখানে অস্ত্র উৎপাদনের কারখানা করতে হবে, নৌ-দপ্তরকে পূর্ববঙ্গে স্থাপন করতে হবে, এই দাবি খানরা মানতে রাজী নয়। খানরা বলছে, এই ব্যবস্থা করার অর্থ পাকিস্থানের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করা। তারা বলছে, পূর্ববঙ্গকে রক্ষার ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্থানে আছে, অথচ মাত্র সতর দিন পাক-ভারত সংঘর্ষের সময় আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, পূর্ববঙ্গকে রক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই। ভারত যদি

দয়া না করত তাহলে পূর্ববঙ্গকে যে-কোন সময় দখল করে নিতে পারত। বর্তমানে যে ব্যবস্থা আছে, তাতে আমরা মনে করছি আমাদের সব সময়ই শত্রুর দয়া ও মর্জির ওপর নির্ভর করতে হবে। এই ব্যবস্থার অবসান না হলে আমাদের কে রক্ষা করবে! রক্ষা-ব্যবস্থা নেই বলেই আজ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নানাভাবে লুণ্ঠন করছে পূর্ববঙ্গকে। আপনাকে আমরা অবিশ্বাস করি না—এটা বড় কথা নয়; বড় কথা হল, পশ্চিম পাকিস্থানীরা বাঙলাদেশের বাঙলা-ভাষাভাষী কাউকে বিশ্বাস করে না।

বিমলবাবু পরে আমাকে চুপি চুপি বলেছিলেন, আপনার সঙ্গী ঐ ভদ্রলোকের কথা মোটেই বিশ্বাস করবেন না।

কেন?

এই লড়াইতে নেমে ওরা দেখছে, একমাত্র ভারতবর্ষ ভিন্ন তাদের বিপদে কেউ কোন সাহায্য করছে না। সেজন্য আজ ওরা হিন্দু বলতে গদগদ। অবশ্য আওয়ামী লীগ যতই শক্তিশালী হয়েছে ততই হিন্দু-বিদ্বেষ কমেছে; তবুও তো জানেন, গত নির্বাচনের আগে দু' লক্ষ হিন্দু পাকিস্থান ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে গেছে। শেখ সাহেব বার বার অনুরোধ করেছেন যাতে হিন্দুরা চলে না যায়, আওয়ামী লীগের কর্মীরাও চেষ্টা করেছেন; কিন্তু যাদের হাতে ক্ষমতা, তারা যে-সব পাপীদের প্রশ্রয় দিয়ে হিন্দু-বিদ্বেষ জিইয়ে রেখেছে, তারাই হিন্দু তাড়িয়েছে। হিন্দুরা চলে গেলে আওয়ামী লীগ দুর্বল হবে। কিছু পারসেন্ট সলিড ভোট তো হিন্দুরা দেবে। আর হিন্দুদের সব ভোটই পেয়েছে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি। মুসলীম লীগ, জামাতের দল এই জ্বালা ভুলতে পারবে কি সহজে? তাই হিন্দুর মরণ সব দিক থেকে। মুসলমানকে সমর্থন করলেও মরণ, বিপক্ষে গেলেও মরণ।

কোন জবাব দিতে পারিনি। যখন রওনা হলাম তখন আকাশে মেঘ জমেছে। ঝড়ো হাওয়া বইছে। আশঙ্কা ছিল

রাস্তাতেই ঝড়-বৃষ্টির শিকার হতে হবে। হলও তাই। মাথাভাঙ্গা নদীর একটা সোতার ধারে এসেই উঠল প্রচণ্ড ঝড়। নামল বৃষ্টি। আমরা দৌড়ে ফেরিঘাটের কিনারায় ছোট্ট গ্রামের একটা খড়ের চালার নীচে আশ্রয় নিলাম।

চারজনেই মাটিতে চেপে বসলাম।

হানিফ মাস্টার হঠাৎ বলে উঠল, বিমলবাবুর কথা তো শুনলেন।

মাথা নাড়লাম।

কথাটা একেবারে বেঠিক নয়। এক সময় মুসলমানরা হিন্দুকে মোটেই বিশ্বাস করত না। এখন আর সেদিন নেই। তবে সব দেশেই শয়তান থাকে, এদেশেও আছে। এইসব শয়তানেরা নিশ্চয়ই মনে মনে হিন্দু-বিদ্বেষ পোষণ করে। কিন্তু কেন ?

খুব নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, কোন পক্ষই দায়ী নয়। পশ্চিমী শিক্ষা থেকে মুসলমানরা পিছিয়ে ছিল। হিন্দুরা শিক্ষা-দীক্ষায় যেমন এগিয়ে গেল, তেমনি তারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অগ্রসর হল। যখন ত্ব'চার দশজন মুসলমানের চোখ ফুটল, যখন বুঝল গোঁড়ামি তাদের সর্বনাশ করেছে, তখন তারা নামল অসম প্রতিযোগিতায়। কিন্তু এই অসম প্রতিযোগিতায় হিন্দুকে হটিয়ে মুসলমানরা স্থান করবে, এ তো সম্ভব নয়। সেজন্য শ্রেণী-বৈষম্য স্বাভাবিকভাবে তাদের মনে স্থান করে নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ইংরেজরা এই বৈষম্যকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টির কাজে অত্যন্ত চতুর ও সফলভাবে ব্যবহার করেছিল। হিন্দু ও মুসলমান তুই সম্প্রদায়কেই বাঁদর-নাচ নাচিয়ে ইংরেজ তার রাজ্য কায়েম রেখেছিল। সাধারণ হিন্দু-মুসলমান কিন্তু কোন সময়ই সাম্প্রদায়িকতা চায়নি। যদি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে নেতৃত্ব দেবার লোক থাকত, তাহলে এই বৈষম্য কোনক্রমেই সাম্প্রদায়িক-

রূপ গ্রহণ করতে পারত না। (কিন্তু হিন্দু কায়েমী স্বার্থ এবং মুসলমান কায়েমী স্বার্থকে উস্কানি দিল ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ) তাই প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে লড়াই করার কোন চেষ্টাই হয়নি। যার ফলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ।)

পাকিস্থান সৃষ্টিকে আপনারা স্বীকার করেননি। কিন্তু পাকিস্থান সৃষ্টি না হলে ভারতের বুকে অসম সম্পদ বণ্টনের জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সব সময় হত। যদি তা না হত, তাহলে নিশ্চয়ই কম্যুনিজম্ এসে জায়গা করত। যা-ই পরিণতি হোক, পাকিস্থান সৃষ্টির পর বাঙলার মুসলমানরা দেখল, হিন্দু প্রতিযোগী আর নেই, অসম বণ্টন যা কিছু তা তাদের নিজেদের মধ্যে। লড়াই করতে হলে নিজেদের মধ্যেই লড়াই করতে হবে। হিন্দু প্রতিযোগী থাকলে আজ বাঙলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারত না। যেমন আপনারা পারছেন না।

আমাদের হিসাবে সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত মুসলমানের শিক্ষিত সংখ্যা ছিল নগণ্য। পাকিস্থান সৃষ্টি হবার পর মুসলমানের ছেলেরা শিক্ষায় উৎসাহী হয়েছে। গত বৎসর পূর্ব বাঙলায় দু' লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে। ইংরেজ রাজত্বকালে গোটা বাঙলাদেশে পঞ্চাশ হাজার মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেছিল কিনা সন্দেহ।

শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানরা পূর্ববঙ্গে ধীরে ধীরে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক বনিয়াদ কিছুটা শক্ত করেছে ; এর ফলে হিন্দুদের সঙ্গে তুলনা করে অতীতে যে মানসিক অশান্তি ভোগ করেছে, সেই মানসিক অশান্তি তারা ভোগ করে না। তারা হিন্দুদের চেয়ে কোনক্রমেই ছোট নয়, সে জ্ঞান তাদের জন্মেছে। তাদের শত্রু হিন্দুরা নয়। যেখানে ছিল ধর্মের জিগীর, সেটা ক্রমেই অর্থনৈতিক দিকে মোড় নিয়েছে। বাঙলার মানুষ বুঝতে শিখেছে—হিন্দুরা যেভাবে তাদের বঞ্চনা করেছে,

ইংরেজ তাদের যেভাবে শোষণ করেছে, তার চেয়েও ভয়ঙ্করভাবে শোষণ ও শাসন করছে দেড় হাজার মাইল দূরের কতকগুলো কায়েমী স্বার্থের অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। এই শোষক ও শাসক হিন্দু ও ইংরেজের চেয়ে নিকৃষ্ট, ঘৃণ্য ও বর্বর।

ধর্ম ধর্ম করে আর পাগল হয় না বাঙলার মানুষ। হিন্দুদের নানা পরব। সেইসব পরবে মুসলমানরা যোগ দিতে পারত না, আবার সহ্য করতেও পারত না। এখন হিন্দুদের পরব আছে, কিন্তু আগের মত জৌলুস করে লোকের মনে যুগপৎ ভয় ও হিংসা জাগায় না। তাদের ধর্ম-কর্ম সহজ ভাবেই তারা পালন করে, মুসলমানদের ওপর টেক্কা দেবার চেষ্টা কোথাও নেই ; ফলে হিন্দুরা কী ধর্ম-কর্ম করছে সেদিকে মুসলমানদের নজর দেবার দরকারও হয় না। মুসলমানরাও বুঝেছে আল্লার নাম করে মসজিদের পাথরে মাথা কুটলেও পার্থিব কোন লাভ হয় না। আল্লা হৃদয়ের ; সৌভাগ্য যাদের থাকে, তারা যেভাবে আল্লার মহিমা প্রচার করতে নানা ভড়ং করে, তার প্রয়োজন হয় না গরীবদের। আজ বাঙলার শিক্ষিত মুসলমান মাত্রই নানা দেশের নানা গ্রন্থ পড়ে বুঝতে পেরেছে হৃদয়কে প্রসারিত করতে হবে। প্রশস্ত মানসিকতা গড়ে তোলা তাদের বড় কাজ। এর ফলে সাম্প্রদায়িক চেতনা লোপ পেয়ে গেছে। বিমলবাবুর হীনমন্যতা জন্মেছে। এই হীনমন্যতায় এতকাল মুসলমানরা ভুগেছে, এখন হিন্দুরা ভুগছে। তবে তাও সাময়িক ও মাত্র কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আমি বললাম, আপনাদের সবকিছুই আমি স্বীকার করছি ; কিন্তু আন্দোলনের গতিটা যে কি রূপ নেবে, তা এখনও ভেবে ঠিক করতে পারছি না।

হানিফ আবার বলল, আমাদের আন্দোলন জন্ম নিয়েছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চনার মাঝ দিয়ে। আমরা কিন্তু কোন সময়ই স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চাইনি।

আমরা কতকগুলো অধিকার চেয়েছিলাম যা আমাদের সমান অধিকার দেবে, ন্যায্য অধিকার দেবে পশ্চিম পাকিস্থানীদের মত। কিন্তু আমাদের আবেদন-নিবেদনে কোন ফলই হয়নি। ধীরে ধীরে বাঙলার জনমনে জন্মাল পশ্চিম পাকিস্থানীদের প্রতি বিদ্বেষ ; সেই বিদ্বেষ গড়ে তুলল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। সে সংগ্রাম কিন্তু অহিংস ছিল এবং তা ছিল পাকিস্থানের অভ্যন্তরে থেকে দাবি আদায়ের সংগ্রাম। কায়েমী স্বার্থের এজেন্ট সাম্রাজ্যবাদী জালিম জঙ্গীশাহীরা সেই সংগ্রামকে ছিন্নভিন্ন করতে আমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। এর পরিণাম যে কি হবে, তা কেউ বলতে পারছে না।

অবিনাশ বলল, খুব জোর ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। কখন যে থামবে কে জানে।

অমল বলল, হতাশ হবেন না। এই বৃষ্টি আর ঝড় বাঙলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সবচেয়ে বলশালী প্রহরী। যত বৃষ্টি হয়, ততই ভাল। চৈত্র-বৈশাখ মাসে এরকম বৃষ্টি সাধারণতঃ হয় না। এটা বাঙলাদেশের সৌভাগ্যের সূচনা করছে।

হানিফ মাস্টার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, কী নির্মম! যশোর থেকে আবালবৃদ্ধবনিতা যাকে পেয়েছে, তাকে দাঁড় করিয়ে মেরেছে। এ রকম ঘটনা আপনাদের দেশে সম্ভব নয়।

আমি হাসলাম।

হাসছেন কেন ?

আপনি ভাবালু লোক। ভারতেও এই ঘটনা ঘটছে। এখানে যেটা large scale-এ হচ্ছে, ওখানে ওটা হয় miniature scale-এ, উভয় দেশেই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র একই। (ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদীরা মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে, কোরান, গীতা, বাইবেলের বুলি শোনায় অর্থাৎ ওরা কিছুটা polished ; আর এখানে সরাসরি অত্যাচার করে।) যদি কোনদিন ভারতীয়, বিশেষ করে পশ্চিম

বাঙলার কাগজে দেখতে পান, "It is stated that in the morning hours, police went to conduct a raid in some area, when they were subjected to a heavy attack with bombs and pipe gun. The police fired three or four rounds from revolver, causing injuries to two of the miscreants. The wounded people died in a Calcutta hospital"—তখন মনে করতে পারেন, ওটা পাকিস্থানী অত্যাচারের একটা মিনি এডিশ্যন, পাকিস্থানীদের বিবেক জড়ত্ব-লাভ করেছে, ভারতে তা করেনি। হয়ত এইসব ঘটনায় পুলিশ নিজেই বোম ফাটায়, তারপর গুলী করে যুবকদের হত্যা করে। তারপর একটা বিবৃতি। এসব ক্ষেত্রে অনেকে মনে করে, এটাও ঐ পাকিস্থানী সাম্রাজ্যবাদীদের দোসর। পুলিশকে বোম মারল, পাইপ গান থেকে গুলী করল, একজন পুলিশও জখম হল না, পুলিশের গায়ে আঁচড়টি লাগল না, আর অর্জুনের মত স্থির লক্ষ্যভেদী পুলিশ তিনটি গুলী করল, তাও রিভলভার থেকে, তাতে দুজন মারা গেল। এও বিশ্বাস করতে হয়! যারা বোম মেরেছিল, তারা বেশ নিরাপদ দূরত্ব থেকেই মেরেছিল, আর রিভলভারের গুলী যা close range না হলে কখনই লক্ষ্যভেদ করে না, অথবা করতে পারে না, তা দিয়ে গুলী করতেই দুজন পপাত ও মমার। এটা হল মধ্যযুগীয় চরিত্র। আপনারা মনে করেছেন, ভারতের মানুষ খুব সুখে আছে, তা কিন্তু নয়।

হানিফ মাস্টার অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কি ভাবছেন? আর ভেবে কাজ নেই। বৃষ্টি কমেছে। এবার আলমডাঙ্গার পথ ধরি, চলুন। আমরা চাই পাকিস্থানের অত্যাচার থেকে বাঙলার মানুষ মুক্ত হোক, তারা সুখী হোক, ঐশ্বর্যশালী হোক, সেজন্য ভারতের মানুষ সর্বপ্রকারে সাহায্য করছে ও করবে। তবে যুদ্ধজয়ের পর আমরা বলব, আপনাদের রাষ্ট্র-চরিত্র কি?

আমরা আবার পথ ধরলাম।

বৃষ্টিতে মাটি ভিজেছে। কোথাও কোথাও জল জমেছে, কোথাও সামান্য কাদাও হয়েছে। এরকম আর পাঁচ সাতদিন বৃষ্টি হলে হেভী ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী চলতে পারবে না বাঙলা দেশের মাটিতে।

অনেকক্ষণ চলার পর হানিফ মাস্টার বলল, এই যুদ্ধে জয় হবে কি ?

কার ?

আমাদের।

হবে। তবে যুদ্ধের বর্তমান গতি-প্রকৃতি বদল করতে হবে। অবশ্য করতে বাধ্য হবেন আপনারা। আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত সুশিক্ষিত সৈন্যের মুখোমুখী মোকাবিলা করা কঠিন কাজ, এদের পর্যুদস্ত করার মত অস্ত্র আপনাদের নেই। সেজন্য শত্রুর অস্ত্র কাড়তে হবে। তার জন্য গেরিলা-পদ্ধতিতে যুদ্ধ প্রয়োজন। শত্রুকে ঘুমোতে দেওয়া হবে না। ছোট ছোট দলে অতর্কিতে আক্রমণ করতে হবে, তাদের সব সময় ব্যস্ত রাখতে হবে, তবেই সাফল্য আসবে। কিন্তু সময়সাপেক্ষ।

আমরা আশা করেছিলাম এক মাসে বা দেড় মাসে চূড়ান্ত জয় নির্ধারিত হবে।

তা হবে না। ওদের শেষ শক্তি প্রয়োগ করে দেখবে, তারপর যদি উপনিবেশ না রাখতে পারে, তাহলে ওরা চলে যাবে দেশকে শ্মশান করে দিয়ে।

চীন ওদের সপক্ষে। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাই ওদের সব সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু আমাদের কেউই সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে না। চীন সমাজতান্ত্রিক দেশ। তারা সাম্রাজ্যবাদী জঙ্গীবাদকে কেন সাহায্য করবে, এটা ভেবে পাচ্ছি না।

আপনার মত আমরাও গালে হাত দিয়ে ভাবছি। এহিয়ার প্রচার-ব্যবস্থায় চীন আসল অবস্থা বুঝতে পারছে না নিশ্চয়ই। চীন যদি এহিয়াকে সাহায্য করে, তাহলে আপনাদের সাহায্য করতে অনেক চীন-বিরোধী শক্তি এগিয়ে আসবে। তার ফলে বাঙলাদেশ দ্বিতীয় ভিয়েতনামে পরিণত হবে। আপনাদের ভাসানীর মওলানা শুনেছি চীনপন্থী! তিনি চীনকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করুন। তবে চীন এহিয়াকে কতটা সাহায্য করবে তা বলতে পারি না। তবে যদি বাঙলাদেশে জনতার যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহলে ঐ চীন-ই বাঙলাদেশকে সাহায্য করবে। এখন চীন মনে করছে, দুটো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি লড়াই করছে; যদি এহিয়ার মত দুষ্ট সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জয়লাভ করে, তাহলে ভারতকে ঘিরে রাখতে পারবে। ভারত যে রাশিয়া ও আমেরিকার পক্ষপুটে বসে তার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র তুলে ধরেছে, তার অবসান ঘটাতে চায় চীন এইভাবে। প্রত্যক্ষভাবে লড়াই করা চীনের পক্ষে সম্ভব নয়। চীন বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নেবে না। যদি সহজে বাঙলাদেশের সমস্যা না মেটে, তাহলে ভয়ঙ্কর পরিণতি শীগ্‌গিরই দেখা দেবে। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

হানিফ মাস্টার বলল, আমাদের বিশ্বাস ইন্দিরা সরকার প্রগতিশীল। এই তো নির্বাচনে তার সার্বিক জয় তার প্রগতির পরিচয় তুলে ধরেছে। 'গরীবী হটাও'—স্লোগান তো সবাইকে পরাস্ত করেছে।

হেসে বললাম, আর রাজনীতি নয়। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। স্লোগান দেওয়া আর কাজে তা প্রমাণ করা, অনেক কঠিন কাজ। 'গরীবী হটাও' শেষে 'গরীবকো হটাও' না হয়। অত ব্যস্ত আমরা হই না। আমরা জানি, ইন্দিরা জয়লাভ করেছে, কিন্তু এই জয়ই তার ক্ষয় ডেকে আনবে। আবার মেঘে আকাশ ঢেকে ফেলল। নদীর ওপারে তো গ্রাম ছিল, এপারে শুধু জঙ্গল। যাক্, গাছতলায় দাঁড়িয়ে মাথা বাঁচাব।

একটু জোরে পা ফেলুন। মাইল-দেড়েক দূরে গ্রাম আছে। আমার নিকট-আত্মীয় আছে। রাতের বেলায় আশ্রয় পাওয়া যাবে।

খাবার জিনিস কিছু পাওয়া যাবে কি?

না হলে চাল-ডাল যোগাড় করে খিচুড়ি রাঁধব। আপত্তি আছে কি?

আপত্তি! কি যে বলেন। খেতে পেলে বেঁচে যাই। যাই বলুন, পশ্চিম বাঙলার গ্রামে গেলে দু'একটা চায়ের দোকান মেলে, এখানে তাও নেই।

চা খাবে! চা পশ্চিমবঙ্গে একটা খাদ্য, এখানে চাষীদের বিলাস। পয়সা দিয়ে চা খাবার সামর্থ্য ক'জনের আছে? এই স্বাধীন দেশে লক্ষ লক্ষ ক্ষেত-মজুর পাবেন যারা তিন-চারদিন ভাতের মুখ দেখতে পায় না। কেউ শাক সেদ্ধ করে খায়, কেউ ছোলা ভিজিয়ে খায়। তবুও এরা বেঁচে আছে। কি করে যে বেঁচে আছে তা ভাবতেও পারি না আমরা।

সত্যিই কি মানুষ এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে? প্রশ্ন করল অমল।

হানিফ মাস্টার বলল, আমরা সত্যকে সব সময় স্বীকার করি না নিজেদের স্বার্থে। হাজার বার মিথ্যা বলে আমরা তাকে সত্য বলে জাহির করতে চাই, কিন্তু খোদার রাজ্যে হাজার বার মিথ্যা বলার চেয়ে একবার সত্য বলা অনেক বেশি শক্তিশালী। সেই সত্য উদ্ঘাটন করতে যারা পারে, তারা হল দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ।

বললাম, খোদা আর সাম্রাজ্য, এদের একসঙ্গে জুড়ে আপনারা একই ভুল করে আসছেন বরাবর। খোদা কোথায় আছেন, তিনি রহমান কিনা, সেটা বিচার-বিবেচনা অনেকবার হয়েছে; কিন্তু বাস্তব অবস্থা হল একে অপরকে বঞ্চনা করে বাঁচতে চায়, আর সেই চাওয়া মানুষকে ভয়ঙ্কর হিংস্র পশুর অধম করে তোলে। সেদিকে আপনারা চোখ বুঁজে থাকেন কি করে?

হানিফ মাস্টার আমার কথায় গুরুত্ব দিল না। খোদার ওপর বিশ্বাস না রাখতে পারলে যে সত্যকে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়, সে কথা বারবার আমাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেও যখন কিছুতেই আমাকে তার মতে টানতে পারল না, তখন বোধ হয় আমাকে না-পাক কাফের মনে করেই চুপ করে গিয়েছিল।

আলমডাঙ্গা থেকে কুষ্টিয়া কতদূর ?

অনেক দূর, আবার সামান্য দূর। বাস-চলাচল করলে অতি নিকটে, আর পায়ে হাঁটলে অনেক দূর।

উত্তর দিয়েছিল নূর মহম্মদ।

রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা। হানিফ মাস্টারের সঙ্গে তার পরিচয় অনেক দিনের। পাশাপাশি গ্রামের মানুষ। নূর মহম্মদ বন্দুক-বাহিনীর লোক।

সে-ই বলল, যুদ্ধ! হাঁ, যুদ্ধ চলেছে বাঙলা দেশে। লক্ষ লক্ষ মানুষের করুণ আর্তনাদ কানে এসে রূঢ় আঘাত দিচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ নিরাপত্তার আশায় ছুটে পালাচ্ছে ভারতের দিকে। লক্ষ লক্ষ মানুষ মাটি মায়ের কোলে শেষ আশ্রয় নিচ্ছে, ঋণ পরিশোধ করছে জন্মদাত্রীর। তাদের রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠেছে বাঙলাদেশের সবুজ ক্ষেত। স্বজন-পরিজনের এই মৃত্যু নেমে এসেছে অসম যুদ্ধে, শুধু শোনা যাচ্ছে জীবিত ব্যথাতুর স্বজন-পরিজনের করুণ বিলাপ।

আমারও মনে হল, কে যেন কানের কাছে বলছে, মৃত্যু দিয়েই জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

নূর মহম্মদ আমাদের পরিচয় শুনে আমার হাতে হাত মিলিয়ে বলল, জনাবে আলি, ওরা হল জালিম। ওদের কারও মনে দয়ামায়া নেই। নিরস্ত্র নরহত্যায় ওদের আনন্দ। আমাদের অস্ত্র নেই, কিন্তু আমাদের সামান্য অস্ত্রের সামনে ওদের পালাতে হয়েছে। জনরোষ ওদের নির্বংশ করবে। কি অধিকার আছে ওদের এদেশের মাটিতে বসে আমাদের ওপর অত্যাচার করার ? তবুও করছে। বিভ্রান্তি

আমাদের টেনে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে এমন একটি পর্যায়ে যার পরিণতি সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই ছিল না।

নূর মহম্মদের পিঠে এক-নলা বন্দুক। বুকের সঙ্গে গোটাদশেক কার্টিজ দড়ি দিয়ে বাঁধা। হয়ত কার্টিজে কোন বুলেট নেই, হয়ত সবগুলোই ছর্‌রা। এই সামান্য অস্ত্র নিয়ে নূর মহম্মদ আমাদের সঙ্গে চলেছে পথ দেখিয়ে। আমরা কোথায় যাব তাও তাকে বলা হয় নি। হানিফ মাস্টার আমাদের গন্তব্যস্থল নূর মহম্মদকে বলতে নিষেধ করেছিল, শুধু নূর মহম্মদকেই নয়, কাউকেই বলতে নিষেধ করেছিল। নূর মহম্মদ হানিফের সঙ্গী বুঝেই বিশেষ কিছু জানতেও চায় নি। মোটামুটি সে মনে করেছিল আমরাও মুক্তি-সংগ্রামী। আমরা যে নিরস্ত্র তা লক্ষ্য করে বলল, খালি হাতে কোন মুক্তি-সংগ্রামীর পথ চলা উচিত নয়।

বললাম, কোথায় পাব বন্দুক ?

অনেকক্ষণ কি যেন ভেবে নূর মহম্মদ বলল, আচ্ছা, আমি দেখছি। আমরা শহর ও গ্রামের সব বন্দুক সংগ্রহ করেছি। তারই দু'একটা সংগ্রহ করতে পারব নিশ্চয়ই। চলুন পোড়াদহে। আমাদের মুক্তিবাহিনী সারা ব্রিজ পাহারা দিচ্ছে। ওখানে গেলে কিছু অস্ত্র পাওয়া যেতে পারে।

বললাম, সারা ব্রিজ পাহারা কেন দিচ্ছেন ?

দুশমনরা আমাদের ক্ষতি করতে পারে। আর এক মাসের মধ্যেই ওদের দেশ-ছাড়া করব। আমাদের সম্পদ তো আমরা নষ্ট হতে দিতে পারি না। উত্তর আর দক্ষিণ বঙ্গের যোগাযোগ-রক্ষার একটি পথ ঐ ব্রিজ। খানরা আমাদের ক্ষতি করতে নিশ্চয়ই ব্রিজের ক্ষতি করবে। ওরা যাবার আগে আমাদের সবকিছু নষ্ট করে দিয়ে যেতে চেষ্টা করবে।

নূর মহম্মদের চোখেমুখে বিজয়ীর গর্বভরা একটি পরিতৃপ্তির ছাপ। তাকিয়ে দেখছিলাম। দেখতে দেখতে আমারও কেমন

গর্ববোধ জাগছিল মনে। গর্বপরিপ্লুত মনটা হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠল, বলতে চাইলাম, ঠিক। কিন্তু অর্ধজাগ্রত মনটা বলল, না। তাই হাসলাম। বাস্তব আর কল্পনার পার্থক্যটা আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভেসে উঠছিল। তাই তার কথায় না হেসে পারিনি। মন তাকে সমর্থন জানাতে পারল না।

হাসিটা হানিফ মাস্টার লক্ষ্য করে বলল, আপনি হাসছেন!

বললাম, হাসার মত কথা বললে কে না হাসে বলুন।

অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নূর মহম্মদ বলল, হাসি-তামাশার বিষয় মনে করছেন বুঝি!

মাথা নাড়তে নাড়তে গম্ভীরভাবে বললাম, হাঁ। আপনি যা বললেন তা হল আপনার বিশ্বাস। আপনার মত বিশ্বাস নিয়েই বহু আওয়ামী লীগ সদস্যকেও বেশ সোচ্চার হতে দেখেছি। যারা ঘোরতর বাস্তবপন্থী বুদ্ধিজীবী, তারা আপনার ওসব বক্তব্যকে সম্মান করে, কিন্তু বিশ্বাস করতে রাজী হয় না। যারা দুনিয়াতে ভালো মানুষ, তারা সহজেই যা বিশ্বাস করে, যারা দুর্জন তারা তা সহজে বিশ্বাস করে না।

হানিফ মাস্টার সঙ্গে সঙ্গে বলল, আপনারা নিজেদের দুর্জন মনে করেন বুঝি?

অন্ততঃ সরল সুবোধ সুজন যে নই, তা হলফ করে বলতে পারি। সেইজন্যই বলছি, যাকে আপনারা সম্পদ মনে করেন, সেইটাই হবে বিপদ।

ঠিক বুঝলাম না আপনার কথা।

বুঝতে চেষ্টা করুন। একটা কথা শুনেছেন তো, temporary gain is no gain—অর্থাৎ সাময়িক লাভ লাভই নয়। একটা ছোট অশ্লীল কথা দিয়ে উদাহরণ দিচ্ছি। যৌন বিষয়ে কেউ কোনদিন কোন যুগে পরিতৃপ্ত হয়েছে কি? অথচ এই সাময়িক পরিতৃপ্তির জন্যই বহু অঘটন ঘটেছে পৃথিবীতে। একমাত্র স্থায়ী

ফল হল সন্তানলাভ ; যখন পুরুষ ও নারীর স্নেহ-মমতা কেন্দ্রীভূত হয় সন্তানের ওপর, তখনই অপরিতৃপ্তির পরিসমাপ্তি আসে। তেমনি আজ আপনারা যে শহর ও পল্লী নিজেদের কব্জায় রেখেছেন, সেটাও ঐ অপরিতৃপ্তির অংশ ; পরিসমাপ্তি আসবে সেদিন, যেদিন সামরিক বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে পারবেন।

শীগ্‌গিরই তা হবে বলে আশা করছি।

এইটে সবচেয়ে বড় ভুল। এখনও বহু শহর আপনাদের দখলে রয়েছে। এই সুযোগে আপনাদের উচিত চলাচল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু করে দেওয়া। বাঙলার ছেলেরা নদী সাঁতরে, কাদায় হেঁটে যুদ্ধ করতে পারবে। তাদের কাছে রয়েছে লাইট ওয়েপন্। তাই তাদের চলাচলের কোন বিঘ্ন ঘটবে না। কিন্তু পাকিস্থানী খানদের লড়াই করতে হবে হেভি ওয়েপন্ নিয়ে। বাঙলার জলবায়ু ওদের সবচেয়ে বড় শত্রু। উপরন্তু যে দেশ থেকে ওরা এসেছে, সে দেশে নারীমুখ দর্শন ওদের ঘটে না। বাঙলাদেশে এসেই ঐসব জানোয়ারদের প্রথম নজর পড়বে সুরা ও নারীর ওপর। যার ফলে নৈতিক শক্তি ওরা হারাবেই। যদি ওরা চলাচলের পথ পায়, তাহলে শহরগুলো ও পথের ধারের গ্রাম-গুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। সেজন্য সবার আগে ওদের পায়ে হাঁটাতে হবে লাইট ওয়েপন্ নিয়ে। বর্ষা নামলেই ওদের গাড়ী যেমন চলবে না, তেমনি বাঙালীর ছেলেদের পা-গাড়ীতে জোর ধরবে। ওদের আত্মরক্ষাই হবে সমস্যা।

নূর মহম্মদ বলল, তাহলে আমাদেরও তো ক্ষতি হবে। খানরা যখন বিদায় নেবে, তখন আমাদের কিছুই থাকবে না।

কথাটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যোগ্য, বিপ্লবপন্থীদের যোগ্য নয়। সাম্রাজ্যবাদীদের বিশেষ কতকগুলো কৌশল আছে উপনিবেশ শোষণের। তার মধ্যে পথঘাট তৈরী অন্যতম। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের উপনিবেশকে পথঘাট দিয়ে এমনভাবে যুক্ত করে, যাতে

অতি সহজেই সৈন্য-চলাচল করাতে পারে। যদি কোন সময় পদানত শ্রেণী ঘাড় বাঁকা করে, সেই ঘাড় সোজা করে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে। যখন পথ তৈরী করে দেশের অভ্যন্তরে পৌঁছায়, তখন সবাইকে বিড়াল-তপস্বীর মত জানিয়ে দেয়, এইসব পথ হল দেশের সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য। তারা তাদের প্রথম উদ্দেশ্য সৈন্য-চলাচল-ব্যবস্থা কায়েম রাখার কথা মোটেই স্বীকার করে না। সাম্রাজ্যবাদীরা আরও জানে, পল্লীর উৎপাদনে যদি পুঁজিবাদী প্রভাব বিস্তার করা যায়, তাহলে শোষণ কায়েম রাখা সহজ হয়। এই শোষণের ক্ষেত্র তৈরী করতেই এই পথ বাধাহীন করে চলাচলের জন্য। পল্লীর সম্পদ স্বল্পমূল্যে খরিদ ক'রে শহরে আনে। সেই সম্পদ বিক্রি করে মুনাফার পাহাড় গড়ে সাম্রাজ্য-বাদীরা। দুইটি ক্ষেত্রেই পদানত জাতির নৈতিক চরিত্র ভেঙ্গে দিয়ে তাদের দাসজীবনে ঠেলে দেয়। আপনারা যদি এইসব পথঘাটকে সম্পদ মনে করেন বর্তমান অবস্থায়, তাহলে আপনাদের অকালমৃত্যু আপনারাই ডেকে আনবেন। পাকিস্থানী সাম্রাজ্যবাদীরা বাঙলা দেশের পথঘাট পাকা করেছে আপনার আমার উপকার করতে নয়, নিজেদের উপকার করতে। পাকিস্থানীরা বুঝতে পেরেছে তাদের উপনিবেশ হাতছাড়া হবার উপক্রম। এইবার তাদের আসল চেহারা দেখতে পাবেন। সারা ব্রিজ আপনাদের শত্রুতাই করবে, মিত্রতার ছাপ থাকবে না ব্রিজের একটা রেলিং-এ।

নূর মহম্মদ বলল, অত সুযোগ ওদের আমরা দেব না। তার আগেই ওদের খতম করব।

এটাও বাস্তব কথা হল না বন্ধু। আপনাদের বর্তমান যে লড়াই, তা হল স্বাধীনতালাভের লড়াই। এমন লড়াই পুঁজিবাদীরাও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ঘটিয়েছে বিভিন্ন দেশে। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হয়েছে সর্বদেশেই। সেজন্য এই যুদ্ধের গতি-চরিত্র নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত কোনক্রমেই হানাদারদের ভবিষ্যৎ

স্থির করে বলতে পারবেন না। বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক লিবারেশন যুদ্ধ কখন যে কোন্ পক্ষের গলায় মালা দেবে, তা বলা কঠিন। যারা অধিক অত্যাচারী তাদের জয় যেমন হতে পারে, তেমনি যারা অত্যাচারিত তাদের জয়ও হতে পারে। তবে দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাদের হাতে অর্থ থাকে, তাদের জয় হয়। সব সময় অস্ত্রেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় এমন কথা ঠিক নয়, টাকার ঝনঝনানিতে সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতাবানদেরও পতন ঘটে।

হানিফ মাস্টার প্রতিবাদ করে বলল, আপনি কি আমাদের এই যুদ্ধকে বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক লিবারেশন যুদ্ধ মনে করেন?

বললাম, আমার মনে করার ওপর যুদ্ধ নির্ভর করছে না, যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি থেকেই তা স্থির করতে হয়। এখন পর্যন্ত কোন মতবাদেও উপনীত হতে পারিনি।

নূর মহম্মদ বলল, দেশের সব মানুষ যে যুদ্ধে নেমেছে, তার সঙ্গে বুর্জোয়াদের কি সম্বন্ধ থাকতে পারে?

বললাম, ধীরে বন্ধু, একটু ধীরে চলুন। আপনারা লড়াই করছেন কিসের বিরুদ্ধে? উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ পাকিস্থানী সাম্রাজ্যবাদীরা হল গোটা বাঙলাদেশের শত্রু। দলমত-নির্বিশেষে সবাই একই পতাকার তলে এসেছেন পাকিস্থানী সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়ন করতে। কথাটা ন্যায্য। কিন্তু লড়াই চলেছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে, মুখ্যতঃ ধনতন্ত্রী শোষণের বিরুদ্ধে নয়। যেদিন সেই লড়াই হবে, সেদিনই জানা যাবে যুদ্ধের প্রকৃত চরিত্র কী!

অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল নূর মহম্মদ।

অমল পেছন থেকে বলল, যদি তা হয় তা হলে এহিয়া (ইয়াহিয়া) বাঙলাদেশকে ইন্দোনেশিয়ার অবস্থায় দাঁড় করাবে।

হেসে বললাম, ইন্দোনেশিয়াতে যা সম্ভব, তা বাঙলাদেশে সম্ভব নয়। মার্কস্‌বাদ যেমন ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রয়োগ করা উচিত, কোন

গোঁড়ামি না রেখে, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদও তেমনি সকল দেশেই ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয়। কখনও তারা পায়ে হাত দেয়, কখনও ঘাড়ে। তাই সমুদ্রবেষ্টিত ইন্দোনেশিয়াতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কয়েক লক্ষ কম্যুনিস্ট ও সন্দেহভাজন কম্যুনিস্ট হত্যা করে সুহারতো ও নাসুসান যা করেছে, বাঙলা দেশে তা সম্ভব নয়। সে চেষ্টা যে অসফল হয়েছে তা এহিয়া (ইয়াহিয়া) বেশ বুঝেছে। ঢাকা ও অন্যান্য শহরে ছাব্বিশে মার্চ থেকে আটাশে মার্চ পর্যন্ত দুই থেকে তিন লক্ষ লোককে হত্যা করেও কিছু করতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদীরা আসুরিক শক্তির ওপর বেশি ভরসা করে, কিন্তু সেটাও গোঁড়ামি। এই গোঁড়ামির জন্যই এহিয়া সাফল্যলাভ করেনি। দ্বিতীয়তঃ, ইন্দোনেশিয়ায় কম্যুনিস্টদের বড় বন্ধু ছিল চীন। সেই চীনের ভূমি কয়েক হাজার মাইল দূরে। তাই ইন্দোনেশিয়ায় মানুষকে মরতে হয়েছে খাঁচায়-বন্দী জানোয়ারের মত ; বাঙলাদেশের মানুষকে সেভাবে মরতে হবে না। ভারত বিভক্ত হলেও বাঙলাদেশের মানুষ আর ভারতের মানুষ একই রক্তের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। তাই ভারত তাদের সাহায্য না করে পারে না। বিদ্রোহী বাঙ্গালীরা আশ্রয় পাবে। বছরের পর বছর তারা লড়াই করবে।

হানিফ মাস্টার বলল, আপনি এই লড়াইকে কী বলতে চান ?

বললাম যে আমার কোন মত নেই। আমি অবস্থার বিচার করি, আমি ঘটনাকে আপাতদৃষ্টিতে দেখে কিছুই বলতে পারি না। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, পাকিস্থানের জন্ম হয়েছিল বিভীষিকা, উৎপীড়ন, অধর্ম, অত্যাচার করে এবং ভাইয়ের বুকে ও দেশ-মাতৃকার বুকে ছুরি বসিয়ে। কিন্তু পাকিস্থান যারা কায়েম করেছিল, তারা তখনই বুঝেছিল পূর্ব কোনদিনই পশ্চিম হবে না। বিষুবরেখার এধারে যখন গ্রীষ্ম, ওধারে তখন শীত। তবে এক করার চেষ্টা করেছিল নানা ভাবে। কখনও উর্দু চাপিয়ে, কখনও রোমান আর আরবী

হরফ চাপিয়ে। মুখ্য উদ্দেশ্য পূব-পশ্চিমকে একটি কৌম তৈরী করা, যতই মেকি হোক না কেন, কিন্তু বক্তব্য ছিল হিন্দু কালচারকে পাকিস্থান থেকে বিদায় করা। দেশের বোকা লোকগুলো ইসলামের এইসব পিলারদের কোনমতেই ওব্‌লাইজ করতে পারল না। তবুও পাকিস্থান বজায় রাখতে হবে পশ্চিম পাকিস্থানীদের স্বার্থে, তার জন্য অমোঘ দাওয়াই হল মার্শাল ল। জন্ম থেকেই পশ্চিমী সাম্রাজ্য-বাদীরা জিগীর দিল, "হিন্দুস্তান হামারা দুশমন"। দুশমনকে শায়েস্তা করতেই হবে। যে-কোন সময় যে-কোন রন্ধ্রপথে হিন্দুস্থানী ভাবধারা পাকিস্থানে অনুপ্রবেশ করে বেসামাল করতে পারে। বিশেষ করে হিন্দুস্থান যে-কোন সময় পাকিস্থান আক্রমণও করতে পারে। সেজন্য সব সময় বন্দুক উঁচু করে থাকতেই হবে।

হানিফ মাস্টার বলল, এ সব আমরা বিশ্বাস করি না।

আপনি বিশ্বাস যেমন করেন না, তেমনি অবিশ্বাস করে পাকিস্থানীরাও, কিন্তু তাতে তো সাম্রাজ্য রক্ষা সম্ভব নয়। তাই কাল্পনিক আক্রমণ-ভীতি ছড়াতে কোন ক্রুটি করেনি। পূর্ববঙ্গের বোকা লোকদের আরও বোকা করতে ওরা বিরাট সৈন্যবাহিনী বসাল, বিমানক্ষেত্র তৈরি করল। খানরা ভালভাবেই জানে ভারতের কোন আগ্রাসী নীতি নেই। ভারতের মানুষ অপরের ওপর অকারণ হামলাবাজি সহ্য করে না। ভারত তার আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত। খানরা আরও জানে, তারা পূর্ববঙ্গে যে সামরিক প্রস্তুতি রেখেছে তা ভারতের আক্রমণের মুখে অতি নগণ্য। তবুও কেন এই প্রস্তুতি! ভারত-ভীতি? ভারত-বিদ্বেষ? উঁহুঁ! এটা সাম্রাজ্যরক্ষার কৌশল। বাঙলাদেশের মানুষকে বুঝিয়েছে, এটা শত্রুকে রুখবার জন্য, কিন্তু পূর্ববাঙলা নামক উপনিবেশের নিরস্ত্র জনতা শায়েস্তা করতে এবং তাদের বাধ্যতামূলক দাসজীবন যাপন করতে এই সৈন্য-সমাবেশ। এই সত্যটি কোন সময়ই স্বীকার করেনি। তার পরিচয় তো আপনারা হাতে হাতে পাচ্ছেন।

নূর মহম্মদ বলল, ধরুন ভারত যদি পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করে, তবে তার জন্য কি সৈন্য-সমাবেশ দরকার নয়?

দেখুন মিঞাসাহেব, ঘটনার ফল দেখে ঘটনার বিচার করা হল বুদ্ধিজীবীদের কাজ। এ দিয়েই ঘটনার চরিত্র নির্ধারণ করা হয়। বাষট্টি সালে চীন-ভারত সংঘর্ষ হয়েছিল। ভারত তার যোগ্যতা দেখাতে পারেনি সামরিক কৌশলে। পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধের উপযোগী সেনা তখন ছিল না, সমতলে চীনারা আসতে সাহস পায়নি। পার্বত্য এলাকার যুদ্ধে ভারতের বিপর্যয় ঘটেছিল ঠিকই। পাকিস্থান মনে করল, ভারতবর্ষ যেন কাগুজে বাঘ। এই সুযোগে কাশ্মীরকে বেহেস্তে পরিণত করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ভারতও বুঝেছিল তার সামরিক সেট-আপের কোথায় গলদ। দু'বছর সময় পেয়েছিল গোটা বাহিনীকে ঢেলে সাজতে। পাকিস্থানের সামরিক গুপ্তচরদের সংবাদকে মিথ্যা প্রমাণিত করে যেদিন ভারতীয়রা খানদের ঠেলতে ঠেলতে ইছোগিল খালের ধারে নিয়ে গেল, সেদিন খানরা বুঝতে পারল ভারত চিরকাল ভারত। ফাজলামি চলবে না। আর বেশি ফাজলামি করলে লাহোর ধ্বংস অনিবার্য। এই যুদ্ধে বাঙলা-দেশের মানুষ মোটেই আগ্রহী নয় বুঝেই আয়ুব খান যুদ্ধকে বাঙলাদেশেও ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। পাকিস্থানের জঙ্গী ও বোমারু বিমান অকস্মাৎ আক্রমণ করল ব্যারাকপুর আর কলাইকুণ্ডা, কিন্তু ভারত প্রতিশোধ নেবার জন্যও পূর্ববঙ্গে একটা বুলেটও খরচ করেনি। যদি ভারতের মতলব থাকত পূর্ববঙ্গ দখল করার, তাহলে পঁয়ষট্টি সালের পাকিস্থানী হঠকারিতার জবাব সাতদিনেই দিতে পারত। ভারতের নীতি আগ্রাসী নীতি নয়, সেজন্য তারা কোন সময়ই পূর্ববঙ্গকে আক্রমণ করবে না। আক্রমণকারীর অমর্যাদা-কারী ভূমিকা গ্রহণ ভারতের ঐতিহ্যের পরিপন্থী। তবুও কেন খানরা পূর্ববঙ্গে লক্ষাধিক সৈন্য রেখেছে? কারণ তাদের সাম্রাজ্য-রক্ষা। সেই ছবিই আজকের ছবি। উপনিবেশ কিভাবে শোষণ ও

শাসন করতে হয়, সে বিষয়েও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ওদের নেই। ঝানু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকেও নতুন ফরমূলায় অঙ্ক কষতে হচ্ছে। আর এরা তো পুঁটিমাছ।

সবার মুখেই শুনছি একটা কথা।

"ভারত কেন 'বাঙলাদেশকে' কূটনৈতিক মর্যাদা দিচ্ছে না।"

কেন দিচ্ছে না তার উত্তর একটি কথায় শেষ করেছি কয়েক দিন আগে। বলেছি, ওটা হল রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের বিষয়। কিন্তু মনে-প্রাণে আমরা অর্থাৎ জনসাধারণ এই নতুন বাঙলাদেশকে মর্যাদা দিয়েছি এবং সর্বতোভাবে সাহায্য করছি। কাগজে-কলমে স্বীকৃতি-দান করলে বিশ্ব-রাজনীতিতে জট পাকাতো। ভারত থেকে বেতারে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ প্রচার করার অর্থ পরোক্ষে স্বীকৃতি-দান। সেজন্য কাগজে-কলমে স্বীকৃতিদান খুব বড় কথা নয়।

রাতের বেলায় নীলমণিগঞ্জ রেল-স্টেশনের ছাউনির তলায় আশ্রয় নিয়ে চাদর বিছিয়ে নিয়েছি, এমন সময় নূর মহম্মদ বলল, ইন্দিরা গান্ধী কেন আমাদের এই বাঙলাদেশকে recognise করছেন না ?

বললাম, ওটা ভারত সরকারের এক্তিয়ারে। তারা হঠাৎ কিছু করতে তো পারে না। সারা বিশ্বের মানুষ এই বাঙলাদেশের ঘটনার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ কিছু করলে বহু সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেজন্য ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হচ্ছে।

দেখুন, খানরা চিরকালই ভারতকে গালাগালি করে। ভারত কোন কিছু করলেই ওরা তার নিন্দা করে। অর্থাৎ ভারত হল ওদের জন্মবৈরী। আপনারা তো একটিও বন্দুক বা গুলী দেননি, অথচ খানরা এর মধ্যেই প্রচার করছে ভারত এইসব ঘটনা ঘটাচ্ছে সমাজবিরোধী বিচ্ছিন্নতাকামীদের দিয়ে। এবার না হয় সত্যি

কিছু করে নিন্দাভাজন হোন। যেমন মনে করুন, হঠাৎ কয়েকটা বোমারু বিমান দিয়ে যশোর ক্যান্টনমেণ্টটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যাক। ওরা বলবে ভারত এটা করেছে, কিন্তু ভারত যা করে না তার জন্যও তো গালাগালি করে। এবার না হয় কিছু করেই গালাগালি শুনুক।

শুতে শুতে বললাম, আপনার কথা মনে থাকবে।

দেখুন মিঞাসাব, আপনারা তো এদেশে থাকেন না, তাই জানতেও পারেন না আমাদের অবস্থা। আপনারা নিজের কথাই ভাবেন, একবার আমাদের কথা ভেবে দেখুন।

হেসে বললাম, সারাদিন পথ চলে ক্লান্ত। এবার একটু ঘুমোনো যাক। কাল কথা হবে।

নূর মহম্মদ জোর দিয়ে বলল, আমাদের আবার ঘুম। আমরা ঘুমোবো কবরে। খোদা হাফেজ, যদি বর্বর খানদের হাত থেকে দেশরক্ষা করতে পারি, তাহলে কবরে গিয়েও শান্তি। যাই হোক, বলুন, কেন ইন্দিরা গান্ধী চুপ করে আছেন।

বললাম, ইন্দিরা গান্ধী চুপ করে তো নেই। সবরকম সহানুভূতি জানিয়েছেন। সবরকম সাহায্য করছেন। একমাত্র অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছেন না, কারণ করতে পারেন না বর্তমানে।

কেন পারেন না, সেটাই তো জানতে চাই।

হানিফ মাস্টার বলল, ওসব কাল হবে হে নুরু। আজ শুয়ে পড়।

নূর মহম্মদ বলল, কাল-টাল নেই। আজ সারা রাত ঐ সবই শুনব।

হানিফ মাস্টার প্রতিবাদ করে বলল, না হে, না। আমরা যুদ্ধ দেখতে এসেছি, যুদ্ধ দেখব। ভারতবর্ষ কি করল অথবা না করল, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। একথা সত্যি, যদি ভারত থেকে সাহায্য না পেতাম তাহলে সাতদিনের মধ্যে আমরা

ঘায়েল হয়ে যেতাম, যদি অস্ত্র সাহায্য আসত তাহলে সাতদিনের মধ্যে আমরা খানদের ঘায়েল করতে পারতাম। ভারতের প্রতিটি মানুষ যে অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করছে, এটা ছিল কল্পনাতীত। আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

নূর মহম্মদ বলল, অবশ্যই। কিন্তু আমি জানতে চাই সরকারী ভাবে কেন ভারত বাঙলাদেশকে সমর্থন করছে না।

বললাম, এখন ও-সব কথা বলার সময় হয়নি মিঞাভাই। একটা কথা মনে রাখবেন, অখণ্ড পাকিস্থানের বাঙ্গালীরা চরম দুঃখে দিন কাটাচ্ছে ঠিকই, তবে ভারতীয় বাঙ্গালীরা খুব সুখে নেই। এইটেই বড় কারণ সরকারী ভাবে স্বীকৃতি না দেবার।

কেমন ঝাপসা কথা বলছেন সাহেব।

ঝাপসাই থাকুক বর্তমানে। ভবিষ্যতে আলোতে নিয়ে আসতে পারব। সেই আলোর জন্য অপেক্ষা করুন।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

শেষ রাতে ঘুম ভাঙ্গল কতকগুলো নর-নারীর ফিস্‌ফিসানিতে। ফিস্‌ফিসানি ঠিক নয়, করুণ অথচ চাপা আর্তনাদ ফেটে পড়ছিল তাদের কণ্ঠ থেকে। বেশ অন্ধকার। শেষ রা র চাঁদ মেঘের কোলে মুখ লুকিয়েছে। টিনের ছাউনীর এক কোণায় আমরা পাঁচজন পাশাপাশি শুয়ে। হানিফ ও নূর মহম্মদ নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। অমল-অবিনাশও গভীর ঘুমে। আমার ঘুম গভীর হলেও ঘুম ভাঙ্গল হঠাৎ ওদের গলার শব্দে।

কান পেতে রইলাম।

একজন বলল, নসীবন কোথায় ?

নারীকণ্ঠে উত্তর এল, তাকে তো সন্ধ্যার পর থেকে পাচ্ছি না। সবার পেছনে ছিল।

পুরুষকণ্ঠ বলল, ইনশাল্লা, যদি বেঁচে থাকি তাহলে এর বদলা নেব।

নারীকণ্ঠ মৃদুস্বরে বলল, দর্শনায় না গেলেই হত। তোমরা তো আমার কথা শুনলে না। দর্শনা হল গুণ্ডাদের আড্ডা। এখন নসীবনকে কোথায় খুঁজবে বল!

তাই তো। মানিক মিঞা নসীবনকে নিরাপদ জায়গায় পাঠাবে বলেই আমাদের সঙ্গে পাঠিয়েছিল।

নিরাপদ জায়গা আর কোথায় আছে বল। যশোর তো গেছে। কুষ্টিয়াও যাবে। যেতে হবে হিন্দুস্থানে।

ভীতকণ্ঠে একজন বলল, আমার যাওয়া চলবে না।

অপর একজন বলল, কেন? ওয়ারেন্ট আছে বুঝি? এই ডামাডোলে ওরা তোমার কথা ভুলেই যাবে।

নারীকণ্ঠ বলল, আতিকুর মিঞার কথা বাদ দাও। মেয়েটা নিয়ে এসেছিল হিন্দুস্থান থেকে, ঘর করল না। কাবলী ইমতাজ খানের কাছে বেচে দিল। আতিকুরের জেল হওয়া উচিত।

আতিকুর বলল, খারাপ কাজ কি করেছি? হিন্দুর মেয়ে মুসলমানের ঘরে দিয়েছি। এ তো নেক কাজ।

অপর কণ্ঠ শোনা গেল, নেক কাজ হলে আজ ঘর ছেড়ে পালাতে হত না মিঞা। আমরা কেউ ভাল কাজ করিনি। এবার ফল পাচ্ছি। হিন্দুর মেয়ে চুরি করে নেক কাজ যখন করেছ, তখন বেহেস্তের সাত দরওয়াজা পার হতে ভয় পাচ্ছ কেন! ওসব পাপ কাজের কথা বলে আর লাভ নেই।

নারীকণ্ঠ বলল, মেয়েমানুষ চুরি যারা করে, তারা গোরু-চোরের চেয়েও অধম। কাবলীওলার ঘরে আমি ননীবালাকে দেখেছি। মুখে কিছু বলত না, চোখ দিয়ে শুধু পানি পড়ত। আতিকুর কত ভালবাসা মহব্বত আর টাকাপয়সার স্বপ্ন দেখিয়ে যে এনেছিল, তা আমাকে বলেছিল কয়েকদিন। কাবলীওলার হাতে পড়ে ওর জান যাবার যোগাড়।

কঠিনকণ্ঠে একজন বলল, চুপ কর। আতিকুরকে বাদ দিয়েই

আমাদের বউ-বেটীদের নিয়ে হিন্দুস্থানে রেখে আসতে হবে। আতিকুর হল দোজখের পিশাচ।

আর কোন কথা নেই।

ধীরে ধীরে উঠলাম।

স্টেশন খালি। গাড়ি-চলাচল বন্ধ। স্টেশনমাস্টারকে দেখতে পেলাম না। স্টেশনের ঘরে আলো জ্বলছে না। ডিসট্যাণ্ট আর হোম-সিগন্যালেও কেউ আলো দেয় নি। অন্ধকারে সামনের গাছগুলো দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে ছিল। দূরের গ্রামগুলোও আঁধারে অদৃশ্য হয়ে রয়েছে। সকাল হতে তখনও দেরি।

প্লাটফরমের শেষ কোণায় গিয়ে বসলাম।

ভাবছিলাম নূর মহম্মদের কথা। তারই প্রশ্ন বারবার মনের মধ্যে ঘুরতে থাকে। 'কেন ইন্দিরা গান্ধী বাঙলাদেশকে সরকারী ভাবে স্বীকৃতি দিতে' সবার শেষের সারিতে দাঁড় করাবে ভারতবর্ষকে। কেন ?

কঠিন প্রশ্ন।

ততোধিক কঠিন এর উত্তর।

নুরুন্নাহারকে ফিরতি পথে এর উত্তর দিয়েছিলাম চুয়াডাঙ্গা শহর ছেড়ে আসার পথে। কোন জেলার পুলিশ-সুপারের মেয়ে নুরুন্নাহার। বেগম রোশেন আরার আত্মত্যাগে তার মনোভাব সঞ্জীবিত। তারও ইচ্ছা রোশেন আরার মত সেও বুকে মাইন বেঁধে লাফিয়ে পড়বে পাকিস্থানী ট্যাঙ্কের সামনে। নিজের জীবন দিয়েও সে দেশের সেবা করবে। পুলিশ-সুপার পিতাকে সে বলেছিল, বাপ্‌জি, আমি যুদ্ধে যোগ দেব। পিতৃদেব সম্মতি দিয়েছিল, পিতার আশীর্বাদ নিয়ে নুরুন্নাহার কুষ্টিয়াতে গিয়েছিল যুদ্ধ করতে। যুদ্ধ জয় করে সে ফিরে এসেছে। কুষ্টিয়া তখনও মুক্তিফৌজের দখলে।

উত্তেজিত হয়েছিল যখন শুনল কুষ্টিয়া দখল করতে এগিয়ে আসছে খানেরা। তখন উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করতে করতে

বলেছিল, আমরা হাতিয়ার চাই। সেই হাতিয়ার কেন ভারত আমাদের দিচ্ছে না।

আমি সহজে তাকে কোন উত্তর দিতে পারিনি। শুধুমাত্র বলেছিলাম, যতদিন বাঙলাদেশ স্বীকৃতরাষ্ট্র না হবে, ততদিন অস্ত্র-সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়।

কেন স্বীকৃতি দিচ্ছে না? আপনারা বলুন আপনাদের সরকারকে।

সবাই বলেছিলাম। কিন্তু সে-সব পরের কথা।

নীলমণিগঞ্জ স্টেশনের প্লাটফরমের শেষ কোণায় বসে সেই কথাই ভাবছিলাম যে-কথা পরবর্তীকালে নূরুন্নাহারকে বলেছিলাম।

আকাশে আলো দেখা দিল।

ঘুমন্ত সবাই ধীরে ধীরে উঠে বসল।

নূর মহম্মদ নবাগত নারী-পুরুষের সঙ্গে আলাপ জমাতে এগিয়ে গিয়ে বসল।

আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

জীবনপুর থেকে।

কোথায় যাবেন?

তা জানি না। খানদের ভয়ে আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি, যেখানে আশ্রয় পাব সেখানেই যাব।

যশোরের অবস্থা কি বলুন তো?

যশোর। আর বলতে হবে না। যশোর আর নেই। শহরে মানুষ নেই, আছে খানরা আর শেয়াল শকুন। আছে অবাঙ্গালী গুণ্ডার দল যারা লুটতরাজ করছে, মানুষ মারছে, আর অনেক কিছু করছে যা মুখে বলাও যায় না। আমরা কোন রকমে পালিয়ে এসেছি। হাঁ মিঞাসাব, আমরা কোথায় গেলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো বলতে পারেন?

নূর মহম্মদ পিঠ থেকে বন্দুক নামিয়ে কোলের ওপর রেখে বলল, ওপারে।

হিন্দুস্থানে ?

না, খোদার চরণতলে। সেখানেই নিশ্চিন্তে বাস করা যাবে, তার চেয়ে নিরাপদ স্থান আর নেই।

একটি মহিলা ডুকরে কেঁদে উঠল।

নূর মহম্মদ জিজ্ঞেস করল, ও কাঁদছে কেন ?

ওর ফুফাতো বোন নসীবনকে কাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় যে গেল, তার হদিস করা যায় নি। দর্শনা পর্যন্ত ছিল। সেখান থেকে কোথায় যে গেল তা এখনও জানা যায় নি।

খানরা আটক করেছে কি ?

তা অসম্ভব নয়! তবে অবাঙ্গালী যে-সব মুজাহিদ ওখানে আছে ওদের নিয়েই ভয় বেশি। এরা না পারে এমন কাজ নেই।

মহিলা ঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে বসে বলল, খানরা সর্বনাশ করেছে বাপ্‌জি। অন্যের মেয়ে, ডাগর মেয়ে, আমার সঙ্গে পাঠিয়েছিল যাতে কোন বিপদ না হয় সেজন্য' এখন কি যে জবাব দেব।

বলতে বলতে আবার কেঁদে ফেলল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে একজন পুরুষসঙ্গী বলল, এ রকম কত মেয়ে যে হারিয়ে গেছে, কত মেয়ের সর্বনাশ করেছে ঐসব জানোয়ার খান আর অবাঙ্গালীরা, তার হিসাব নেই সাহেব। খোদা ওদের কোনদিন মার্জনা করবে না।

এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিলাম, এবার বললাম, খোদা কবে ওদের বিচার করবে তার জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই, বড়মিঞা। খোদার সৃষ্টিকে যারা ধ্বংস করে, তাদের শাস্তি দিতে হবে এই জমানায়। তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

মহিলা বলল, আমাদের কি ক্ষমতা আছে বলুন। খানদের অত্যাচার থেকে কেউ তো বাঁচাতে পারছে না।

বললাম, কেউ বাঁচাবে না, মা। বাঁচা নির্ভর করছে নিজের ওপর। যে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে, খোদা তাকেই বাঁচান। খোদা তো নিজে আসেন না, তার সৃষ্টির মাঝ দিয়েই বাঁচার প্রেরণা আসে। সেই চেষ্টা করতে হবে, তার জন্য অনেক বেশী মূল্য দিতে হয়, মা।

হানিফ বলল, মুজাহিদরা কি করছে?

মুজাহিদ, আনসার সবাই লড়াই করছে, লড়ছে, মরছে, মারছে, কিন্তু জয়লাভ করতে তো পারছে না।

বললাম, এখন পারবে না। যুদ্ধকে টেনে নিয়ে চলতে হবে, তবেই জয়।

নূর মহম্মদ চিন্তিতভাবে বলল, কত লোক মারা গেছে?

তা কয়েক হাজার হবে। বাড়িঘর ভেঙ্গে চুরমার করছে। জিনিসপত্র লুট করছে, জোয়ান মেয়েদের টানতে টানতে নিয়ে গেছে ব্যারাকে।

এরা কারা?

ঠিক বুঝলাম না আপনার কথা। যা কিছু করছে খানরা। তাদের সঙ্গে আছে অবাঙ্গালীরা, আর লীগের শয়তানরা।

তা বলছি না। কাদের ওপর এই অত্যাচার হচ্ছে।

হায় আল্লা! ওরা বাছবিচার করছে না জনাব। ওরা যা-কিছু করছে, তাতে ওদের হাত থেকে কেউ বাদ যাচ্ছে না। লীগের শয়তানরা যাদের দেখিয়ে দিচ্ছে, তাদের ওপর জুলুম হয়েছে ও হচ্ছে। বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর আর আওয়ামী লীগের ওপর চলছে বেশি অত্যাচার।

আমি বললাম, আর কিছু দেখেছেন কি আপনারা?

আর কি দেখব জনাব। এমন পরিবার নেই যার কিছু-না-

কিছু খোয়া যায় নি। কারও বাড়ি গেছে, কারও আত্মীয়-কুটুম্ব মারা গেছে। কারও সহায়-সম্পদ গেছে। কারও ঘরের বউ-বেটী গেছে। যে রাস্তায় ওরা পা দিচ্ছে, তার আশেপাশের সব ঘররাড়ি জ্বালিয়ে গ্রামকে-গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যাচ্ছে। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

নূর মহম্মদ কিছুটা ভেবে বলল, কোথায় যাব তা এখনও ঠিক করিনি। যশোর যাবার ইচ্ছা আছে।

ওদিকে যাবেন না। তা হলে জান নিয়ে ফিরতে পারবেন না।

জান দিতেই যাব মিঞাসাব।

যশোর অনেক দূর।

জানি মিঞাসাব। জানি বলেই যাব।

নূর মহম্মদ আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারাও তো যাবেন?

বললাম, সেই ইচ্ছা নিয়েই তো এসেছি।

আমরা স্টেশন ছেড়ে গ্রামের দিকে অগ্রসর হলাম। তখন লোক-চলাচল আরম্ভ হয়েছে। বেশ স্বাভাবিক জীবন। পঞ্চাশ কিম্বা একশ' মাইলের মধ্যে যে ঘোরতর হত্যাকাণ্ড ও নারকীয় ঘটনা ঘটছে, তার কোন লক্ষণই নেই সেখানে। সাধারণ লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে মনে হল এদের কোন উৎকণ্ঠাই নেই। এরা যে সহজ সরল জীবনের সঙ্গে পরিচিত, সেই জীবন আজও অব্যাহত গতিতে ছুটে চলেছে। কোথাও কোন ছেদের চিহ্ন নেই।

অমল সবকিছু দেখে হঠাৎ ফিস্‌ফিস করে বলল, বুঝলেন কালাচাঁদ-দাদা, আমরা যা শুনেছি তা ঠিক নয় বলেই মনে হচ্ছে। যুদ্ধ যুদ্ধ বলে দুপক্ষই জিগীর দিচ্ছে, অথচ যুদ্ধের 'য' অক্ষরের কোন চিহ্নই দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে কোথাও কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় নি।

হেসে বললাম, সেই পুরানো কথাটা আবার তোমাকে বলতে

হচ্ছে। বিগত তিনশত বছরে বাঙলাদেশে কোন যুদ্ধ হয় নি। আধুনিক যুগের যুদ্ধ তো কল্পনার বস্তু। সেজন্য আমাদের কারও যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চট্টগ্রামের লোক কিছুটা যুদ্ধের আবহাওয়াতে ছিল, তারা কিছুটা আন্দাজ করতে পারলেও আমাদের সামান্য আন্দাজ করার সামর্থ্যও নেই। যতক্ষণ আমরা যুদ্ধের ধ্বংসলীলা স্বচক্ষে না দেখছি, ততক্ষণ আধুনিক যুদ্ধকে ছেলেখেলাই মনে হবে।

নুরু মিঞা ইতিমধ্যে চায়ের দোকান খুঁজে বের করেছে। এসে বলল, চলুন, চা খেয়ে আসি।

তার সঙ্গে চায়ের দোকানে হাজির হলাম।

নুরু মিঞা বলল, এখানে কোন হাঙ্গামা হয়েছে কি মিঞাভাই ?

না সাহেব। খানরা এদিকে পা দিতে সাহস পায় নি। খান দেখলেই আমরা তাদের খতম করবই করব।

পান খেয়ে চা-ওলার দাঁতগুলোতে লাল রং ধরেছে, সেই লাল দাঁতগুলো বের করে হাসল।

বললাম, খানদের সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে কি আপনাদের ?

না। শুনেছি চোডাঙ্গায় বোমা ফেলেছে। কেউ মরে নি, মরেছে একটা গরু।

অমল ফিস্‌ফিস করে বলল, পাকিস্থানীরা অপারেশন আরম্ভ করেছে।

অবিনাশ বলল, এতে কি লাভ। শহর দখল করলেও গোটা দেশের পল্লী অঞ্চল মুক্তিফৌজের হাতে।

বললাম, ঠিকই বলেছ অবিনাশ। যদি গোটা জেলার শহর গ্রাম হাত-ছাড়া হত, তা হলেই মুক্তিফৌজের বেশি সুবিধা হত। হাতে পাওয়ার অর্থ বর্তমান অবস্থায় ভারসাম্য হারানো।

হানিফ প্রতিবাদের সুরে বলল, আপনি অদ্ভুত কথা বলছেন।

বললাম, তাই মনে হবে বন্ধু, কিন্তু আমার বক্তব্য যেমন স্পষ্ট

তেমনি সত্য, blunt but true. পাকিস্থানীরা সব দখল করবে, তাদের শক্তি ক্ষয় হবে, আর্থিক বিপর্যয় ঘটবে ; তখন পাল্টা আক্রমণ করতে পারলে যে জয় আসবে, সে জয়ই হল চূড়ান্ত জয়। এখনকার এই হাতে-থাকার অর্থ শত্রুকে ঘরে ডেকে আনা। নিরস্ত্র মানুষকে আধুনিক অস্ত্রের মুখে ঠেলে দেওয়া।

অমল বলল, কি যে বলছেন! এখানে তো স্বাভাবিক জীবন চলছে।

তাও সত্যি। এতে আনন্দিত হবার কিছু নেই ভাই। পাকিস্থানীরা পেশাদার যোদ্ধা, আর বাঙলার স্বাধীনতাকামীরা নিরস্ত্র। সেজন্য মুখোমুখী যুদ্ধের সব চেষ্টাই পরাজয় ডেকে আনবে। এই স্বাভাবিক জীবন আর থাকবে না। প্রাথমিক পরাজয়ই ওদের জয়ের সোপান তৈরী করবে। লড়াই করে মুক্তিফৌজ লড়াই শিখবে। বর্তমানে মুখোমুখী যুদ্ধের যে চেষ্টা চলছে, তাতে জনক্ষয়, সম্পদ ক্ষয় ঘটবেই, পরাজয় আসবে, সেজন্য যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন করতে হবে। এই পরিবর্তিত কৌশলই জয় আনবে। পরিবর্তিত কৌশলের প্রথম স্তর হল গেরিলা যুদ্ধ।

নূর মহম্মদ আমার কথা সহ্য করতে পা'ছিল না। সে উত্তেজিত ভাবে বলল, ওদের ক্ষমতা নেই আমাদের সামনে দাঁড়ায়।

বললাম, নুরু মিঞা, ঐ চা-ওলার মত কথা বললে চলবে না। গেরিলা যুদ্ধ চলবে। তা যদি চালাতে পারেন তাহলে পাকিস্থানীরা কোণঠাসা হবে। সেই সুযোগে গণফৌজ গড়ে তুলতে হবে, যাকে বলে Peoples' Liberation Army—সেই আর্মি গড়ে উঠলে শেষ জয়। আপনারা মনে করছেন তিরিশ দিনে যুদ্ধ শেষ হবে, তাও হতে পারে যদি এটা বুর্জোয়াদের মুক্তিযুদ্ধ হত ; কিন্তু জনযুদ্ধ আরম্ভ হলে তিরিশ মাসেও তা শেষ হবে না।

নূর মহম্মদ চমকে উঠে বলল, আপনার কথা বুঝতে পারছি না। আমরা চাই সত্বর খানদের বিদায় করতে।

তা হবে না ভাই। তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করতে পারলে ধ্বংস কম হবে ; কিন্তু তা হবে না। আমরা এক ইঞ্চি জমির জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে কাজিয়া করি, মামলা-মোকর্দমা করি ; আর এত বড় উপনিবেশটা সহজে পাকিস্থানীরা ছেড়ে যাবে এ মনে যারা করে তারা ভ্রান্ত। পাকিস্থানীরা সমগ্র শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ওরা শেষ না দেখে ছাড়বে না। যদি ওদের যেতেই হয়,—অবশ্যই ওদের যেতেই হবে,—তাহলে ওরা দেশকে গোরস্থানে পরিণত করেই যাবে।

হানিফ মাস্টার বলল, যুদ্ধ বেশিদিন চললে অর্থনৈতিক, সামাজিক দুর্যোগ দেখা দেবে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেবে, তাতে দেশ সর্বস্বান্ত হবে।

বললাম, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি ইংরেজের করুণায়। মোটামুটি transfer of power, ধলা শোষকের জায়গায় কালা শোষক গদিতে বসেছে। যদি আমাদের নামতে হত রক্তাক্ত সংগ্রামে, তাহলে আমাদেরও এই অবস্থায় আসতে হত। "এর পর যাহা ইতিহাস তাহা শোনে নাই কোন দিন", বুঝলে ভায়া। দেখতে পাবে মানুষের মাংস মানুষে খাচ্ছে। এটা তো যুদ্ধের রিহারসেল, আসল যুদ্ধে আসবে শুধু ধ্বংস। তখন আরম্ভ হবে বৈপ্লবিক মুক্তিযুদ্ধ। সে দিনটির জন্য অধীর প্রতীক্ষা করতে থাক। যদি পুঁজিবাদী স্বার্থে এই যুদ্ধ হয়, তাহলে এই যুদ্ধ থামবে দুর্বল পক্ষের আত্মসমর্পণে ; আর যদি জনতার যুদ্ধ হয় তাহলে সাম্রাজ্যবাদী পাকিস্থানীরা বাঙলাদেশে নির্বংশ হবে। আমরা কিন্তু এখনও আসল অবস্থার সম্মুখীন হই নি।

নূর মহম্মদ চিন্তিত, হানিফ মাস্টার আমার কথায় বেশি মূল্য দিতে পারছিল না। অমল ও অবিনাশ গম্ভীর।

নীলমণিগঞ্জ থেকে পেলাম হেলিকেপ্টার

হেলিকেপ্টার অর্থাৎ সাইকেলের পেছনের ক্যারিয়ারে বসে পথ-চলার সুযোগ।

দশ মাইলে এক টাকা।

পাঁচখানা সাইকেল যোগাড় হল।

আমাদের গন্তব্যস্থল চুয়াডাঙ্গা। দূরত্ব খুব বেশি নয়। পায়ে হেঁটে যেতে পারতাম। কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ত করে যেতে চাই, সেজন্য অন্য কোন যানবাহন না থাকায় হেলিকেপ্টারের আশ্রয় নিতে হল। আমাদের হেলিকেপ্টারের পাইলট বেশ সতেজ সবল বাঙ্গালী যুবক।

পাশাপাশি যেতে যেতে অমল বলল, একটা স্মরণীয় দ্রব্য লক্ষ্য করেছেন কি?

বললাম, অনেক কিছুই দেখছি, কোন্‌টার কথা বলছ?

ভারতের মুসলমানদের চেয়ে বাঙলাদেশে দাড়িওলা মুসলমানের সংখ্যা কম।

হেসে বললাম, তা দেখেছি কিন্তু তোমার মত সমালোচকের চোখ দিয়ে দেখিনি।

এটা কেন হয়েছে বলুন তো?

ভারতের অনেক মুসলমান আজও মনে করে তারা পরাধীন। তাদের বেহেস্ত হল পাকিস্থান, সেজন্য নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে বেশ একটা line of demarcation রক্ষা করছে। ভাল করে পাকিস্থানের মুষ্টিমেয় হিন্দুর দিকে লক্ষ্য করলেও দেখতে পাবে পারিবারিক জীবনে তারাও বেশী রক্ষণশীল এবং তারাও line of demarcation টেনে রাখতে আগ্রহী। ভারতের অনেক মুসলমান যেমন ভারতকে মাতৃভূমি এখনও মনে করতে পারছে না, তেমনি পাকিস্থানের মুষ্টিমেয় হিন্দুরাও পাকিস্থানকে মাতৃভূমি মনে করতে পারছে না। এটা হয়েছে স্বাভাবিক ভাবে। কারণ কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট, মুসলীম লীগ দ্বিজাতি-তত্ত্বের ওপরই দেশকে ভাগ করেছে,

তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে হিন্দুর দেশ ভারতবর্ষ, আর মুসলমানের দেশ পাকিস্থান।

অমল আর কোন কথা না বলে চুপ করে রইল।

রেল লাইনের পাশ দিয়ে মানুষ চলাচল করতে করতে যে রাস্তা তৈরি হয়েছে, সেই রাস্তা ধরে চলছে আমাদের হেলিকেপ্টার। পাইলট বেশ জোরে গাড়ি চালাবার চেষ্টা করছে। বর্তমানে সাইকেলই হল যোগাযোগের নিরাপদ যান ও বাহন। সেজন্য তারা আরও ট্রিপ দেবার আশায় সত্বর পথ অতিক্রম করতে চেষ্টা করছে।

আমার হেলিকেপ্টারের পাইলট বলল, আপনি তো অনেক পথ ঘুরে এলেন। আমাদের বঙ্গবন্ধু মুজিবরের কোন সংবাদ জানেন কি?

জানি না। কেউ হয়ত জানে, তবে সঠিক করে কেউ আজও বলছে না।

আবার চুপচাপ্।

বেশ রোদ উঠেছে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। নতুন বাংলা বৎসর সামনে। এ বছরটা কেমন যাবে তা নিয়েই মনটা ভারাক্রান্ত। এমন সময় পাইলট বলল, আমরা লড়াই করেই স্বাধীনতা আদায় করব।

বললাম, ঠিকই বলেছ। লড়াই না করলে ন্যায্য দাবি কখনও আদায় হয় না।

হাঁ সাহেব। আয়ুব খান কি গদি ছাড়ত? আমরা যদি লড়াইতে না নামতাম, তা হলে ভোটও হত না। আমরা পড়েছি খানের চক্করে। আয়ুব খান, এহিয়া খান, মোনেম খান, টিক্কা খান। খানরা দেশটাকে খান্ খান্ করে ফেলল সাহেব। আপনারা তো আবার ভারতের লোক। আপনারা খুব সুখেই আছেন। আমাদের যে কী কষ্ট! পেট ভরে দুটো পান্তাও জোটে না। অনেকে তো দিনের পর দিন ভাতের মুখও দেখতে পায় না। মেহনত করে খাব

তারও উপায় নেই। এই যে হেলিকেপ্টার, এর জন্য ট্যাক্স। ঘোড়ার গাড়ি করেছিলাম মিঞাসাব, তাতেও ট্যাক্স। ঘোড়া মুখ থুবড়ে মরল। গেল সাত আট শ টাকা। কিন্তু ট্যাক্স মকুব করল না খানরা। বলুন, কি করে খাই!

আমি আর কোন কথা খুঁজে পেলাম না। অবশেষে বললাম, চাষীরা তো মাঠে নেমেছে।

পাটের মরশুম। পাট এবার হচ্ছে না। এবার আমরা ভাত চাই। আমাদের নেতারা বলেছেন, ধান বুনতে হবে। পাট বুনলে দেশের লোককে না খেয়ে থাকতে হবে। খানরা পাট চায়। পাটেই তো ওদের টাকা। সরকার পাটের দাম ঠিক করেছে ছত্রিশ টাকা। চাষীর কাছ থেকে ছত্রিশ টাকায় পাট কিনে খানরা বিরাশি টাকা দরে বিক্রি করছে। বুঝুন অবস্থা। চাষী খেতে পায় না, খানরা চোখে সুরমা দিয়ে সরাব গলায় ঢালছে।

চুয়াডাঙ্গা রেল-স্টেশনের ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যাল দেখা গেল।

পাইলট চুপ করে থেকে জোরে জোরে প্যাডেলে চাপ দিতে থাকে।

আমিও নীরব।

দেখতে দেখতে স্টেশনে পৌঁছে গেলাম।

পাইলট বলল, ডাক্তার সাহেবের বাড়িতে যাবেন কি?

বললাম, না। আমাদের কাজ আরও এগিয়ে—যশোরে। এখানে আমরা দেরি করতে পারব না। ডাক্তার সাহেব এখন খুবই ব্যস্ত, তার কাজে বাধা দিয়ে লাভ নেই।

যশোর যে অনেক দূর। তবে হেলিকেপ্টার পাবেন। ঐখানে যান। শহরে তো আর কোন যানবাহন নেই। সরকার সব গাড়ি নিয়েছে মুক্তিফৌজের জন্য। সাধারণ মানুষের ভরসা আমাদের মত পাইলট।

স্টেশনে নামতেই যা চোখে পড়ল তা হল কদিন আগে বোমা-

বর্ষণের ক্ষতচিহ্ন। সাইডিং-এ একটা মালগাড়ির ওয়াগনে সোজা আঘাত লেগেছিল বোমার। সেটাই ভেঙ্গেছে আর স্প্লিনটার ছুটে স্টেশনবাড়ির ক্ষতিও করেছে।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে পাইলট বলল, কি দেখছেন সাহেব। আমাদের জামিন হল আমাদের মা। মা আমাদের রক্ষা করেছে। শালা খানরা যে-সব বোমা ফেলেছিল, সেগুলো যদি ফাটতো তাহলে গোটা চোডাঙ্গা গুঁড়ো হয়ে যেত। আমেরিকার পচা মাল, তাই বাঙলার নরম মাটিতে সেগুলো ফাটে নি। ছুটো মাত্র ফেটেছিল।

তুমি সে সময় ছিলে চুয়াডাঙ্গায় ?

সেদিন আমি প্যাসেঞ্জার নিয়ে আসছিলাম। আশমানে হাওয়াই জাহাজ দেখেই আমরা রেলের বাঁধে সাইকেল ফেলে শুয়ে পড়লাম। প্যাসেঞ্জার বছুমিঞা খুব সতর্ক লোক। বুঝতে পেরেছিল। তারপর ছুমদাম ছুটো আওয়াজ। তেমন আওয়াজ কখন শুনিনি জনাব। উঃ! অনেক উপর থেকে টাল খেতে খেতে নীচে নেমেই বোমা ফেলে ছুটো হাওয়াই জাহাজ বোঁ করে উপরে উঠে গেল। ভাবলাম বুঝি সব শেষ। আধ ঘণ্টা শুয়ে থেকে আমরা উঠলাম। আবার ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম চোডাঙ্গায়। নসীব বলতে হয়। একটা মানুষও মরে নি। একটা গরু টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ভাগ্যি স্টেশনে কেউ ছিল না।

তারপর ?

তারপর আর কিছুই নেই। যেমন চলছিল তেমনি চলছে। খানরা চোডাঙ্গার ওপর খুব নজর রেখেছে। ভারতে যাবার রাস্তা কিনা। ওরা রাস্তা বন্ধ করতে চায়। আমাদের আওয়ামী লীগের নেতারা বলল, ভয় পাসনি যেন। আমরা কি ভয় পাওয়ার বান্দা ! আমরা শেষ দেখব, জনাব।

স্টেশনেই সবাই আশ্রয় নিলাম।

প্রয়োজন আহার্য।

হানিফ মাস্টার নূরু মিঞাকে নিয়ে গেল খাবার আনতে। আমরা গিয়ে বসলাম বিধ্বস্ত স্টেশন-বাড়ির ছাউনীর তলায়।

অমল অনেকক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, এবার যুদ্ধ মনে হচ্ছে।

বললাম, এ তো কিছুই নয়। আরও কঠিন অবস্থা আমাদের সামনে রয়েছে।

কিন্তু কালাচাঁদ-দাদা, এইভাবে বোমা যদি মারতে থাকে অনবরত, তাহলে যা ক্ষতি হবে তা আগামী একশ বছরেও পূরণ করতে পারবে না বাঙলার মানুষ।

অত বেশি চিন্তা করে লাভ নেই। বিগত বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর যে অবস্থা হয়েছিল, তা দশ বছরেই সামলে নিয়েছে জার্মানীর মানুষরা। স্বাধীনতা আমরা পেয়েছিলাম ভিক্ষা করে, কিন্তু এদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হচ্ছে বুকের রক্ত দিয়ে। সেজন্য দেশ গড়ে তুলতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে এরা একটুও কার্পণ্য করবে না। নতুন জীবনের সন্ধান এরা পেয়েছে, তার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার এরা করবেই করবে।

আমাদের সামনে এসে বসল একটি যুবক। তার হাতে ট্র্যানজিসটার। সেদিকে লক্ষ্য ছিল না কারও। হঠাৎ, "আকাশবাণী কলকাতা" শুনে চমকে উঠলাম।

এগিয়ে গেলাম তার কাছে।

খবর হবে, বলে মুচকি হাসল যুবকটি।

বললাম, কোথাকার খবর ?

আর কে খবর দেবে বলুন। ঢাকা, রাজসাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা —সব স্টেশনই বন্ধ। খানরা সব দখল করে রেখেছে। আমাদের খবর তো ওরা দেবে না। আমাদের খবর দেবে ভারত থেকে।

আমরা তাই কলকাতা স্টেশনের খবর শুনি। কটা বাজে? আটটা বাজেনি? এখুনি খবর আরম্ভ হবে।

আকাশবাণী কলকাতা। খবর পড়ছি……ইত্যাদি।

দিল্লীর রাষ্ট্রদূত অফিসের দু-জন অফিসার ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছে শুনে শ্রোতারা উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

নূর মহম্মদ ও হানিফ মাস্টার শহর থেকে খাবার সংগ্রহ করে ফিরে এসে বলল, যশোরের খবর খুবই খারাপ।

হানিফ মাস্টার বলল, শহরের পাশেই ক্যাণ্টনমেণ্ট। সেখান থেকে পাকিস্থানী সৈন্য ট্যাঙ্ক, কামান নিয়ে শহর আক্রমণ করেছিল! শহর এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। জীবিত মানুষ একজনও সেখানে আছে কিনা সন্দেহ।

নূর মহম্মদ বলল, এখানকার খবর হল পাকিস্থানী খানের দল গাড়িতে করে পাকা সড়ক ধরে এগোচ্ছে। রাস্তার দু'পাশের গ্রামগুলো আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। মুক্তিফৌজ কয়েকদিন প্রবল বাধা দেবার পর পিঁছিয়ে পড়েছে। তারা নিরাপদ এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। খানেরা ভারতের দিকে এগোচ্ছে। বিশেষ করে চব্বিশ পরগনা এলাকার সীমান্ত চৌকিগুলো দখলের জন্য চেষ্টা করছে।

অমল বলল, আর এগিয়ে কাজ নেই। আমরা দর্শনা হয়ে ফিরে যাই দাদা। এরপর ফেরার পথ থাকবে না।

বললাম, তুমিই তো সাহস দিয়ে আমাকে এনেছ, এখন দেখছি তুমিই পালাবার পথ খুঁজছ।

অমল বলল, আমরা তো ওদের কোন উপকারই করতে পারব না। খামোকা প্রাণ যাবে। তার চেয়ে ফিরে যাওয়াই ভাল।

তুমি ইচ্ছা করলেই যেতে পার। আমি আরও ভেতরে এগিয়ে যাবই।

অমল প্রতিবাদ করল না। তার প্রস্তাব দ্বিতীয়বার উত্থাপন করল না।

আমি চুপ করে বসেছিলাম।

নূর মহম্মদ ও হানিফ মাস্টার খাবার বণ্টন করছিল।

ভাবছিলাম।

ভাবছিলাম অমলের কথা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোভাব খুবই স্পষ্ট তার কথায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিপ্লবের বন্ধু মনে করা হলেও তাদের কোন সময়ই নিরাপদ নির্ভরশীল বন্ধু মনে করা হয় না। স্রোতের গতিতে তারা ভাসে। সুযোগ বুঝলে দল পালটায়, মত পালটায়, এমনকি বন্ধুও শত্রুতে পরিণত হয়। এই চরিত্র বাঙলাদেশেও দেখা যাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে এই চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় হতে দেরী হয় নি।

চলার পথে মহেশপুরে প্রথম বাধা পেলাম। সেখানেই দেখা আজিজুর রহমানের সঙ্গে।

আজিজুর মুন্সীগঞ্জের ছেলে, ঢাকা বিশ্ববিত্থালয়ের ছাত্র।

তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি পঁচিশে মার্চ তারিখে ঢাকায় ছিলে কি?

ছিলাম। তবে আমি হোস্টেলে ছিলাম না। থাকতাম আজিমপুরায়। রাতের বেলায় আমার চাচার কাছে ফোনে সংবাদ এল পাকিস্থানী খানরা বিশ্ববিত্থালয় আক্রমণ করেছে। নির্বিচারে হত্যা করছে ছাত্র ও শিক্ষকদের। খবর পেয়েই আমরা যারা যুবক ও কিশোর তারা বেরিয়ে পড়লাম বাড়ী থেকে। তারপর কোথায় কি ভাবে যে ঘুরেছি তা স্মরণ করতে পারছি না। আমি যে জীবিত অবস্থায় ছিলাম এটাই যেন ভুলে গিয়েছিলাম। তাকিয়ে দেখছি আগুন, শুনতে পাচ্ছি কামানের শব্দ আর আর্তনাদ।

তাহলে ঢাকা বিশ্ববিত্থালয় আক্রমণটা মিথ্যা নয়।

মোটেই নয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বাড়িটা ধ্বংস হয়নি। ধ্বংস হয়েছে Hall-গুলো যেখানে ছাত্রছাত্রীরা থাকত, আর গুঁড়ো করে দিয়েছে অধ্যাপকদের বাসস্থানগুলো।

তুমি নিজের চোখে দেখেছ?

মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, হাঁ সাহেব। হায়াত না থাকলে আমিও মরতাম। আমার সামনেই কয়েকশত মানুষ টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখেছি। রাতের বেলায় সব দেখা যাচ্ছিল না। তখনও রাস্তায় আলো জ্বলছিল। যা দেখেছি তা আরও ভয়ঙ্কর।

আমরা যে রোশেনারা বেগমের আত্মত্যাগের কথা শুনেছি তা সত্যি কি?

হাঁ সত্যি। রোশেনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। কোথা থেকে এত মনোবল সে পেয়েছিল তা খোদাই জানে। তবে হাঁ, মেয়ে বটে। মরাটাই বড় কথা নয় সাহেব। মরার মত মরেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের মেয়েদের ওপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছে তা নিশ্চয়ই শুনেছেন। এই অসম্মানজনক মৃত্যুও ঘটেছে দেশের জন্য, এ মৃত্যুও দেশের জন্য। কিন্তু Hall-এর ছাত্রীরা সুযোগ পায়নি আত্মত্যাগের মাঝ দিয়ে শত্রুর নিপাত ঘটাতে, কিন্তু রোশেনারা অসম্মানিত জীবনে নেমে আসার আগেই মৃত্যুকে বরণ করেছিল সম্মানিত ভাবে শত্রুনিধনের জয়-তিলক কপালে এঁকে।

জিজ্ঞেস করলাম, চলাচল ব্যবস্থা কেমন আছে?

মোটেই সুবিধাজনক নয়। রাস্তাঘাট ভেঙ্গে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়েছে। সেজন্য কোথাও যাওয়ার সহজ উপায় নেই।

পাক সেনারা এগোচ্ছে কি ভাবে?

আজিজুর চারিদিকে তাকিয়ে বলল, ট্রাকে করে বালির বস্তা নিয়ে আসছে। বালির বস্তা দিয়ে গর্ত ভরাট করে লোহার পাত ছড়িয়ে দিচ্ছে তার ওপর। যেসব গ্রামের কাছে এইভাবে রাস্তা ভেঙ্গে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে সেইসব গ্রামের ওপর সবচেয়ে

বেশি অত্যাচার করছে খানরা। বলতে গেলে সে-সব গ্রামে এখন আর জীবিত মানুষ কেউ নেই। বিমান থেকে ন্যাপাম বোমা মেরে, গোলা মেরে গ্রামগুলো গুঁড়ো করে আগুন জ্বেলে দিয়েছে।

মুক্তিফৌজ বাধা দিচ্ছে না?

তাদের তো সম্বল থ্রি-নট্-থ্রি রাইফেল। তা দিয়ে ট্যাঙ্ক আটকানো যায় কি?

অন্য কোন হাতিয়ার নেই?

পাবে কোথায়? কিছু কিছু লাইট মেসিনগান, কিছু সাব-মেসিনগান, স্টেনগান মুক্তিফৌজ পাকিস্থানী খানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, তা দিয়েই কোন রকমে লড়াই করছিল, বর্তমানে প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়েছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে আগামী সপ্তাহেই খানরা গোটা দেশকে কব্জায় নিয়ে আসবে।

এরকম মনে হবার কি কারণ?

মুন্সীগঞ্জে দেখেছি, শহরের মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠছে। যেভাবে দেশের লোক শেখ সাহেবকে সমর্থন করছিল, তা যেন আর করছে না।

আজিজুরের মন্তব্য শুনে চমকে উঠলাম।

তবুও জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কি?

কারণ তো চোখের সামনে। দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধিই এর কারণ। লোকের আর দিন চলছে না। লবণ অপ্রাপ্য, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য আকাশ-ছোঁয়া, কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছে না, স্কুল, কলেজ, কল-কারখানা বন্ধ। একে জিনিসের দাম বাড়ছে, তার ওপর রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ। এমন অবস্থায় মানুষ কতক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকবে বলুন! সবাই মনে করেছিল, শেখ সাহেবের অসহযোগ আইন-অমান্য খানদের নতিস্বীকার করতে বাধ্য করবে। আর যদি অসামরিক শাসন-ব্যবস্থা অচল হয়, তাহলে আওয়ামী লীগের দাবি-সপ্তাহ না পেরোতেই খানরা মেনে নেবে। ফল হয়েছে

উল্টো। খানরা ওসব সভ্য ব্যবস্থা মানতে চায় না, মানতে জানেও না। ওদের কালচার হল হত্যা, লুট আর নারীধর্ষণ। সেই কাজেই ওরা মেতেছে। বাঙলাদেশের মানুষ এই বীভৎস অত্যাচার কখনও দেখেনি, তাদের মনোবল ধীর ধীরে লোপ পেতে আরম্ভ করেছে। মনে যাই থাকুক, বাইরে তারা খানদের সেলাম দিতে বাধ্য হবে।

আপনার বিশ্বাস খানদের জয় সুনিশ্চিত ?

বর্তমান অবস্থায় তাই তো মনে হচ্ছে। নিরস্ত্র মানুষ আর কত দিন লড়াই করবে বলুন। দ্বিতীয়তঃ শেখ সাহেবের স্ট্র্যাটেজি খুবই মানবতাবোধ-সম্পন্ন ; কিন্তু জঙ্গীবাদীদের সঙ্গে লড়তে হলে যা করা উচিত ছিল, যে সংগঠন গড়ে তোলা উচিত ছিল, যে কায়দায় লড়াই করা উচিত ছিল, তা শেখ সাহেবের অনুগামীরা করতে পারেন নি। ফলভোগ করছে নিরীহ জনসাধারণ।

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ভাবছিলাম, আজিজুর যা বলছে তা কি গোটা বাঙলাদেশের মানুষের কথা! মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আজিজুর তার শ্রেণীচরিত্র বজায় রেখেই মতামত দিয়েছে। বাঙলাদেশের মানুষের মতামত এটা হতেই পারে না। তা যদি হত তা হলে আড়াই সপ্তাহ ধরে মুক্তি-বাহিনী এভাবে বাধা দিতে পারত না। পশুশক্তি দিয়ে মানুষের স্বাধীনতালাভের অদম্য স্পৃহা কোনমতেই দমন করা যায় না। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ সামান্য অসুবিধাও যে সহ্য করতে চায় না, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল এই আজিজুর রহমান। দেশের এই চরম সন্ধিক্ষণে আজিজুর মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য না করে ক্ষতিই করবে। তাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেবার মত আমার মনের অবস্থা ছিল না। সেজন্য চুপ করে রইলাম।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে আজিজুর বলল, আচ্ছা চলি, জনাব। আপনারা আর এগোবেন না। সামনেই বিপদ।

খানরা চুয়াডাঙ্গা দখলের জন্য এগোচ্ছে। নিরাপদ স্থানে চলে যান।

বললাম, আপনার উপদেশ মনে থাকবে।

আজিজুর চলে যেতেই আমরাও প্রস্তুত হলাম যশোরের পথ ধরতে।

কিন্তু ফজলুরকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের জয় হবে কি?

ঠিক বলতে পারছি না। মনে হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিতে ভুল হয়েছে। যারা পরিচালক তাদের আধুনিক যুদ্ধের বিষয় কিছুই জানা নেই। ভাবাবেগে ওরা যেন ছুটছে। তবে ভুল সংশোধন করতেই হবে, খানদের শেষ মানুষটিকেও বিদায় করতেই হবে।

ফজলুর রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ষষ্ঠবার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। শহরের সাহেববাজারেই তার বাড়ি। বাড়িঘর আর নেই। পরিবার পরিজন বলতে কেউ আছে কিনা তাও তার জানা নেই। যতটুকু সে দেখেছে অথবা খবর পেয়েছে, তাতে মনে হয়েছে তার পরিবারের একজনও জীবিত নেই।

তুমি কোথায় যাচ্ছ?

গিয়েছিলাম ভারতে। আবার ফিরে এসেছি।

হেসে বললাম, যাবার প্রয়োজন ছিল না তাহলে?

প্রয়োজন ছিল না বলতে পারেন। মানুষ তো নিজেকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসে। সেই আদিম আত্মপ্রেম এক সময় কানে কানে বলেছিল, বাঁচতে হবে। তাই বোধহয় পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কবরখানার চারপাশে যখন মৃত মানুষ ভিড় করেছে, তখন সেই মৃতদেহ ডিঙ্গিয়ে নিজেকে বাঁচাবর চেষ্টা নেহাত স্বার্থপরতা। তাই ফিরে এলাম। অবশ্য ভারতকে সাক্ষাৎভাবে জানার ইচ্ছাও ছিল, তবে যা ভেবেছিলাম তা নয়, দেখেই ফিরতে হল।

তোমার কথা ঠিক বুঝলাম না।

বলছি। আমাকে একটু দম ধরতে দিন। আমার বাবা ছিলেন উকিল। বাবার ইচ্ছা ছিল আমিও উকিল হই। ভেবেছিলাম তাই হব। কিন্তু আমার মত ভোঁতা বুদ্ধির উকিলের পেটে দানা পড়বে না তা প্রথম বুঝলাম ভারতে গিয়ে।

হেসে ফেললাম।

হাসছেন। শুনুন। দর্শনা পেরিয়ে গেদে। একেবারে খাস ভারতবর্ষ। বাইশ তেইশ বছর আগে যখন আমার জন্ম হয়নি, তখন লাখে লাখে মানুষ এই পথেই গিয়েছিল ভারতে বাঁচার তাগিদে। তারা সবাই ছিল হিন্দু। পূর্ববঙ্গেও কিছু মুসলমানের স্রোত এসেছিল সেই সময়। সেই স্রোতে যারা এসেছিল তারা কিন্তু ভারতেরই লোক। তারা মুসলমান, তাই homeland খুঁজতে এসেছিল। পেল home, কিন্তু land তাদের নয়। এটা বুঝেই তারা অত্যাচার আরম্ভ করেছিল। সেই অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেতে আমরা আজ লড়ছি। আমাদেরও বাঁচার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই আছে। ভারত আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে সবরকম সাহায্য দিচ্ছে, তাও দেখছি। তাই প্রথম বাঁচার আশ্রয় খুঁজলাম ভারতে। গেলাম গেদে স্টেশনে।

তারপর।

তার পরের ঘটনাই তো বলব। আশ্রয়প্রার্থীর স্রোত বেনো জলের মত প্রবেশ করছে ভারতে। আমিও স্রোতে ভাসতে ভাসতে হাজির হয়েছি। সবাই আমাকে প্রশ্ন করেছে বাঙলাদেশের অবস্থা জানতে। তাদের ব্যবহারে কোন কৃত্রিমতা নেই। সাহায্য করতেও অনেকে ইচ্ছুক। এমন সময় চারজন বাঙ্গালী যুবক এল। তারা আমাকে আশ্রয় দিতে আগ্রহ দেখাল। চা এনে দিল। আমিও আপ্যায়িত হলাম। ওরা আমাকে ডেকে নিয়ে গেল একটা বাড়িতে। খড়ের ওপর চট বিছানো, তাতেই বসলাম।

একজন জানতে চাইল, ক'দিন আপনার খাওয়া হয়নি? বললাম, ছ'দিন। সঙ্গে সঙ্গে একজন বলল, ওরে বিনোদ, ভাইয়ের খাবারের ব্যবস্থা কর।

তাহলে তো খুব ভদ্র ব্যবহার করেছে ওরা। খাবার দিয়েছিল?

মাথা নেড়ে ফজলুর বলল, হ্যাঁ। ভাত, ডাল, মাছ পেটভর্তি খাইয়েছিল। কিন্তু ভদ্র ব্যবহার যেটুকু পেলাম, তার মাশুল আদায় করতে একজন রোগা ছিপছিপে বছর তিরিশের যুবক এসে উপস্থিত হল।

এসেই বলল, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

সবিনয়ে বললাম সবকিছু।

আপনার সঙ্গে কি কি জিনিস আছে?

আমার সঙ্গে ছিল একটা লুঙ্গি, একটা ডায়েরী ও হাতঘড়ি।

ডায়েরীটা নিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে বলল, আপনি যে খানদের গুপ্তচর নন, তার কি প্রমাণ আছে?

বললাম, আমার প্রমাণ আমি নিজেই।

উঁহু। আপনার মত অনেককে আমরা পাকড়াও করেছি। রিফুউজি সেজে গুপ্তচর বৃত্তি চালাতে এসেছিল এদেশে। দেখি আপনার ঘড়ি। ওটা ট্রান্সমিটার নয় তো!

আমি সরল বিশ্বাসে ঘড়ি খুলে দিলাম।

সেই রোগা লোকটা বলল, বিনোদ, এটা পরীক্ষা করতে পাঠিয়ে দে তো। এটা ট্রান্সমিটার হতেও পারে।

বিনোদ ঘড়ি হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আর তাকে দেখিনি।

আরেকজন একটা নতুন লুঙ্গি কিনে এনে আমার হাতে দিয়ে বলল, এটা পরবেন। আপনারটা রেখে যান। ওরকম দামী লুঙ্গি ভারতে কেউ পরে না। সন্দেহ করবে।

আমার ঘড়ি গেল, লুঙ্গি গেল, ডায়েরীটা গেল।

ফজলুরকে বাধা দিয়ে বললাম, আপনি পুলিশে খবর দিলেন না কেন ?

পুলিশ ! তাও তো বটে। তবে তখন ওসব ভাবতে পারি নি। বুঝলাম ভদ্র ব্যবহারের অন্তরালে যে অসদাচারীর হাতে পড়েছি, তাতে জীবন রক্ষা করতে পারলেই যথেষ্ট। আবার পুলিশের হাঙ্গামা। বাপ্‌স্‌।

ফজলুর চুপ করে থেকে বলল, তখন একটা কথা আমার মনে জাগল। যদি তা না জাগত তাহলে আমাকেও লাপ্‌সি খেয়েই সুদিনের অপেক্ষায় বসে থাকতে হত কোন ক্যাম্পে। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার সাধারণ মানুষের চেহারা। দুই বাঙলার মানুষের হৃদয়ে যে মমতা তা যেমন আছে, তেমনি আছে অনাহারী কর্মহীন মানুষদের বাঁচার নানা প্রচেষ্টা। আমরা বাঁচার জন্য লড়াই করছি, ওরা বাঁচার জন্য crime করছে। উভয় দেশের সাধারণ মানুষের সমস্যা একই, কিন্তু আমাকে যেভাবে যত্ন করেছে, ঠিক সেইভাবে আপনারাও যত্ন পাবেন এখানে। মানবতাবোধের দিক থেকে কোন বঙ্গই পিছিয়ে নেই। এরা মরছে বাঁচতে। এদের মৃত্যুপাগল মানুষের সংখ্যা যেমন সীমাবদ্ধ, ওদের অপরাধপ্রবণ মানুষের সংখ্যাও তেমন সীমাবদ্ধ। একটা character মহনীয় হতে চায়, আরেকটা character নিন্দনীয় হতে চায় ; এই যা পার্থক্য। এটা সর্ববাদিসম্মত ধর্ম নয়, অবস্থাবিপাকে স্বাভাবিক ভাবে ঘটছে।

আমি লজ্জিত হলাম। লজ্জার কথা এই যে ভারত-সীমান্তে বিপন্ন মানুষকে কিছু লোক এইভাবে প্রতারিত করছে। অবশ্য অতীতের পৃষ্ঠা উল্টে আরও ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখলাম। বিশ বাইশ বছর আগে আশ্রয়প্রার্থীদের ওপর অপরাধপ্রবণ ভারতীয়রা যেভাবে অত্যাচার করেছে, তার দু'চারটে খবর সংবাদপত্রেও বেরিয়েছে। তার মধ্যে বহু যুবতীকে প্রলোভন দেখিয়ে শেয়ালদহ অথবা অন্যান্য স্থান

থেকে নিয়ে গেছে, তাদের বিক্রি করেছে অবাঙ্গালী ভারতীয়দের কাছে ; অনেক নারীকে নিন্দনীয় জীবনযাপনে বাধ্য করেছে। ঐ অবস্থা যে এবারও দেখা দেবে না তারই বা নিশ্চয়তা কি! সরকারের হৃদয়হীন উদাসীনতা, অপর্যাপ্ত অকিঞ্চিৎকর লোক-দেখানো সাহায্য মানুষকে বাঁচার তাগিদে কোথায় নিয়ে দাঁড় করাবে তারই বা ঠিক কি! সেদিন বাস্তুত্যাগীদের বাঁচবার প্রতিশ্রুতি ছিল, আজকের বাস্তুত্যাগীরা যে খুবই অসহায়। তাই আতঙ্ক জাগল মনে।

সারা রাত ফজলুর আমার পাশে বসে ছিল। সকালবেলায় তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কোথায় যাবে ফজলুর ভাই ?

কোথাও যাব না। আমি বাঙলাদেশেই থাকব। ভারতে ভিক্ষাপাত্র হাতে করে গিয়ে যদি ভিক্ষার বদলে লাঞ্ছনা লাভ হয়, তার চেয়ে মাটি-মায়ের সম্মান রক্ষা করতে মাটি-মায়ের কোলে আমার রক্তের ছোপ দিতে দোষ কি! আমি তো অসহায় অবলা নই, বৃদ্ধ নই, শিশু নই। আমার শক্তি আছে লড়বার। আমি লড়ব ও মরব, তবুও দেশের মাটি ছেড়ে এক পা-ও যাব না।

তোমার প্রশংসা করছি।

তবে আমার আরও আশঙ্কা আছে। এবিষয়ে আমি অনেক সময় আওয়ামী লীগের নেতাদের বলেছি, তারা গ্রাহ্য করে নি আমার কথা। আমার মনে হয়েছে, মুখোমুখী লড়াইতে খানদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারা যাবে না। আমাদের যুদ্ধের কৌশল বদল করতে হবে। দেখা যাচ্ছে, সত্যিই আমরা ওদের সঙ্গে পারছি না। আমাদের হটে আসতে হচ্ছে প্রায় সব ক্ষেত্রেই।

কিভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করা হবে তা কি তুমি ভেবে দেখেছ ?

ফজলুর কোন কথা না বলে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল দেওয়ালের দিকে। টেনসিলে ছাপা রয়েছে “নকশালবাড়ির পথ আমাদের পথ”।

তারপরই বলল, এই হল পথ। ভারতের পক্ষে যা প্রযোজ্য, বাঙলাদেশের পক্ষেও তাই। এখনও আমাদের হাতে যথেষ্ট অস্ত্র আছে। তার সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে ঐ একই ভাবে। শাসন-ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে ক্ষমতালাভের ঐটি একমাত্র উপায়।

আমি বললাম, তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। নকশালবাড়ির পথ হল গেরিলা যুদ্ধের পথ। আমি বলতে চাই, এই পথই ঠিক পথ ; কিন্তু it is a way to reach goal, কিন্তু এর সঙ্গে আরও কয়েকটি অবস্থা-সৃষ্টির প্রয়োজন। গেরিলা যুদ্ধের তালিম না নিলে সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় না। (পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গেরিলা যোদ্ধাদের অন্যতম হল চীনের মাও সে-তুং আর কিউবার কাস্ত্রো ও চে গুয়েভারা।) তারাও বলেছে, গেরিলা যুদ্ধ না হলে শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয় ; কিন্তু তারাই আবার বলেছে গণফৌজ দরকার। তোমাদের এখানে গেরিলাদের পাশাপাশি গণফৌজ যদি গড়ে ওঠে তাহলে বলব, হাঁ, তোমার মতামতই আমার অভিমত।

ভারতে কি গণফৌজ গড়ে উঠেছে ?

আমার বিশ্বাস গড়ে ওঠেনি। গেরিলা যুদ্ধের পাশাপাশি গণফৌজ গড়ে তুলতে না পারলে সাফল্য সুদূরপরাহত। তোমাদের ক্ষেত্রেও সেটা সমানভাবে প্রযোজ্য। বর্তমানে যুদ্ধ যে পর্যায়ে আছে, তাতে সাময়িক পরাজয় নিশ্চয়ই হবে। অধিক শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখী যুদ্ধ পরাজয়কে সাদরে ডেকে নেয়। এখানেও তাই হবে। তবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কাগুজে বাঘ, সৈন্য তাদের পেশাদার ও ভাড়াটিয়া, তাদের আঘাতের পর আঘাত করলেই বুঝতে পারবে ওরা 'কাগুজে বাঘ', তখন লড়াই করেই মুক্তিফৌজ লড়াই করতে শিখবে।

ফজলুর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, এবার চলুন। আর

এখানে থেকে লাভ নেই। যতটা পথ এগোতে পারব, ততই দেখতে পারব, জানতে পারব।

পথ চলতে থাকি।

চলতে চলতে ফজলুর বলল, যুদ্ধের একটা চরিত্র আছে।

নিশ্চয়। সেই কথাই তো তোমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছি। যুদ্ধের চরিত্রের ওপর যুদ্ধের পরিণতি নির্ভর করে। তোমরা তখনই জয় নিশ্চিত জানবে যখন যুদ্ধটা হবে জনযুদ্ধ।

আমার কথাও তাই। দেওয়ালে নকশালবাড়ির স্লোগান দিলেই এই যুদ্ধ জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হবে না বলেই মনে করি।

অমল বলল, স্লোগানে জনতাকে আকৃষ্ট করা সম্ভব। কিন্তু আকৃষ্ট জনতাকে কাজে নিযুক্ত করাই হল বড় সমস্যা।

নূরু মিঞা বলল, দেশের সব লোক চায় খানরা বিদায় হোক।

সেটা তো মনের কথা। কাজের বেলায় দেখা যাচ্ছে খানরা মোটেই বিদায় নিতে উৎসুক তো নয়ই, বরং আরও ভাল করে বাঙলার বুকে চেপে বসতে আগ্রহী। তাদের বিদায় করতে হবে, এটা হল প্রবলেম; তার সমাধান খুঁজতে হবে। শোন ফজলুর, তুমি তো গেদে পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছ?

ঠিক গেদে পর্যন্ত নয়। ক'দিন কলকাতাতেও ছিলাম। মনে হল, পশ্চিম বাঙলার মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচয় করা প্রয়োজন। সেখানকার মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে জানতে হবে কতটা তাদের দরদ রয়েছে আমাদের প্রতি। কিন্তু নিরাশ হয়েছি জনাব। যদি কোথাও বাঙলাদেশ থাকে তা রয়েছে পূর্ববঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গে নয়।

তোমার কথা বুঝতে পারলাম না।

কলকাতা ছিল সারা বাঙলার প্রাণকেন্দ্র। বর্তমানে কলকাতাকেই আমরা পশ্চিম বাঙলার প্রাণকেন্দ্র মনে করে থাকি। কলকাতার পথে ঘুরতে ঘুরতে মনে হল, আমরা লাহোর

অথবা করাচীতে বাস করছি। বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি—যাতেই উঠেছি, তাতেই বাঙলা ভাষা অচল। হিন্দী বলতে হবে। পশ্চিম বাঙলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় বাঙলা ভাষা অচল। লজ্জায় মুখ তুলতে পারছিলাম না। আমাদের রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের বাঙলাদেশের এই অবস্থা ঘটেছে, তা বুঝতেও পারিনি। পূর্ব-বাঙলার মানুষ যদি বাঙ্গালী না হত, পশ্চিম বাঙলার বাঙ্গালীরা ভবিষ্যতে বাঙ্গালীত্ব দাবি করতে পারত না। একটা খিচুড়ি সংস্কৃতিকে বুকে নিয়ে পশ্চিম বাঙলার বাঙ্গালীরা অতীতকে বোধ হয় ভুলেই যাবে।

বললাম, কলকাতা কসমোপলিট্যান শহর। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের লোক সেখানে বাস করে; সেজন্য হিন্দীর প্রচলন কিছুটা স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে।

কেন হবে! আমরা, মানে বাঙ্গালীরা, যখন করাচী যাই, তখন তো আমাদের উর্দু আর ইংরেজি বিনা গতি থাকে না। সেটাও তো কসমোপলিট্যান শহর। তারা তো বাঙলায় কথা বলে না! তেমনি ঢাকায় এলে ওদের বাঙলায় কথা বলা ভিন্ন আর গতি থাকে না। তেমনি পশ্চিম বাঙলার মানুষ বোম্বাই গেলে সেখানে বাঙলা ভাষায় কথা না বলে যেমন অন্য ভাষায় কথা বলতে বাধ্য হয়, তেমনি বোম্বাইওয়ালা বাঙলায় এলে তারাও বাঙলায় কথা বলবে। নইলে সংহতি কি করে সৃষ্টি হবে? কলকাতা এবং তার কোন কোন উপকণ্ঠে গিয়ে আমার মনে হয়েছে আমরা করাচী অথবা লাহোর এসেছি। বাঙলাদেশ এটা নয়।

বাঙ্গালীরা সবাইকে সাদরে গ্রহণ করতে পারে, সেজন্য আমরা এবিষয় নিয়ে মোটেই চিন্তা করি না।

ফজলুর উত্তেজিতভাবে বলল, আপনিও যেমন বাঙ্গালী, আমিও তেমনি বাঙ্গালী। আমাদের গায়ে একই রক্ত বইছে। আমরাও

আপনাদের মত সাদরেই ডেকে নিয়েছিলাম উর্দুভাষীদের ; কিন্তু তাদের পরিচয় হল শোষক, আপনাদের হিন্দীভাষীদের পরিচয়ও শোষক। পশ্চিমবঙ্গে অনেক উর্দুভাষী মুসলমানদের দেখেছি করাচীর সংবাদ শুনতে রেডিও খুলে বসে আছে, ভারত থেকে যে উর্দু সংবাদ দেওয়া হয় তা তারা শোনে না। তাদের নাড়ীর টান ভারতে নেই, রয়েছে ঐ করাচীতে যারা আমাদের দুশমন।

সব জায়গাতে এটা ঘটে। বাঙ্গালী শোষক নেই বলতে চাও ?

তাও আছে। আপনাদের ওপারে যেমন আছে, তেমনি আছে আমাদের এখানেও ; কিন্তু স্বদেশী শোষকদের সঙ্গে লড়াই করা আর বিদেশী শোষকদের সঙ্গে লড়াই করা এক কথা নয়।

আমরা ওদের বিদেশী মনে করি না।

আমরাও মনে করতাম না। আমাদের ভুল ভেঙ্গেছে।

কারণ ভূগোল তোমাদের ভুল সংশোধন করার সুযোগ দিয়েছে। পাঁচহাজার কিলোমিটার দূর থেকে এসে যারা শাসন চালায়, তারা বিদেশী শোষক ; কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে বিহারী অথবা উৎকলী, তাদের আমরা বিদেশী মনে করতে পারি না।

ফজলুর বলল, কথাটা অন্যায্য নয় কিন্তু আপনাদের অবস্থা আমাদের চেয়েও খারাপ।

সেজন্য অশান্তি অব্যাহত গতিতে চলেছে! চলবেও আরও বহুকাল।

আমরা প্রতিকারের জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছি। আমরা ভুলে গেছি হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃশ্চানের কথা। আমরা স্থির করেছি বাঙ্গালী একটা নেশ্যন। এই নেশ্যনের সমান অংশীদার সবাই। আপনারা সংঘবদ্ধ হতে পারেন নি। আপনারা নানা দলে-উপদলে বিভক্ত, কোন সময়ই নেতৃত্বের মোহ ছাড়তে পারেন নি, কমন প্রোগ্রাম নিতে পারেন নি, যার ফলে আপনাদের বাঙলার ঘরে ঘরে বেকার, ঘরে ঘরে অশান্তি।

চুপ করে গেলাম, কোন উত্তর দিলাম না।

সামনে ধু-ধু করছে মাঠ।

কোথাও কোথাও হাল দেওয়া হয়েছে। ক'দিন যা বৃষ্টি হয়েছে তাতে মাটি ভিজেছে, চাষীরা মাটিতে হাল দিতেও নেমেছে।

আমরা সড়কপথ ছেড়েছি, রেলপথ ছেড়েছি, গ্রামের মাঠে মাঠে মাঝ দিয়ে চলছি।

যশোর আর কতদূর ?

অমলের প্রশ্নের উত্তরে হানিফ মাস্টার বলল, আরও একদিন তো চলতে হবে। তবে এবার দিনের বেলায় পথ চলা হবে না। এবার রাতের বেলায় পথ চলতে হবে। যে-কোন সময় খানরা আক্রমণ করতে পারে।

অমল বলল, কি করে আক্রমণ করবে ? রাস্তা তো অনেক দূর।

বললাম, আজকাল কামানের রেনজ্ কতটা জানো ? পাঁচ মাইল দূর থেকে কামান দাগলে আমাদের এখানেই শেষ শয্যা নিতে হবে।

ফজলুর বলল, আপনাদের কোন ধারণাই নেই। ঢাকা শহর দেখলে বুঝতে পারতেন। তিনতলা চারতলা বাড়িগুলো ছাতুর মত গুঁড়ো হয়ে গেছে কামানের গোলায়। গুলীতে গোলাতে অনেক মরেছে। আরও মরেছে বাড়ি চাপা পড়ে; বিধ্বস্ত স্তূপের তলায় কত যে মৃতদেহ আছে, তা আজও বোধহয় খানরা স্থির করতে পারে নি। মাত্র একটি রাতের ঘটনা। ঢাকা থেকে দলে দলে মানুষ বুড়ীগঙ্গা পেরিয়ে জিন্‌জিরাতে আশ্রয় নিয়েছিল। জিন্‌জিরা জানেন তো। এক সময় দুর্গ ছিল। যে দুর্গে মীরজাফর সিরাজের বেগমকে বন্দী করে রেখেছিল। সেই জিন্‌জিরায় আশ্রয় নিতে গিয়েছিল বহু নর-নারী। কিন্তু সেখান থেকে একটি মানুষও জীবিত ফিরে

আসেনি। বিমান আক্রমণে, গানবোটের আক্রমণে আর স্থলবাহিনীর আক্রমণে সবাইকে মাটিতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল চিরকালের জন্য। কয়েকদিন ধরে বুড়ীগঙ্গার পানিতে শুধু দেখা গেছে গাদা গাদা লাশ ভেসে যাচ্ছে। কল্পনাও করতে পারবেন না। যাকে বলে গণহত্যা।

বললাম, ক্ষমতা হারাবার ভয়ে এহিয়ার এইটিই একমাত্র পথ।

দেখুন, এহিয়া পাঠান। পাঠানরা শুনেছি বীর হয়; কিন্তু বুদ্ধিটা একটু কম হয়। এহিয়ার সাড়ে সাতকোটি মানুষের আড়াইকোটিকে খতম করে পশ্চিম পাকিস্থানকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করে গড়ে তোলার এই একটি পথই আছে, আর সেই পথই অবলম্বন করছে। ভেবেছিল ত্বরিতে ত্রাস সৃষ্টি করে বাঙ্গালীর মনোবল ভেঙ্গে দেবে, তা আর হল না।

এমন অদ্ভুত চিন্তা কোন রাষ্ট্রপ্রধান করতে পারে কি?

পাঠান জঙ্গীবাদীরা তা পারে। আমাদের People পত্রিকার সম্পাদক আবেদুর রহমান একটা মজার গল্প বলে থাকেন। উনি বলতেন, পাঠানদের বীরত্ব যথেষ্ট থাকলেও আক্কেল নামক বস্তুটি কম। কোন একজন পাঠানের বাড়িতে চোর ঢুকেছিল। বাড়ির মালিক চোরকে ধরে ফেলল। বউকে বলল, দাঁড় দাও। দড়ি আনতেই বাড়ির মালিক পাঠান লোকটি চোর পাঠানকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে থানায় গেল এজাহার দিতে।

দারোগাকে বলল, হুজুর আমি চোর ধরেছি। তাঁকে বেঁধে রেখে এসেছি। আপনি চলুন।

প্রশ্ন করল দারোগা, কি ভাবে বেঁধেছ?

পাঠান বাড়ির মালিক বলল, দড়ি দিয়ে চোরের পা বেঁধে রেখে এসেছি।

হাত বাঁধনি?

না হুজুর। হাত তো বাঁধিনি!

তুমি একটা মস্ত বেকুব। চোর হাত দিয়ে পায়ের বাঁধন খুলে এতক্ষণ নিশ্চয়ই পালিয়ে গেছে। তুমি দেখে এস। যদি চোর এখনও থাকে, তার হাত বেঁধে রেখে এস।

পাঠান বাড়িওলা থানা থেকে সোজা চলল বাড়ির পথে। অর্ধেক পথ এসেই কি যেন তার মনে হল। বাড়ি না গিয়ে আবার থানায় হাজির হল।

দারোগা বলল, কি? চোর আছে এখনও?

জানি না হুজুর। আমি আধা পথ থেকে ফিরে এসেছি। তবে চোর পালায় নি। আপনি চলুন।

কি করে বুঝলে চোর পালায় নি?

পাঠান বাড়িওলা বলল, কথাটা খুব সহজ। আমিও পাঠান, চোরও পাঠান। আমার মাথায় যে বুদ্ধি আসেনি, সেই বুদ্ধি ঐ চোরের মাথায়ও আসেনি। চোর পালাতেই পারে না।

এই হল পাঠানের বুদ্ধি। এহিয়া পাঠান। তার বুদ্ধি হল আড়াইকোটি মানুষ মেরে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্থানের জনসংখ্যা সমান করে দিলেই বাঙ্গালীদের প্রাধান্য নষ্ট হবে। তখন জঙ্গীশাসন চালাতে আর অসুবিধা হবে না।

বললাম, এহিয়া দাবি করছে সে নাদিরশাহের বংশধর।

দাবি করলেই যদি তা সত্য হয়, তা হলে মিথ্যা বলে কিছুই থাকে না। পাঠান আর ইরাণী এক রক্ত এটা যদি সত্য হত, তা'হলে ইরাণ আর আফগানিস্থান একটি রাষ্ট্র হত। এহিয়া যে পিতৃপুরুষের পরিচয় দিতে পারবে না, তা কেউ ভাবতেও পারে না। এ রকম বুদ্ধি না হলে কি আর এহিয়া পাঠান!

জুলফিকার আলি ভুট্টো এহিয়াকে সাহায্য করছে।

আমাদের নেতা শেখ সাহেব ভুট্টোকে বলেছিলেন, ভুট্টো সাহেব, তুমি ভেবেছ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে জঙ্গীবাদীর সাহায্যে। তা হবে না। আমাকে ধ্বংস করতে তথা বাঙলার সর্বনাশ করতে এহিয়া খান

তোমার সাহায্য নিয়েছে। আমি যদি ধ্বংস হই, তুমিও ধ্বংস হবে। তোমাকে যন্ত্ররূপে সামরিক জুণ্টা ব্যবহার করছে, বাঙলার সর্বনাশ করেই তোমার সর্বনাশ করবে। এই সাধারণ সত্য তুমি বেশ বুঝতে পারছ। সিরাজকে ধ্বংস করতে মীরজাফরকে ব্যবহার করেছিল ইংরেজ, অবশেষে ইংরেজ মীরজাফরকেও ধ্বংস করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী জঙ্গীবাদীদের এইটেই হল মূল নীতি। তুমি সাবধান। পাঠানদের চক্করে পড়ে তুমিও ঘোল খাবে ভুট্টোসাহেব। বুঝলেন তো। আজ অথবা কাল। ভুট্টোকেও যথেষ্ট মূল্য দিতে হবে। সিন্ধী ভুট্টোর আক্কেলটা একটু কম।

বললাম, এ রকম ঘটাই স্বাভাবিক।

হানিফ মাস্টার অনেকটা এগিয়ে গেছে। তার পেছনে চলেছে অমল ও অবিনাশ। আমাদের পেছনে নূর মহম্মদ। নূর মহম্মদ জোরে পা ফেলতে ফেলতে আমাদের পাশে এসে গেল। পাশাপাশি চলতে চলতে নূরু মিঞা বলল, শুনলাম বহু লোক ভারতে আশ্রয় নিয়েছে!

ফজলুর বলল, নিয়েছে, নিচ্ছে ও নেবে। সংখ্যা তাদের যদি এক কোটি হয় তাতেও আশ্চর্য হবেন না।

আমি বললাম, মুসলীম লীগের ভূমিকা কি?

মুসলীম লীগের বিশেষ কোন প্রভাব নেই। যারা উগ্র হিন্দু-বিরোধী এবং শোষণ-ব্যবস্থার সমর্থক, তারাই লীগের সমর্থক। এদের অধিকাংশই হল বয়স্ক ব্যক্তি, মোল্লা-মুছল্লী। যারা স্বাধীনতা-লাভের পর জন্মেছে, অথবা স্বাধীনতা-লাভের দু'চার বছর আগে জন্মেছে তারা বিশ্বাস করে না লীগপন্থীদের। তবুও লীগের দালাল যথেষ্ট আছে। তাদের একটা অংশ খানদের সমর্থক। তাদের সাহায্যে খানরা বীভৎস অত্যাচার করার সুযোগ পেয়েছে। আমরা ওদের সম্বন্ধে সতর্ক। তবে বেশির ভাগ লীগপন্থী নির্বিকার। কারণ, তারাও বাঙ্গালী, আর খানদের বুলেট মুসলীম লীগ আর আওয়ামী

লীগের পার্থক্য করতে জানে না। বুলেটের মুখে সবাই সমান। তারা বাঙ্গালী বলেই বাঙলার দাবি একেবারে অস্বীকার করতেও পারে না। মনে মনে তারাও তো বাঙ্গালী।

তবুও তো তোমরা সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে একটা মীমাংসাও করতে পারতে, কিম্বা লড়াই চালাতে পারতে।

ফজলুর দাঁড়িয়ে গেল।

আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, আপনি আশ্চর্য কথা বলছেন। আমরা শতকরা অষ্টানব্বই জন। আমরা যা পারব তা ওরা পারবে না। মনে করুন, মুসলীম লীগকে আমরা লড়াই করতে ডাকলাম, ওরা তা করবে না। ওদের চরিত্র আমাদের জানা আছে। ওরা পয়সার জন্য যে-কোন অপকাজ করতে পারে। যে-কোন সময় পেছন থেকে আমাদের আন্দোলনকে ছুরি মেরে বানচাল করে দিতে পারে। তার প্রমাণ তো হাতে-হাতে আমরা পেয়েছি। মুসলীম লীগের শয়তানদের কয়েকজন আওয়ামী লীগ সমর্থকদের আর হিন্দুদের চিনিয়ে দিচ্ছে খানদের। খানরা যে অকল্পনীয় অত্যাচার করছে, তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। মানুষ মারছে, শিশু নারী হত্যা করছে। নারীর মর্যাদা নষ্ট করছে। এসব করছে লীগের আর জামাতের সহযোগিতায়। এই লীগের সঙ্গে হাত মেলালে আমাদের লড়াই ব্যর্থ হবেই।

তোমরা তো একটা ন্যাশন্যাল গভর্নমেণ্ট গঠন করতে পারতে।

তাও সম্ভব নয়। মুসলীম লীগের সঙ্গে হাত মেলানোর অর্থ হল বাঙলার স্বাধীনতা-লাভের আশা চিরকালের জন্য কবরে ঠেলে দেওয়া। মুসলীম লীগ হল প্রতিক্রিয়াশীলদের মূল ঘাঁটি। ওদের চরিত্র যারা জানে না, তারা এই সব অসম্ভব প্রস্তাব দেবে। আমরা পাকিস্থানী খানদের শোষণ থেকে বাঁচতে চাই। শুধু পাকিস্থানী শোষণ নয় জনাব, আমরা সবরকম শোষণ থেকেই মুক্তি চাই। মুসলীম লীগকে কোলে টেনে নেবার অর্থ হল পাকিস্থানী শোষণ

থেকে মুক্তি পেয়ে আবার নতুন আরেক দল শোষকের হাতের ক্রীড়নক হওয়া। এই শোষকরা অবশ্যই বাঙ্গালী হবে, কিন্তু আমরা শোষণ-মুক্ত গণতন্ত্রী সরকার চাই।

যুদ্ধ যে অনেকদিন চলবে।

জানি। প্রথমে যারা মনে করেছিল সহজেই আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হবে, তারা ভুল করেছিল। যে ভুল আওয়ামী লীগ নেতারা প্রাথমিক অবস্থায় করেছিল, সে ভুল সংশোধন করবে দেশের লোক। যুদ্ধের কৌশলও বদলাবে।

কিন্তু যুদ্ধ বেশিদিন চললে এর পরিণাম দু'রকম হতে পারে। উগ্রপন্থীরা নেতৃত্বে আসবে, গণতন্ত্রের স্বপ্ন চিরতরে সমাধিস্থ হবে, নইলে ভিয়েতনামের অবস্থা হবে।

ফজলুর শুধু হাসল।

কিছুটা পথ চলার পর বলল, খানদের মত আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত শিক্ষিত সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঙলার স্বাধীনতা আনতে হলে দুটো অবস্থাকেই মেনে নিতে হবে। যারা স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনবে, তারা গদি-আঁটা-চেয়ারে-বসা মানুষ যে নয়, তা আমরা বুঝেছি। এবার নেতৃত্ব যাবে সাধারণ মানুষের হাতে. সাধারণ মানুষ দলে দলে আসবে খানদের খতম করতে। যদি বিদেশী কোন শক্তি এই যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে, তা হলে যুদ্ধ কোনক্রমেই ভিয়েতনামে পরিণত হতে পারে না। পুঁজিবাদী শক্তি তার হাতিয়ার বিক্রির উপনিবেশ তৈরী করতে চেষ্টা নিশ্চয়ই করবে। সেটা দুঃখজনক হলেও আমাদের তা মেনে নিতেই হবে অত্যধিক অনিচ্ছায়।

চীন কেন এহিয়াকে সাহায্য করছে? চীন গণমুক্তি চায়। এহিয়া জঙ্গীবাদী স্বয়ম্ভু প্রেসিডেন্ট। তার প্রতি কোন জনসমর্থন নেই। বাঙলাদেশের কথা বাদ দিন, পাকিস্থানীরাও তাকে প্রেসিডেন্ট পদে বসায় নি। বন্দুকের কুঁদো দেখিয়ে এহিয়া গদিতে কায়েম হয়েছে। অথচ এসব জেনেও চীন কেন এহিয়াকে সমর্থন করছে?

ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে এটাও চীনের ভারত-বিদ্বেষ। চীন বিশ্বাস করে ভারত আমেরিকা ও রাশিয়ার তাঁবেদার। ভারত বাঙলাদেশকে সাহায্য করছে, সেজন্য চীনও এহিয়াকে সাহায্য করছে। চীনের মতিগতি ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমাদের সমর্থক তো ভাসানী। ভাসানী হল চীনপন্থী। চীন ভাসানীর আবেদন কেন অগ্রাহ্য করছে ?

ফজলুর গম্ভীরভাবে বলল, ভারতের সংবাদপত্রে ভাসানীর যে ছবি আপনারা দেখেছেন, সেই ছবির দিকে তাকিয়ে আপনারা মতামত দিচ্ছেন। যারা ভাসানীকে ভাল করে জানে, তারা বলবে —ভাসানী কোন পন্থীই নয়। বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটও বলতে পারেন, আবার সুযোগ-সন্ধানীও বলতে পারেন। তবে ভাসানী হল উগ্র বাঙ্গালী। বাঙলার স্বার্থে সে অনেক কিছুই করতে পারে। সব কথা তো পথে যেতে যেতে বলা যায় না, তবুও ভাসানীর ভূমিকা নিন্দনীয় নয়, এইটুকুই বলা যায় ; কিন্তু তাকে চীনপন্থী বলে মর্যাদা বৃদ্ধি করা যায় না। ওটা আপনাদের ভুল ধারণা।

চুপ করে যেতে হল।

ফজলুর যা বলছে তার সত্যতা যাচাই করার কোন উপায় নেই, অথচ তার কথা মেনেও নিতে মন চায় না।

মাঠ পেরিয়ে গ্রামে প্রবেশ করলাম।

বেশ বড় গ্রাম।

গ্রামের মানুষ আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে।

একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন ?

নূরু মিঞা বলল, যশোর।

আর যাবেন না। এখান থেকে যশোর সতের মাইল। যে-সব খবর আসছে, তাতে আর এগিয়ে না যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আমরাই গ্রাম ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় যাবার চেষ্টা করছি। মেয়েছেলেদের তো পাঠাতে আরম্ভ করেছি। বেলা পড়ে এসেছে।

আর যাওয়া উচিত নয়। আমাদের একদল তো আজ রাতেই মহেশপুর হয়ে ভারতে যাবে মেয়েছেলে রেখে আসতে। আপনারা আর এগিয়ে যাবেন না।

আমাদের থামতে হল।

হানিফ মাস্টার বলল, আজ আপনাদের গ্রামেই থাকতে হবে। এগিয়ে যাওয়া সম্ভব না হলেও পিছিয়ে যেতেও পারব না।

তা থাকতে পারেন। আমাদের ইজাতুল্লার বাড়ি খালি আছে। বিশ্রাম করতে পারবেন। ওরে রওশন, দত্তদের বাড়িতে এঁদের নিয়ে যা। সেখানে বিশ্রাম করতে পারবেন। সামনে টিউব-কল, পানির অভাব নেই। সলিমের দোকান থেকে খাবারও পাবেন। বীরেনকাকা আছে, বিছানা-টিছানা তার কাছেও পাবেন।

রওশনের নির্দেশমত কয়েক ধাপ এগোতেই রওশন বলল, শুনতে পাচ্ছেন ?

বললাম, হুঁ। বোমার শব্দের মত কয়েকটা আওয়াজ শুনলাম।

খানদের সঙ্গে লড়াই হচ্ছে যশোরে। সতর মাইল দূর থেকেও শব্দ শোনা যাছে।

সবাই বলছে আর এগোনো নিরাপদ নয়। এমত অবস্থায় কি করা উচিত ?

প্রশ্নটা করেছিল অবিনাশ।

অমলের মনেও এই একই প্রশ্ন।

উত্তর দিলাম, আমার মনে হয় যারা সাহস হারিয়েছে তাদের আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। এবার স্থির করা যাক, কে কে এগোবে, আর কে কে পেছোবে। দলবদ্ধ হয়ে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। যে যে যেতে রাজী, তারা হাত তুলুক।

ফজলুর সবার আগে হাত তুলল।

অবিনাশ ও হানিফ শেষ পর্যন্ত হাত না তুললেও ইতস্ততঃ করে ; অমল ও নূরমহম্মদ হাত তুলেছিল। আমি সঙ্গী হিসাবে অমলকেই

শ্রেয় মনে করি। নূর মহম্মদকে বললাম, আপনার বন্দুক আমাদের বিপদ ডেকে আনবে। আপনি এখানে থাকবেন সংবাদ লেন-দেন ও যোগাযোগ রক্ষা করতে। অবিনাশ, তোমার পক্ষে দর্শনার পথে ফিরে যাওয়াই ভাল। অন্ততঃ সবার বাড়িতে তুমি সংবাদ পৌঁছে দিতে পারবে। আর হানিফসাহেবও যশোর-প্রত্যাগত লোক; ওর এগিয়ে যাবার দরকার কি, উনি তো মোটামুটি অনেক কিছু দেখেই এসেছেন।

আমার যুক্তি সবাই স্বীকার করল।

খাবারের ব্যবস্থা করতে বের হল নূর মহম্মদ।

খেয়েদেয়ে সবাই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। ফজলুর আমার পাশে শুয়ে। সবাই ঘুমে অচেতন, একমাত্র ফজলুর জেগে রয়েছে। বাঙলাদেশের ঘড়িতে রাত বারটা বেজে গেছে। গ্রামের কুকুরগুলোও কোন আওয়াজ তুলছে না। শেয়ালগুলোর গলায় কেউ কর্ক এঁটে দিয়েছে বোধহয়। শেয়ালের গলার শব্দও শোনা যাচ্ছে না। একমাত্র রাতের প্রহরী প্যাঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে। গভীর নিস্তব্ধতাকে ভয়ঙ্কর করে তুলছে প্যাঁচার ডাক। আমি ঘুমোতে পারছি না। পাঁচ ছ'দিন যাদের সঙ্গে চলাচল করেছি অন্তরঙ্গভাবে, তাদের সঙ্গ ছাড়া হয়ে আমাকে বের হতে হবে ভয়ঙ্কর পরিণতি জেনে; সেজন্য মানসিক একটা বেদনাপূর্ণ উত্তেজনা অনুভব করছিলাম।

এমন সময় ফজলুর বলল, জেগে আছেন কি?

বললাম, হুঁ।

এই রাতের বেলায় বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়?

মন্দ কি। আরও চার-পাঁচ ঘণ্টা রাত বাকি। আমরা এই সময়ে দশ মাইল পথ এগিয়ে যেতে পারব। যশোরের কাছাকাছি যেতে পারব। জ্যোৎস্না রাত, পথ চলতে বিশেষ কষ্টও হবে না।

ফজলুর উঠে বসল।

বলল, তাহলে আর দেরি করে লাভ নেই।

আমার সঙ্গী একজনও তো যাবে। তাকেও ডেকে নিতে হবে। বাকি সবাইকে জানিয়ে যেতে হবে।

নিশ্চয়। আমি প্রস্তুত। আমার লুঙ্গি সম্বল। আর কিছু তো নেই।

আমারও সেই অবস্থা। এই অমল, ওঠ। আমরা এখুনি রওনা হব।

অমল ঘুমের ঘোরে বলল, সকাল হয়েছে কি ?

সকাল হলে পথ চলা যাবে না। রাতের বেলায় আমাদের চলতে হবে। রাতে চলাই নিরাপদ।

অমল লাফিয়ে উঠে বলল, চলুন।

জিনিসপত্র ঠিক করে নাও। অবিনাশ, শুনছ ? আমরা রওনা হচ্ছি। প্রোগ্রাম অনুসারে কাজ কর। আবার কলকাতা গিয়ে দেখা হবে।

অবিনাশ পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমের ঘোরেই বলল, আচ্ছা।

চুপি চুপি তিনজনে গ্রামের মেঠো পথ ধরে বের হলাম। কতকগুলো নেড়ী কুকুর রাস্তার ধারে শুয়ে ছিল। লোক-চলাচলে তাদেরও ঘুম ভেঙ্গেছে। নেহাত অজ্ঞাতভাবে তারা আমাদের কোনক্রমেই যেতে দিতে রাজী নয়। তাদের চিৎকারে পাশের বাড়ি থেকে একজন হাঁক দিল, কে যায় ?

ফজলুর বলল, আনসার।

ব্যস্। চুপ। আর কোন প্রশ্ন নেই। আমরাও দেখতে দেখতে গ্রাম পেরিয়ে মাঠে এসে গেছি। গতবছর পাট কাটার পর পাটগাছের শক্ত শক্ত গোড়া তীক্ষ্ণ ফলার মত মাথা উঁচু করে রয়েছে। দ্রুত পা ফেলতে বার বার বাধা পাচ্ছিলাম। পায়ে জুতো না থাকলে পা যে ক্ষত-বিক্ষত হত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কোন কোন মাঠ চষা। সেখানেও পায়ে পায়ে বাধা। লাফিয়ে

লাফিয়ে চলতে হচ্ছিল। মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে এগোচ্ছি। অনেকক্ষণ কারও মুখে কোন কথা নেই। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল ফজলুর। সে-ই বলল, বাঙলাদেশ তো দেখছেন!

বললাম, জন্ম থেকেই তো বাঙলাদেশকে দেখছি, ভাই। এ তো নতুন কিছু নয়।

সেই বাঙলা আর এই বাঙলা কি এক?

তা নয়। অনেক বদল হয়েছে।

কাল আপনি অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরও আমি সাধ্যমত দিয়েছিলাম। সবটা যে আপনার মনঃপূত হয়নি তা বুঝতে পারছিলাম। আপনারা যেমন বাঙলাদেশে এসেছেন, আমিও তেমনি এই সুযোগে পশ্চিম বাঙলা দেখে এলাম। আমরা কেউ-ই তামাশা দেখতে আসিনি বা যাইনি। আমরা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে পরিচয় করতেই বেরিয়েছি, নয় কি? একদিন আপনাদের একখানা দৈনিক কাগজে পার্লামেণ্টের একজন সদস্যের প্রবন্ধ পড়ছিলাম। উনি লিখেছেন, ধর্ম ও ভারত-বিদ্বেষ পাকিস্থান সৃষ্টি করেছে। ধর্ম যে উন্মাদনা সৃষ্টি করে তা সাময়িক। সেই উন্মাদনা কেটে গেছে, পূর্ব-পাকিস্থানীদের সামনে দেখা দিয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অনাচার। ইংরেজ আমলে কিছু হিন্দু জমিদার মহাজনের ও মুসলমান জমিদার মহাজনের শোষণে বাঙলার মুসলমান বিপর্যস্ত হয়েছিল, সেজন্য তারা পাকিস্থান চেয়েছিল। বর্তমানে তারা দেখছে নতুন একটা শোষক-শ্রেণী জন্ম নিয়েছে। তারা হল পশ্চিম-পাকিস্থানী পুঁজিবাদী, যাদের সাহায্য করছে জঙ্গীশাসকরা। এই অবস্থায় পূর্ব-পাকিস্থানের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভেঙ্গে পড়েছে, যার ফলে এই বিদ্রোহ।

বললাম, তাঁর বক্তব্য খুবই সঙ্গত।

আমিও স্বীকার করি। তারপরই উনি লিখছেন, বাঙলাদেশ যা বলছে, অর্থাৎ ধর্ম-নিরপেক্ষ সমাজবাদী গণতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠন করলে

ভারতের সঙ্গে বাঙলাদেশের সম্পর্ক মধুর হবে, ভারত ও বাঙলা-দেশের মানুষ সুখী হবে,—এই তথ্যটি উনি স্বীকার করেন না। উনি বলছেন, জঙ্গীশাসনের আগেও তো একটা গণতন্ত্রী সরকার পাকিস্থানে ছিল। তখন ভারত-পাকিস্থানের সম্পর্ক মোটেই মধুর হয়নি। আর বাঙলাদেশ কায়েম হলেও তা হবে না।

আমি বললাম, আর কিছু বলেছেন কি ?

বলেছেন, বাঙলাদেশের দুঃখী মানুষদের সহানুভূতি জানান উচিত, সাহায্য করা উচিত, কিন্তু ইন্দিরা সরকারের উচিত নয় বাঙলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া।

বললাম, সবার তো একমত নয়। ভারতের মুসলমানরা ধরতে গেলে নীরবই আছে।

ভারতের মুসলমানদের পক্ষে ওটা স্বাভাবিক। ওরা আজও homeland মনে করে পাকিস্থানকে। যতই যুক্তি দিন, এই মূর্খরা তা মানবে না। কারণ homeland নয়; বাঙলাদেশকে ওরা জানে মুসলমান অন্যায়কারীদের আশ্রয় পাওয়ায় নিরাপদ স্থান, চোরাকারবারের পীঠস্থান; আর পাকিস্থান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে বসে ভারতের সর্বনাশ সাধন সম্ভব হবে না, যদি উভয় বাঙলার সম্পর্ক মধুর হয়। সেজন্যই সামগ্রিকভাবে ওরা বাঙলার স্বাধীনতা চায় না। কিন্তু আপনাদের ঐ পার্লামেণ্টের সদস্য যে প্রবন্ধ লিখেছেন, তা স্ববিরোধী। একবার বলছেন ধর্মের উন্মাদনা আর নেই, অথচ বলছেন ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয় বাঙলা-দেশে। অর্থাৎ ধর্ম বাদ দিলেও ধর্মই প্রভুত্ব করবে, অর্থনীতি নয়। আবার বলছেন, জঙ্গীশাসনের আগে গণতন্ত্রী সরকার থাকা সত্ত্বেও ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত ছিল। কিন্তু সে-সময়ে তথাকথিত গণতন্ত্র ছিল, আর তখন যে পুরাতন হিন্দুবিদ্বেষী ধর্মীয় উত্তেজনা ছিল, সে-কথা উনি বলেন নি। সে-সময় যে গণতন্ত্র ছিল, তাতে সাধারণ মানুষের কতটা অধিকার ছিল তা বলেন নি। কিন্তু

বর্তমানে সাধারণ মানুষ যে ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতন্ত্র গড়ে তুলেছে এবং তাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে এগিয়ে চলেছে, সে সত্যটি কোনক্রমেই উনি স্বীকার করেন নি; সেজন্য বাঙলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেবার বিষয়ে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেছেন।

বললাম, কারণ ঠিক ওটা নয় ফজলুর। আরও গভীরে প্রবেশ করতে হবে। যে দলের উনি সদস্য, সেই দল বাঙলাদেশের যুদ্ধকে প্রথমে যে চোখে ও যে রাজনীতিক ভাষ্যে বিচার করেছিলেন, বর্তমান অবস্থায় সেই চোখে ধীরে ধীরে পর্দা নামছে এবং ভাষ্যও বদলাচ্ছে।

ঠিকই বলেছেন সাহেব। ঐ প্রবন্ধে উনি স্বীকার করেছেন, এই যুদ্ধ যতই দীর্ঘস্থায়ী হবে, ততই অবস্থা নকশালপন্থীদের হাতে চলে যাবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ ওঁরা যে সমাজবাদ ও গণতন্ত্র চিন্তা করে এত বেশি উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, যুদ্ধের গতি দেখে উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসছে। ওঁরা বাঙলাদেশকে স্বীকার করতে বলেছিলেন এবং বেশির ভাগ প্রবক্তা এখনও বলছেন; তাঁরা চান অবস্থা যেন আয়ত্তের বাইরে না যায় এবং উগ্রপন্থীদের প্রাধান্য সৃষ্টি না হয়।

এহিয়া বোধহয় উগ্রপন্থীদের প্রাধান্য চায় না।

এহিয়া গণতন্ত্রও চায় না, উগ্রতন্ত্রও চায় না,—এহিয়া চায় জঙ্গীবাদের আড়ালে বসে পুঁজিবাদী পশ্চিম-পাকিস্থানীদের শোষণ-ব্যবস্থা। কিন্তু পরিণতি যে কি হতে পারে তা কখনও ভাবেনি। সমরনীতি আর রাজনীতি যে এক নয়, সে-কথা বুঝিয়ে কে বলবে! ধর্ম আর রাজনীতিকে খিচুড়ির তপ্ত কড়াইতে চাপিয়ে মুসলীম লীগ যে দুরবস্থার সৃষ্টি করেছিল, সমরনীতির সঙ্গে রাজনীতির জগাখিচুড়ি করে এহিয়াও সেই সর্বনাশ করছে।

বললাম, ক' মাইল এলাম?

তা পাঁচ ছ' মাইল পেরিয়ে এসেছি। সামনেই তো গ্রাম। একি, গ্রামের বাড়িঘর শূন্য মনে হচ্ছে! লোকজন পালিয়ে গেছে! খানরা নিশ্চয়ই এতদূর পর্যন্ত এগিয়েছিল। ওঃ, সামনেই সড়ক।

ঐ যে দূরে, মাইল-খানেক দূরে রাস্তা মনে হচ্ছে। একটা গাড়ির আলো দেখা গেল। হাঁ, তাই তো। রাস্তার ধারের গ্রাম। ভয়েই লোকজন পালিয়ে গেছে।

অমল বলল, সকাল হতে দেরি নেই। আকাশে লাল আলো দেখা যাচ্ছে।

ভাল করে দেখে বললাম, দূর বোকা। ওটা তো উত্তর দিক। ধ্রুবতারা দেখছ না? উত্তর দিকে সূর্য ওঠে কখনও?

ফজলুর বলল, কোন গ্রামে আগুন দিয়েছে। হুঁ ঠিক। গুলীর শব্দ শুনতে পাচ্ছেন? রাস্তার ধারে কোন গ্রামে আগুন দিয়েছে খানরা। গুলী করে মারছে নিরীহ গ্রামবাসীদের।

অমল দাঁড়িয়ে গেল।

চল অমল। দাঁড়ালে চলবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে এসে আত্মরক্ষার কথা চিন্তা করতে হয়। তার জন্য সতর্ক থাকা দরকার। খানরা এদিকে নেই মনে হচ্ছে। বাঁ-পাশের ঐ গ্রামটার দিকে চল। জোরে পা ফেল, দেরি নয়। আমরা রাস্তার ধারে এসে গেছি। ওদের হাতে দূরবীন আছে। ছায়া দেখে গুলী চালাবে।

তিনজনেই ছুটলাম বাঁ-পাশের গ্রামের দিকে।

কোথায় গ্রাম?

কতকগুলো বড় বড় গাছ দাঁড়িয়ে। ঘরবাড়ি ভেঙ্গে তছনছ। আগুনে পুড়ে গেছে খড়ের চালাগুলো।

ফজলুর বলল, আস্তে চলুন। ঐ ঝোপটায় কিসের যেন আওয়াজ। কথা বলবেন না।

পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম ঝোপের দিকে।

মানুষ নয়।

কোন পশু যেন ভিড় করেছে ঝোপে।

বললাম, অমল, তোমার ক্যামেরা ঠিক আছে তো? ফ্লাশ-লাইট?

হাঁ।

অমল প্রস্তুত হল।

হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকে অমল।

আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ ফ্লাশ-লাইট জ্বলে উঠল।

সে আলোতে যা দেখলাম !!

সারা জীবনে ভুলতে পারব না।

কতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম তা বলতে পারব না। ফজলুরের ডাকে যেন ঘুম ভাঙ্গল।

শেয়ালের দল চলে গেছে।

আলো দেখে তারা পালাবেই।

আমি বসে পড়লাম মাটিতে। বললাম, তোমরাও বস। বীভৎস ! নির্মম !

সকাল হল।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম ঝোপের দিকে।

একটি নারীর মৃতদেহ। বয়স বোধহয় পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে।

খাবলে খাবলে শেয়ালে তার হাতের ও বুকের মাংস ইতিমধ্যেই খেয়ে শেষ করেছে। এবার দিনের বেলায় শকুন নিশ্চয়ই নামবে।

ভয়ার্ত নারীটি নিশ্চয়ই খান সেনাদের হাত থেকে বাঁচার আশায় এই ঝোপে আশ্রয় নিয়েছিল। বেপরোয়া গুলী-বর্ষণের সে শিকার হয়েছে। হয়ত পরশুদিনের ঘটনা। গ্রামের সব লোক পালিয়ে গেছে। কে কোথায় গেছে তা কারও জানা নেই। নিহত মহিলাটি সম্বন্ধে আগ্রহও কারও ছিল না নিশ্চয়ই। বেওয়ারিশ লাশ পেয়ে শেয়াল তার সৎকার করছিল গত রাতে।

হিন্দু না মুসলমান ?

কোন পরিচয় লেখা নেই তার দেহে। দেহ দেখে মনে হল

কোন চাষীঘরের গৃহবধূ। মৃত্যুর চেয়েও অসম্মানকে বড় মনে করেই পালিয়ে এসে আত্মগোপন করেছিল এই ঝোপে। নিয়তি তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে, সম্মান তার বেঁচেছে।

ফজলুর বলল, আপনি যেন নার্ভাস হয়ে পড়ছেন সাহেব।

বললাম, প্রথম ধাক্কা। এই ধাক্কা সামলে নিলে আর বিশেষ উত্তেজিত হতে হবে না। দেখ তো গ্রামে কোন টিউবওয়েল আছে কিনা ? একটু পানি খাব।

ফজলুর অমলের কাছ থেকে বোতল নিয়ে জলের খোঁজে গেল।

অমল গম্ভীরভাবে আমার পাশে বসে বলল, horrible, কল্পনাও করা যায় না!

বললাম, আরও অনেক দেখতে হবে। তার জন্য মনকে প্রস্তুত করছি অমল। কিন্তু কি লাভ এই হত্যায়! এই মহিলাটির নিশ্চয়ই ঘর ছিল, সংসার ছিল, হয়ত সন্তানও ছিল। সে সন্তানেরও কোন হদিস নেই। কোথায় যে কে ভেসে গেছে, তার হিসাবও কারও জানা নেই।

ফজলুর জল নিয়ে ফিরে এসে বলল, গ্রামে একটিও লোক নেই সাহেব। ঐ দেখুন শকুন উড়ছে। ওটা গ্রামের মসজিদ। দেখে এলাম। মসজিদে বোধহয় কিছু লোক আশ্রয় নিয়েছিল। সেই মসজিদ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। লাশ-ভর্তি মসজিদের আঙ্গিনা, দুর্গন্ধে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। শকুন নেমেছে। টুকরো টুকরো করে খাচ্ছে মৃতদেহগুলো। কি যে বীভৎস সে দৃশ্য, তা বলে শেষ করা যায় না। চলুন দেখে আসবেন।

জল খেয়ে একটু সুস্থির হয়েই বললাম, চল।

গ্রামের মাঝ দিয়ে কাঁচা পথ। দুপাশে ঘর। ঘরগুলো সবই পুড়ে গেছে। মাটির দেওয়ালগুলো দাঁড়িয়ে। পাকা দোতলা দুটো বাড়ি, ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেছে। এগিয়ে গেলাম মসজিদের দিকে।

সামনে যে দৃশ্য তা দেখে আর এগোতে পারছিলাম না।

পঞ্চাশ-ষাটটা শকুন ভিড় করেছে সেখানে। ওরাও মারামারি করছে আহার্যের ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে। দুর্গন্ধে আকাশ বাতাস ভর্তি। রুমালে নাক চেপে কোনরকমে এগিয়ে যেতে যেতে থেমে দাঁড়ালাম।

একটা শিশুর হাত। দেহটা যে কোথায় তা দেখতে পেলাম না।

ফজলুর বলল, দেখছেন কী অত্যাচার, কী নিষ্ঠুরতা! এরপর যদি মানুষ ক্ষিপ্ত না হয়, তাহলে মানুষকে আর মানুষ বলা যায় না। কি অপরাধ করেছিল এই শিশু? এই শিশুই নয়, এরকম হাজার হাজার শিশুকে হত্যা করেছে ও করছে। আমরাও প্রতিজ্ঞা করেছি, শেষ পাকিস্থানীকে বাঙলাদেশ থেকে জীবিত ফিরতে দেব না।

অমল বলল, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

ঈশ্বর! কি বলছেন আপনি! খোদা! খোদা কোথায়? কার জন্য খোদা? যদি সত্যিই কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন খোদা থাকত, তাহলে তার বিচারে এই শিশুদের হত্যা কি শাস্তি না পেয়ে এড়িয়ে যেত? নেই। কিছু নেই। অন্যায়, অত্যাচার, রক্তপাত, লাঞ্ছনা, শোষণ—এ-সবের শেষ করতে হলে খোদার ওপর ভরসা করা চরম মূর্খতা। খোদা ওদের জন্য, খোদা নিপীড়িত মানুষের জন্য নয়। নিপীড়িত মানুষের জন্য প্রয়োজন প্রতিরোধ করার মত মনোবল ও শক্তি। খোদা দেখিয়ে ঐ মুসলমান সাম্রাজ্যবাদীরা হাজার বছর ধরে দরিদ্রদের শোষণ করেছে, ওরা হায়াত-মৌত-তগ্‌দীরকে খোদার হাতে তুলে দিয়ে, অবাধে অত্যাচার করেছে। আজ তারই শেষ হবে। সেই শেষ দিনকে দেখে ওরা ভয়ে চমকে উঠেছে।

আর এখানে থাকা উচিত নয়।

ফজলুর বলল, ঠিক বলেছেন। দিনের বেলায় আত্মগোপন করে থাকতেই হবে। দিনের আলো খানদের, রাতের অন্ধকার আমাদের। আমাদের প্রতিরোধ যা গড়ে উঠেছে তার সামনে ওরা দাঁড়াতে পারবে না।

এই গ্রামের যে কি নাম, তাও জানা গেল না। একটা মানুষও জীবিত নেই। কোন পরিচয় নেই।

তাকিয়ে দেখুন মাটির হাড়িতে ভাত রেঁধে রেখেছিল কোন কৃষক রমণী। হাঁড়ি ভেঙ্গেছে, ভাতও কিছু ছড়িয়ে আছে মাটিতে। চড়াইপাখি ভিড় করেছে ওখানে। পোড়া ধান থেকে বেছে বেছে ওরা খাদ্য সংগ্রহ করছে। দেখতে পাচ্ছেন, একটা কুকুর পর্যন্ত নেই গ্রামে! এগিয়ে চলুন। এটা বোধহয় গোয়াল-ঘর। গরুগুলো পুড়ে খাক হয়ে গেছে। ন্যাপাম বোমা দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, মনে হয় বিমান থেকেও বোমা বর্ষণ করেছে।

অমল বলল, এসব কল্পনাও করা যায় না। অথচ বাস্তব সত্য।

ফজলুর রহমান বলল, এ তো সামান্য। বিমানের শব্দ ভেসে আসছে। সাবধান! মনে হয় খান-সৈন্যরা এগোচ্ছে। বিমান-বাহিনী পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ফজলুর বলল, ওদের গতি চুয়াডাঙ্গার দিকে মনে হচ্ছে।

বললাম, আজ কত তারিখ?

আজ চৈত্রমাসের সংক্রান্তি। আগামী কাল নতুন বছর। আমাদের বাঙলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করবে।

কিন্তু আপনাদের প্রেসিডেণ্ট কোথায়? তিনি কি হাজির থাকবেন?

না। শেখসাহেব এখন বন্দী, নিজের গৃহেই বন্দী হয়ে আছেন। এহিয়া মনে করেছিল গান্ধীবাদী মুজিবরকে গ্রেপ্তার করে কিছু লোক মেরে ফেলতে পারলেই সব শান্ত হবে। সেজন্য সবার আগে

খান-সৈন্যরা শেখসাহেবের ধানমণ্ডীর বাড়ি আক্রমণ করেছিল। সেখানেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সবার আগে। কিন্তু তার ফল হল বিপরীত। যেটা ছিল অহিংস অসহযোগ এবং আইন অমান্য, সেটা পরিণত হল ভয়ঙ্কর যুদ্ধে। বাস্তবতঃ এই যুদ্ধ জোর করে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিল এহিয়া।

শেখ মুজিবর তো আগেই নিরাপদ স্থানে যেতে পারতেন।

বোধহয় শেখসাহেব মনে ভাবেননি পাকিস্থানী খানরা এই-রকম বীভৎস অত্যাচার করতে পারে। কোন সভ্যজগতে এইভাবে নরহত্যা কেউ করতে পারে তা ছিল কল্পনার অতীত। শেখসাহেব ভেবেছিলেন, আওয়ামী লীগ হল শতকরা আটানব্বই জনের প্রতিনিধি। গণতন্ত্রকে যারা মর্যাদা দেবে, তারা এই আটানব্বই জনের নেতার ও অন্যান্য প্রতিনিধিদের ওপর কোন অত্যাচার করতে পারে না। অন্ততঃ যারা নিজেদের সভ্য বলে মনে করে তারা তা পারে না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী জঙ্গীবাদকে হিসাবে ভুল করেছিলেন শেখসাহেব। যদি আগেই সতর্ক হতেন, তা'হলে পূর্ব-বাঙলায় জাহাজবোঝাই খানরাও আসতে পারতো না, গণ-হত্যাও রোধ করা যেত। তা যখন হয়নি তখন তার পরিণামে কঠিন মাশুল দিতেই হবে। চলুন এখান থেকে। কাল যাতে চুয়াডাঙ্গায় বাঙলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করতে না পারে, তার জন্য চুয়াডাঙ্গা দখল করতে এগোচ্ছে খান-সৈন্যরা।

আমরা পোড়া গ্রাম ছেড়ে পুকুরপাড়ে গিয়ে বসলাম।

শুকনো পাঁউরুটি জল দিয়ে ভিজিয়ে ক্ষুধা-নিবৃত্তির চেষ্টা করছি। হঠাৎ ফজলুর বলল, শুয়ে পড়ুন। ঐ দেখুন, একটা প্লেন খুব নীচুতে নেমে এসেছে। আমাদের দেখতে পেলেই গুলী করবে।

তিনজনেই পুকুরের ঢালুতে একটা ছোট খেজুরগাছের তলায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। প্লেনটা দুবার চক্কর দিয়ে আবার ফিরে গেল পশ্চিম দিকে। বোধহয় দেখল তাদের শত্রুপক্ষ কেউ আছে

কিনা। গোটা গ্রামটাই জনশূন্য দেখে আর কিছুই করল না। যেমন এসেছিল তেমনি ফিরে গেল। আমরাও ভূমিশয্যা থেকে উঠে দাঁড়ালাম।

যশোরে যাবে ফজলুর ?

যাব, তবে দিনে নয়, রাত্রে। আমাদের যেভাবে বোকা হতে হয়েছে তার তুলনা নেই। কিন্তু আমরা সামলে উঠেছি। আজ রাতেই আমরা যশোর দেখে ফিরে আসতে চাই। কিন্তু তা কি সম্ভব হবে ? দিনভর এই জনশূন্য পোড়া গ্রামেই থাকতে হবে।

পুকুরের পাড় থেকে দেখা গেল একদল লোক উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আসছে।

ফজলুর বলল, খানরা ওদের তাড়া করেছে বোধহয়।

না। গুলীর শব্দ শোনা যাচ্ছে না। খানরা নেই দেখে ওরা পালিয়ে আসছে। ওদের কাছেই অনেক কিছু জানা যাবে যশোর সম্বন্ধে। চুপ করে অপেক্ষা কর।

আমাদের পেছনে চুপিসাড়ে আরেক দল লোক যে এসে দাঁড়িয়েছে, তা লক্ষ্যই করিনি। খাকি পোশাক পরনে তিনজনের, মাথায় লোহার টুপি, পিঠে রাইফেল, দুজনের পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, পায়ে কোন জুতো নেই, তাদের পিঠেও রাইফেল।

কোথা থেকে আসছেন ?

প্রশ্ন শুনে ফিরে তাকিয়ে বলল, যশোর থেকে।

সেখানকার অবস্থা কি দেখলেন ?

সব শেষ। আমাদের পরে যারা আসছে তারা আরও ভাল বলতে পারবে। ঐ যে আসছে।

ওরা কারা ? চেনেন ?

না। মনে হয় ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসছে।

আগন্তুকরা কাছে আসতেই রাইফেলধারীরা এগিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পর সবাই এগিয়ে এল আমাদের দিকে।

ফজলুর বলল, কি দেখে এলেন ?

দেখার চোখ ছিল না বাপ্, বলেই মধ্যবয়সী একজন মহিলা কেঁদে উঠল। খানরা যত না অত্যাচার করেছে, তার চেয়ে বেশি অত্যাচার করেছে অবাঙ্গালী মুজাহিদরা। তারা ঘরে ঘরে ঢুকে লুট করেছে, বাঙ্গালীদের খুন করেছে। মেয়েদের বেইজ্জত করেছে। আমার মেয়ে আমিনাকে টেনে নিয়ে গেছে।

বলেই ডুকরে কেঁদে উঠল।

পাশে বোধহয় দাঁড়িয়ে আমিনার বাবা, তার হাতে কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ, গুলী লেগেছিল হাতে। সে বলল, শহর আর নেই।

দোকানপাট ?

সব বন্ধ। এখন চলছে লুট। খান আর অবাঙ্গালী মিলে গোটা শহর লুট করছে। টাকা-পয়সা সোনা-দানা ধান-চাল যা পাচ্ছে তাই লুট করছে। শহরের চারভাগের একভাগ তো গুঁড়ো হয়ে গেছে।

আপনারা এলেন কি করে ?

জঙ্গলে পালিয়ে দু'রাত ছিলাম। কাল রাতে দেখলাম কেউ নেই, তাই মাঠে মাঠে চলতে আরম্ভ করেছি। চলতে চলতে এখানে এসেছি। পানি নাই কোথাও। ভেবেছিলাম এই গ্রামে পানি পাব। হায় আল্লা, এই গ্রামও তো খতম! পচা গন্ধ কিসের ? সব মরেছে ?

তা জানি না। হয়ত অনেকে পালিয়েছে। তবে অনেকে মরেছে। বোধহয় মসজিদে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানেই মরেছে।

আর বলবেন না। মসজিদ গেছে, মন্দির গেছে, কেরেস্তানদের গির্জাও গেছে। কেরেস্তানদের হাসপাতালের নার্সগুলোকে টানতে

টানতে নিয়ে গেছে। হায় আল্লা! এই হল পাকিস্থান! এ পাকিস্থান ধ্বংস হলেই বাঁচি।

আমিনার মায়ের কান্না তখনও থামেনি।

কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমার দু'দুটো জোয়ান ছেলেকে জবাই করেছে। হায়রে আমার সোনার চাঁদরা! তোরা তো কোন কসুর করিসনি! হায় আল্লা, এদের মত পাপীকে মার্জনা করো না। হায়, আমার সোনার সংসার গেছে, আমার সব গেছে। এক-কাপড়ে বেরিয়ে এসেছি। না আছে ভাত, না আছে পানি।

রাইফেলধারীদের একজন বলল, আর দু'মাইল ভেতরে গেলে সব পাবেন। তারপর অন্য ব্যবস্থা করে নেবেন।

এখানে পানি আছে বাপ্‌জি?

ফজলুর বলল, আছে। গাছতলায় বসুন। রোদ বড়ই কড়া। আপনাদের সঙ্গে তো কোন পাত্র নেই। যারা সমর্থ তারা আসুন, আমি টিউবওয়েলের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

আমিনার মা বসে বসে কাঁদছে। বাকি আটজন জলের জন্য ফজলুরের পেছন-পেছন এগিয়ে গেল।

অমল উস্‌খুস করছিল।

বললাম, তোমার কি মনে হচ্ছে?

আর মনে হচ্ছে, দাদা। আমি যেন আমাকে ভুলে যাচ্ছি। আর দেখা যাবে না। এবার ফিরতি পথ ধরতে হবে।

রাইফেলধারী লুঙ্গি-পরিহিত একজন যুবককে বললাম, তোমরা কোথা থেকে আসছ?

আমরা তিনদিন আগে যশোর থেকে বেরিয়েছি। এখন গ্রামে গ্রামে ঘুরছি। খানদের অনেকে গ্রামে ঢুকেছে, তাদের খুঁজে বের করতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাদের আর একটা কাজ হল, দেশের লোকদের মনে শক্তিসঞ্চার করা।

যশোরে খুব যুদ্ধ হয়েছে বুঝি?

সে কথা আর বলবেন না। আমাদের হিসাবেই ভুল হয়েছিল। আজ যা করছি তা যদি প্রথম থেকে করতাম, তাহলে আমাদের এত ক্ষয়ক্ষতি হত না। আমাদের হাতে এই তো রাইফেল দেখছেন। এগুলো মিলিটারীর রিজেক্টেড রাইফেল। এক চেম্বার গুলী ছোঁড়ার পর ব্যারেল গরম হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য তুই চেম্বার, মানে দশ রাউণ্ড গুলী ছুঁড়তে নল ঠাণ্ডা করতে হচ্ছে। এটা কত বড় অসুবিধা তা তো বোঝেন। আর এসব রাইফেলের রেন্‌জ পঞ্চাশ থেকে একশ গজ, আর ওদের হাতে যে অস্ত্র আছে তার রেন্‌জ হল পাঁচ মাইল পর্যন্ত। এইসব রাইফেল দিয়ে কতক্ষণ যুদ্ধ করা সম্ভব বলুন! পুলিশ, আনসারদের হাতে রয়েছে মাস্‌কেট। সে আরও বিচিত্র অস্ত্র ; ই-পি-আর-এর রাইফেলেরও একই অবস্থা। আমাদের হেপাজতে রাইফেল মাস্‌কেট কম করেও এক লক্ষ আছে, যথেষ্ট বুলেটও আছে, কিন্তু তা দিয়ে মুখোমুখী যুদ্ধ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। সেজন্য যুদ্ধে আমাদের পিছু হটতে হয়েছে।

মিলিটারীর কোন অস্ত্র কি তোমরা পাওনি?

পেয়েছি, অতি সামান্য কিছু লাইট মেসিনগান, কিছু স্টেনগান। এগুলো দিয়েই আজও লড়াই চলছে। এগুলো দিয়েও মুখোমুখী যুদ্ধ সম্ভব হচ্ছে না। হেভী ওয়েপন দরকার। ওদের হাতে মর্টার, রকেট, বত্রিশ-পাউণ্ডার কামান যেমন আছে, তেমনি আছে প্লেন, ট্যাঙ্ক। অসমানের যুদ্ধ।

বললাম, তা'হলে তোমরা পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছ?

যুবকটি হাসল।

হাসিতে ব্যঙ্গ অথবা উৎসাহ ঠিক বোঝা গেল না।

বলল, আল্লার দরবারে না পৌঁছানো অবধি বলতে পারছি না।

আমি বললাম, হেভী ওয়েপন নেই, অথচ তোমরা লড়াই করছিলে মুখোমুখী?

সেটাও হল হিসেবের ভুল। তবে এবার আমরা রণকৌশল বদলেছি।

তা যদি করে থাক তাহলে এখন লাইট ওয়েপনই তোমাদের বেশি সাহায্য করবে। ওদের যেসব অস্ত্র তোমরা পেয়েছ, সেগুলো কি পাকিস্থানে তৈরী ?

পাকিস্থানে কোন সাংঘাতিক অস্ত্র তৈরী হয় না। বেশির ভাগ অস্ত্রই, যেমন লাইট মেসিনগান, রিভলভার, স্টেনগান—এগুলো ইংরেজের অথবা আমেরিকার। ব্রেনগান, লানচারগুলো চীনের মাল। আমাদের তো লোকের অভাব নেই, অস্ত্রের অভাব।

বললাম, ঠিক তা নয়। যা অস্ত্র আছে তা-ই যথেষ্ট।

কি বলছেন ?

ঐ যে চীনের কথা বললে, ঐ চীনের চেয়ারম্যান মাও সে-তুং বলেছেন, আমাদের ভাঙ্গা বন্দুক দিয়েই লড়াই করতে হয়েছিল। শত্রুর অস্ত্র কেড়ে নিয়ে, সেই অস্ত্রে শত্রুকে ঘায়েল করেছি। আসল অভাব হল সামরিক শিক্ষা। যে ধারায় যুদ্ধ করতে হবে, সে ধারায় তোমরা অগ্রসর হওনি। যুদ্ধটা যে ছেলেখেলা নয়, সেটা প্রথম থেকে যদি তোমরা স্থির করে আজকের মত গেরিলা কায়দাতে আঘাত করতে, তা'হলে তোমাদের জয় ত্বরান্বিত হত। ক্ষয়ক্ষতিও কম হত।

এ-রকম একটা অসম যুদ্ধ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে তা তো জানতো না কেউ-ই। এখন আমরা গেরিলা যুদ্ধে নেমেছি।

সেটাও ঠিক, কিন্তু তার ট্রেনিং হয়নি এখনও।

ওরাও অ্যান্টি-গেরিলা ট্রেনিং নিচ্ছে। চীনা অফিসাররা সেই ট্রেনিং দিচ্ছে।

হেসে বললাম, এটাই হল ইতিহাসের ব্যঙ্গ। চীন গেরিলা যুদ্ধ করে মুক্তিলাভ করেই শিখেছে কিভাবে গেরিলাযুদ্ধ করতে হয়, আবার সঙ্গে সঙ্গে গেরিলাযোদ্ধাদের কিভাবে পর্যুদস্ত করতে হয়

সেটাও শিখেছে। অ্যান্টি-গেরিলা যুদ্ধের প্রবর্তন করেছিল আমেরিকা। তার উদাহরণ হল এই গ্রাম। সৈন্য-চলাচলের রাস্তার দুই ধারের তিন-চার মাইলের মধ্যে যত গ্রাম আছে, সব ধ্বংস করছে খান সেনারা যাতে কোন অতর্কিত আক্রমণ না ঘটে তারই ব্যবস্থারূপে। এটা শিখিয়েছে চীনারা।

আপনারা কি সীমান্তে যাবেন ?

ইচ্ছা ছিল যশোরে যাব। আর সাত-আট মাইল পথ গিয়ে স্বচক্ষে ধ্বংসলীলা দেখে আসব।

যুবকটি বলল, যাওয়া নিরাপদ নয়। খানরা মানুষ দেখলেই গুলী করে হত্যা করছে। যশোরের সেনানিবাস ওদের সবচেয়ে শক্ত সেনানিবাস। ওরা সব সময় গাড়ি নিয়ে ঘুরছে। সামনে অর্থাৎ তিন-চার মাইলের মধ্যে মানুষ দেখামাত্র গুলী করছে। বৃষ্টির মত গুলী। একটা কথা মনে হচ্ছে বারবার। আমরা শুনেছিলাম পাঞ্জাবী, বেলুচ, আর পাঠান সৈন্যেরা খুব বীর। কিন্তু লড়াই করে বুঝলাম ওদের হাতে আধুনিক যুগের উন্নত ধরনের অস্ত্র না থাকলে ওদের মত ভীরু কেউ নেই।

কেমন করে বুঝলে ?

আমরা যখনই আক্রমণ করেছি, আমাদের বন্দুক থেকে একটা গুলীর শব্দ বের হওয়ামাত্র ওরা দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে এলোপাথাড়ি শ'য়ে শ'য়ে গুলী ছুঁড়েছে। কোন নির্দিষ্ট নিশানা নেই। ওরা গাছ পাথর ঘরবাড়ি সবকিছুকেই শত্রু মনে করছে। এর ফলেই তো বেশি নিরীহ লোক মারা গেছে। যদি আমাদের সৈন্যবাহিনীর হাতে উন্নত অস্ত্র থাকত, তা'হলে আমরা একজন-ই দশজনকে খতম করতে পারতাম।

বললাম, স্ট্র্যাটেজিতে ভুল হয়েছে ঠিকই, তবে মনে রাখতে হবে ওরা হল ভাড়াটিয়া সৈন্য, ওদের সামর্থ্য হল নিরস্ত্রদের বীরত্ব দেখানো ; যখনই মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দেয় তখন ওরা আত্মরক্ষার

জন্য নানারকম অপকর্ম করে। এই অপকর্ম অপরের মনে কতটা ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে তা ওদের জানা নেই, কিন্তু নিজেদের মনের ত্রাস গোপন করতে এইভাবেই বীরত্বকে কাপুরুষতায় পরিণত করে। আর যারা মুক্তিপাগল মানুষ তারা তো অর্থের বিনিময়ে লড়াই করে না ; তাদের লড়াই হল আদর্শের। আদর্শ যদি মানবোচিত হয় তখন তার মৃত্যু হয় না ; ওরা তা হতে পারে না। এইসব কারণেই ভীত ও সন্ত্রস্ত।

আমাদের জয় সুনিশ্চিত। শব্দ শুনতে পাচ্ছেন ? খানরা পাকা সড়ক বরাবর এগোচ্ছে। আমরা কিন্তু মোটেই নিরাপদ এলাকায় নই। ওরা এলে ওদের নিয়ে আরও ভেতরের গ্রামে যেতে হবে। আমরা অবশ্য এইসব পোড়া মরা গ্রাম দিয়ে ঘোরাফেরা করব। সুযোগের অপেক্ষায় থাকব।

বুঝলাম। ওরা পানি খেতে গেছে। এখুনি ফিরে আসবে। এলেই রওনা দেব।

অনেকক্ষণ দেরি হচ্ছে। কেন ? চলুন, দেখেই আসি।

বললাম, মসজিদ পেরিয়ে যেতে হবে। ভাঙ্গা মসজিদের সামনে যেতে চাই না। ওরকম বীভৎস অবস্থা দেখা যায় না। যে মানুষগুলো ক'দিন আগেই দৈনন্দিন সাংসারিক সুখদুঃখের চিন্তা করেছে, যে নববধূ স্বামীর ঘর করতে এসেছে হয়ত পনর-বিশ দিন আগে, যে শিশু রাতের বেলায় মায়ের বুকে মুখ রেখে গভীর সুপ্তিতে মগ্ন ছিল, তারা পিশাচদের আক্রমণে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল এই মসজিদে ; আশা করেছিল মুসলমান খানের দল মসজিদকে রেহাই দেবে, মসজিদে আশ্রয়প্রার্থীদের ওপর করুণা বর্ষণ করবে, অথচ তা হয় নি। মসজিদ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়েছে। আশ্রয়প্রার্থী নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে ইসলামের নামে কলঙ্ক লেপন করেছে ঐসব পাষণ্ডরা। সেই ছিন্নভিন্ন গলিত দেহগুলো শেয়াল-শকুনে ভক্ষণ করছে। ও দৃশ্য আর দেখা যায় না ভাই।

যুবকটি চুপ করে বসে রইল।

অমল বলল, আপনার বাড়ির খবর কি ?

ম্লান হাসি দেখা গেল তার মুখে। বলল, আমার বাড়ি আর নেই জনাব। আমার যে বাবা-মা ছিল, আমাকে বুকে করে আমার মা যে স্বপ্নের সৌধ তৈরী করতেন, সে-সব ভুলে গেছি। একটি গেঞ্জি আর লুঙ্গি সম্বল করে আমি পথে নেমেছি, আর ঘরে ফিরিনি। প্রতাপাদিত্যের যশোর আবার রক্তস্নাত, সেই রক্তের নদীতে আমার পরিবারও তাদের রক্তদান করে নিশ্চয়ই অতীত পুরুষদের ধন্য করেছে।

জল খেয়ে সবাই ফিরে এল।

অত দেরি কেন ফজলুর ?

এই মহিলাটি ওখানকার দৃশ্য দেখে মাথা ঘুরে ভিরমি খেয়েছিলেন। ওকে সুস্থ করতে অনেক সময় কেটে গেল। ও দৃশ্য দেখা আমাদের পক্ষেই সম্ভব নয়, উনি তো মহিলা! তার ওপর কম আঘাত তো পান নি। সেজন্য মাথা ঘুরে পড়ে যান।

এবার আরও ভেতরের দিকে যেতে হবে। খানরা সামনের সড়ক দিয়ে এগোচ্ছে।

তা এগোবে। ওরা চুয়াডাঙ্গা দখল করতে চলেছে। সহজে দখল হবে না, তবুও যাতে বাঙলাদেশ সরকার শপথ নিতে না পারে, তার জন্য ওরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে। প্রথম রাউণ্ডে ওদের জয়, সেটা যে পরাজয় তা বুঝতে পেরেছে। এখন এহিয়ার দোসর টিক্কা খান ক্ষেপে গেছে।

বললাম, ঠিক। মিলিটারী দেশ জয় করতে পারে। দেশ মানে মাটি অধিকার করতে পারে। মাটিই তো সবকিছু নয়। মাটির ওপরে যে মানুষ তাদের জয় না করতে পারলে দেশজয় সম্পূর্ণ হয় না। যদি তা হত তা হলে তো মরুভূমিতেই সুখে-স্বচ্ছন্দে

থাকতে পারত। ত্রাস সৃষ্টি করে আর কোন ক্ষতি ওদের হোক আর না হোক, ওদের ওপর যে বাঙলার মানুষের গভীর ঘৃণা জন্মেছে, এই ঘৃণাই ওদের চিরকালের মত বাঙলাদেশ থেকে বিদায় করবে। চল, এবার আমরা রওনা দিই।

এবার কাফেলা চলল।

দল বেঁধে আমরা পাকা সড়ক পেছনে রেখে পেছনের গ্রামের দিকে চলছি। ঘণ্টাখানেক চলার পর আমরা যখন মখদমপুরে পৌঁছলাম, তখন সবাই ক্লান্ত। প্রাইমারী স্কুলেই আশ্রয় নিলাম। এবার জনসংখ্যা বেশি, খাদ্যসংগ্রহ বড় কাজ।

ফজলুর আমিনার বাবার সঙ্গে গ্রামে গেল।

অনেকক্ষণ পরে ফিরে এল কিছু চাল ডাল নুন নিয়ে। আনল একটা বড় মাটির হাঁড়ি।

আমিনার মাকে বলল, খিচুড়ি পাকাও বিবিসাহেবা।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সবাই কাতর। আমিনার মা আর দ্বিরুক্তি না করে রান্নার ব্যবস্থায় গেল। শুকনো কাঠকুটো যোগাড় করে রান্না চাপানো হল।

রান্না শেষ হল বিকেলে।

সঙ্গীরা বড় বড় কচুর পাতা কেটে আনল। সবাই লাইন দিয়ে বসলাম। কচুর পাতায় খিচুড়ি দিতে থাকে আমিনার মা। শুধু নুন জল দিয়ে সেদ্ধ-করা চাল-ডাল খেতে খেতে মনে হচ্ছিল, বোধ হয় পোলাও-কোর্মাও এত সুস্বাদু নয়। অমল কোথা থেকে কয়েকটা কাঁচালঙ্কা তুলে এনেছিল। আধখানা কাঁচালঙ্কা আরও উপাদেয় করে তুলেছিল সেদিনের খাবার।

ক্ষুধা। ক্ষুধার এমন ভাবে পরিতৃপ্তি ঘটে তা জানতাম না।

সত্যিই যারা খেতে পায় না তাদের কথা ভাবতে ভাবতে খাবার মুখে তুলছিলাম। ক'দিন মোটেই ভাল খাবার পাইনি, তাতেই এই খাবারের স্পৃহা এবং এত পরিতৃপ্তি! যারা দিনের

পর দিন খেতে পায় না, তাদের অবস্থা যে কি তা চিন্তাও করা যায় না।

খাওয়া শেষ হতেই অনেকে মাটিতেই শুয়ে পড়ল। বিছানা-বালিসের যে প্রয়োজন আছে বা ছিল, তা কারও মনেই হল না। গভীর সুপ্তি। সবাই না ঘুমোলেও যারা ঘুমিয়েছিল তাদের কারও কারও নাকও ডাকছিল। এত অশান্তি, ভাবনা ও দুশ্চিন্তার মাঝেও ওরা যে ঘুমোচ্ছে, এটাই ওদের বড় সম্পদ। এই ঘুমটুকু যদি না আসত, তা'হলে বোধহয় ওরা সবাই পাগল হয়ে যেত। মধ্যবয়সী আমিনার মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। মাথার ঘোমটা খুলে পড়েছে, চেহারায় কেমন একটা সরলতা মাখা। জীবন ওদের সুখেরই ছিল নিশ্চয়। সব শেষ। খানদের নির্মমতার সামনে মানুষ তার সামান্য মর্যাদাটুকুও হারিয়েছে।

আমিনার মায়ের কণ্ঠ থেকে একটা করুণ শব্দ বের হল। তারপরই পাশ ফিরে শুলো। তার মুখের দিকে আগের মতই তাকিয়ে ছিলাম। এবার দেখলাম কপালে ভাঁজ পড়ছে, মুখে কেমন একটা বিষাদের ছায়া।

চুপ করে বসেছিলাম। অমলও ঘুমিয়ে পড়েছে। ফজলুর কিছুক্ষণ বাইরে ঘুরে এসে আমার সামনে বসল, বলল, লোকে বলে আল্লার রাজ্যে অবিচার হতে পারে না। তা'হলে পৃথিবীটা নিশ্চয়ই আল্লার রাজ্য নয়। অবিচার আর অত্যাচারের যে চিত্র দেখে এসেছি, তার পর আর বিশ্বাস করতে পারছি না। যদি আল্লার কোনও রাজ্য থেকেও থাকে তা এই দুনিয়াতে নয়, অন্য কোথাও হবে, তার হদিস আমাদের জানা নেই।

আজ রাতে পথ চলতে হবে, ফজলুর। এবার ফিরতি পথ।

অবশ্যই। এই গ্রামের যে কয়জন লোক আছে তারাও আজ রাতে চলে যাবে স্থির করেছে। এই যে নবাগত বন্ধুরা, এদের এই

গ্রামের লোকের সঙ্গেই আমরা যেতে বলে দেব। আমাদের সঙ্গে ওরা চলতে পারবে না।

বললাম, যুক্তিটা ভাল। কিন্তু ওরা কোথায় যাবে?

তা জানি না। ওরা বাঁচার চেষ্টা করবে নিরাপদ অজগ্রামে গিয়ে।

এরা তো সবাই চাষী। দেশে চাষ হবে না, খাবারের অভাব ঘটবে।

চাষ কার জন্য করবে বলুন? চাষের ফসল তো খানরা কেড়ে নিয়ে যাবে। পাটের কথা তো শুনেছেন। এবার পাট চাষ বন্ধ। ধানের চাষ হবে অজগ্রামে, যেখানে সহজে খানরা যেতে পারবে না। শহর ও নিকটবর্তী এলাকায় চাষ বন্ধ থাকবে। চাষীরা নিরাপদ মনে না করলে চাষ করতে সাহসই পাবে না। যেখানে প্রতি ইঞ্চি জমি মানুষের রক্তে লাল হয়ে উঠেছে, সেখানে সবুজের স্বপ্ন দেখার মানুষ কোথায়?

তা হলে আর দেরি নয়। সারারাত পথ চললে আমরা খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়েও পঁচিশ মাইল পথ যেতে পারব, হয়ত বেশিও যেতে পারব। তার ব্যবস্থা কর।

ফজলুর ডেকে তুলল আমিনার বাবাকে।

শুনছেন সাহেব?

ডাক শুনে আঁতকে উঠল আমিনার বাবা। অনেকক্ষণ ভীত দৃষ্টিতে ফজলুরের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, কি বলছেন মিঞাভাই?

" এই গ্রামের লোকেরা কোটচাঁদপুরের দিকে যাচ্ছে। আপনারা ওদের সঙ্গে এগিয়ে যান। কোথাও নিরাপদ স্থানে আস্তানা করে নিন। আমাদের সঙ্গী যে-সব মুক্তিফৌজের জওয়ানরা আছে, তারা ঝিনাইদহের দিকে যাবে। আমরা দর্শনা হয়ে ভারতের দিকে যেতে পারি। সেজন্য আপনারা প্রস্তুত হন। রাতের

বেলায় পথচলা নিরাপদ। দিনটা হল খানদের, রাতটা হল শেখদের। বুঝলেন ?

মাথা নাড়তে নাড়তে আমিনার বাবা বলল, তাই হবে। দেখি খোদার কি ইচ্ছা।

রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লাম তিনজনেই।

পথঘাট জানা নেই। থাকার মধ্যে আকশের চাঁদ। চাঁদ আজ আমাদের পথ দেখাবে। শেষরাতের শুকতারা আমাদের দিক স্থির করে দেবে।

চলতে চলতে অমল বলল, এর কি কোন সহজ মীমাংসার পথ নেই ?

ফজলুর বলল, ছিল, এখন আর নেই। ভুট্টো হল পুঁজিবাদীদের এজেন্ট। পূর্ববঙ্গকে শোষণ করে পাকিস্থান যেভাবে গায়ে-গতরে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই অবস্থা বজায় রাখতে হলে পূর্ববঙ্গকে দখলে রাখতেই হবে, এই সহজ সত্যটা ওরা জানে এবং তা করার জন্য সংহতি, ঐক্য, ধর্ম, তমদ্দুনের কথা বলছে। ওসব হল window washing, আসল উদ্দেশ্য শোষণ। সেজন্য শেখসাহেবের ছয় দফা দাবি কিছুতেই ওরা মেনে নিতে পারে নি, কারণ তা হলে শোষণের অবসান ঘটবে। শেখসাহেব তো পাকিস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়নি, শেখসাহেব চেয়েছে ন্যায্য অধিকার আদায় করতে, তার পেছনে শতকরা আটানব্বই জনের সমর্থন রয়েছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী জঙ্গীশাসকরা যুক্তি-তর্ক জানে না, ওরা জানে অস্ত্রের জোরে তাদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে। একশত বৎসর আগেও যা সম্ভব ছিল, আজ তা সম্ভব নয়—এটা ভুট্টো, কায়ুম অথবা এহিঁয়া বুঝতে পারেনি। এটাই তাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা। এর মাশুল দিতে হবে গোটা পশ্চিম-পাকিস্থানকে। সেদিন খুব দূরে নয়।

বললাম, তোমার কথা স্বীকার করছি ফজলুর। এবিষয়ে আরও ভাবতে হবে। কেননা আজ তো সবে শুরু, শেষ অনেক দূরে।

এবার তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ তিরিশ দিনে সমস্যার সমাধান হবে না, প্রয়োজন হবে তিরিশ মাস, হয়ত তারও বেশি। সেজন্য অনেক প্রস্তুতি দরকার, অনেক ত্যাগস্বীকার করতে হবে। তা বোধ হয় জানো।

আমাদের লড়াই তো আজ আরম্ভ হয়নি জনাব! লড়াই চলছিল মৃদু-মন্থর গতিতে; কিন্তু আমরা জনমত গঠন করেছি, আমরা জনসমর্থন লাভ করেছি বিগত কয়েক বছরে। তারই পরিণাম সামনে। শেখ সাহেব নিজেই বলেছেন, আমার ছয় দফা দাবিতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্থান-বিরোধী বা পাকিস্থান-ধ্বংসকারী প্রস্তাব করিনি। দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়নমণি শেরে বঙাল ফজলুল হককে এরা দেশদ্রোহী বলেছিলেন। পাকিস্থানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্থানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোরাবর্দিকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করতে হয়েছিল এদের হাতে। পূর্ববঙ্গের কথা বললেই তা হয় দেশ-দ্রোহিতা। জেল জুলুমের ঝুঁকি নিয়ে পূর্ববঙ্গের ন্যায্য দাবি তুলতে হয়, আমরা সেজন্য প্রস্তুত রয়েছি। কিন্তু বর্তমানে যা ঘটেছে তা আর পাকিস্থান গঠনের অনুকূল নয়। আজও আমরা চাই গণতন্ত্রী সমাজবাদী রাষ্ট্র। "The representatives of the Bangladesh are committed to Parliamentary democracy now; but what may happen after a prolonged guerilla war of liberation will be uncertain." পৃথিবীর গণতন্ত্রপ্রেমী রাষ্ট্রের প্রয়োজন অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা। নইলে যুদ্ধের গতি কোথায় নিয়ে যাবে তা বলা কঠিন।

বললাম, তুমি তা হলে মনে কর বর্তমানে যুদ্ধ যা চলছে তা একশ্রেণীর বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক লিবারেশন যুদ্ধ?—না, অন্য কিছু তোমার মত?

ফজলুর চুপ করে গেল।

আমার মনে হয় তুমি এখনও মনস্থির করতে পারনি।

বোধ হয় তাই। এই যুদ্ধ চাই। এই যুদ্ধের মাঝ দিয়েই গণফৌজ গড়ে উঠবে, এইটাই আমাদের বিশ্বাস। আমরা তো চাই না একদল শোষকের হাত থেকে মুক্ত হয়ে আরেক দল শোষকের খপ্পরে পড়ি। দেখা যাক কি হয়।

পথ চলছি মুখ বুজে।

কতটা পথ এসেছি তা জানি না। একটা বিরাট বটগাছের তলায় পথটা ছ' ভাগ হয়ে গিয়েছে। সেখানে বিশ্রামের জন্য বসলাম। চাঁদের আলোতে দেখতে পেলাম একদল লোক সেদিকে এগিয়ে আসছে। শত্রু অথবা মিত্র কিছুই স্থির করতে পারছিলাম না। অমল বলল, লক্ষণ ভাল নয়। ঐদিকে একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে। ওখানে আত্মগোপন করা নিরাপদ। ওদের ভাবভঙ্গী দেখে তবে আত্মপ্রকাশ করব।

গর্তটাও নিরাপদ নয়। সাপখোপ থাকতে পারে। বরং মাঠের মধ্যে শুয়ে পড়া যাক।

ফজলুর বলল, তাই ভাল, চলুন। ওরা কোন্ দিকে যায় দেখা যাবে। কথাবার্তাও শোনা যাবে।

মাঠের মধ্যেই শুয়ে পড়লাম।

আগন্তুকরা এসে দাঁড়াল বটগাছতলায়। তাদের কথোপকথন স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

মিনতি কোথায় গেল ?

এই তো আমি। আর হাঁটতে পারছি না, দাদা।

আর বেশি দূর নয় রে। কোন রকমে হিন্দুস্থানের মাটিতে পা দিলেই বাঁচি। ভাগ্যি পাকা রাস্তা দিয়ে আসি নি। খানরা যেভাবে দর্শনার দিকে যাচ্ছে !

আর দর্শনা। দর্শনায় আর বাঙ্গালী একটাও নেই। চিনি-কলের বিহারী মুসলমানরা যেভাবে লুটতরাজ আরম্ভ করেছে !

আমরা কোথায় যাচ্ছি, বিনয়?

তা তো জানি না। আমরা শেষে আরও ভেতরে গিয়ে পড়ব না তো? আজ রাতেই ভৈরব পার হতে পারলে আর ভয় নেই। ওপারে নাকি এখনও খানরা যেতে পারেনি।

শুনছি তো অনেক কথা। খানদের যে-সব অবাঙ্গালীরা সাহায্য করছে, তাদের লক্ষ্য হল হিন্দু আর আওয়ামী লীগের সমর্থক। তাই ভরসা পাচ্ছি না। নে চল, এই ডানদিকের রাস্তায় চল। এটা ধরলে বর্ডার কাছেই হবে। বাপ্‌রে, কম করেও তো পঞ্চাশ ষাট মাইল দু'দিনে হেঁটেছি। আর খালি পেটে পা চলছে না। এতদিন ভিক্ষা দিয়েছি, এখন ভিক্ষে করে পেট ভরাতে হচ্ছে। হায় ভগবান!

কেমন মরদ তোমরা। আমরা উনিশ জন মেয়ে তো চলছি, আর তোমরা বারোজন পুরুষ হাঁপিয়ে পড়ছ। মাঝে মাঝে ছেলেদের তো কোলে করে বইতে হচ্ছে, যারা দুধের বাচ্চা তাদের তো কোল থেকে নামাতেই পারছি না। চল। আর দেরি করে লাভ নেই। রাতারাতি হিন্দুস্থানে পৌঁছতে হবে, নইলে খানদের হাতে পড়তে হবে। সেয়ানা মেয়ে আছে আমাদের সঙ্গে তা ভুলে যাচ্ছ কেন।

দলবল আবার রওনা হল পশ্চিম দিকে।

আমরাও আবার এসে বসলাম বটগাছতলায়।

দর্শনার দিকে যাওয়া নিরাপদ নয়।

তা তো শুনলাম। ওরা ওদিক থেকেই এসেছে। গেদে যাবার সহজ পথ পায়নি। বানপুর হয়েই যাবে মনে হচ্ছে। আমরাও ওদের পেছন পেছন যেতে পারতাম।

বললাম, না ভাই অমল। আমরা যে পথে এসেছি সেই পথেই ফিরব। তবে গ্রামে গ্রামে যাব। আজ রাতে অর্থাৎ দশ ঘণ্টায় আমাদের তিরিশ থেকে চল্লিশ মাইল পথ যে-কোন উপায়ে পাড়ি দিতে হবে। আমরা যদি শেষরাতেও চুয়াডাঙ্গা স্টেশনে পৌঁছতে

পারি তাহলে ওখানকার অবস্থা পুরোপুরি জানতে পারব। খানরা এখন মরিয়া হয়ে ছুটছে। তারা শেষ চেষ্টা করছে মুক্তিফৌজের ঘাঁটিগুলো দখল করতে।

ফজলুর জোরে জোরে পা ফেলছে।

আমরা তাল রেখে চলতে পারছিলাম না। রাতের বেলায় কোথাও গরুর গাড়ি চলার পথ, কোথাও চষা মাঠ, কোথাও আম-কাঁঠালের বাগান, কোথাও বাঁশ-বাদাড় ও ঝোপ, তার মধ্য দিয়ে ছুটে চলা কঠিন কাজ, তার ওপর পথের নিশানা ঠিক রাখাই দায়। আজ রাতেই আমাদের চুয়াডাঙ্গা পৌঁছতে হবে। দর্শনাকে পাশ কাটিয়ে চুয়াডাঙ্গা পৌঁছানো গেলে তবেই বিরতি।

চলতে চলতে অমল বলল, দূরে রেল লাইন দেখা যাচ্ছে।

ফজলুরও সেদিকে তাকিয়ে বলল, যে লাইনটা চুয়াডাঙ্গা আর যশোরকে কানেক্ট্ করেছে, এটা সেই লাইন। তাহলে আমরা পথ হারাইনি। আমাদের চলতে হবে উত্তর দিকে। রেল-লাইনকে বাঁয়ে রেখে চলতে হবে। পাকা সড়কও পাশাপাশি চলছে। সব দিক সামলে চলতে হবে।

তাতে অসুবিধা হবে না। তবে নদী-নালা পার হতে হলেই অসুবিধা।

রাত কটা হবে ?

তিনটে বাজতে চলল। এখনও চুয়াডাঙ্গা অনেক দূর। আজ রাতে পৌঁছতে পারব কি ?

কামানের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

শব্দটা দর্শনার দিক থেকে আসছে। পানি আছে ভাই ?

অমল জলের বোতলটা ফজলুরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এই নিন।

জল খেয়ে ফজলুর আবার জোরে জোরে পা ফেলতে ফেলতে বলল, বিশেষ বিশেষ এলাকা খানরা দখল না করে ছাড়বে না।

দর্শনা আটক করবেই। ভারতের সঙ্গে যাতে যোগাযোগ না থাকে, তার জন্য বর্ডার-চেক-পোস্টগুলো আটক করতে চেষ্টা করবে। তবে সহজে কিছু করতে পারবে না।

ঐ দেখুন আগুন! উরে বাপ্‌রে! আগুন যেন আকাশ ছুঁতে চলেছে। কোন গ্রামে আগুন দিয়েছে। কতদূর? মাইল তিনেক দূর হবে মনে হচ্ছে। চুয়াডাঙ্গার দিকে খানরা এগিয়ে গেছে।

আবার চুপচাপ।

পা দুটো যন্ত্রণায় টনটন করছে। আর চলতে পারছি না। তখনও আমরা দর্শনা আর চুয়াডাঙ্গার মাঝামাঝি। সামনে মাইল দু' আড়াই পথ। এই পথ পেরিয়ে যেতে পারলেই চুয়াডাঙ্গা।

বাঙলা বছরের আটাত্তর সালের পয়লা বৈশাখের সকাল হতে আর দেরি নেই।

ফজলুরকে বললাম, নতুন বছরের সকালে যদি আমরা চুয়াডাঙ্গা পৌঁছতে পারি খানদের আগে, তাহলে শহরের মানুষদের সাবধান করে দিতে পারব। খানরা বাধা পেয়েছে মাঝপথে। কামান-বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ? সকালবেলায় খানরা এগোবে। বিমানবাহিনীর সাহায্যেই এগোবে। সকাল না হলে ওরা চুয়াডাঙ্গা আক্রমণ করবে না। তার আগেই আমাদের পৌঁছতে হবে।

অমল বলল, ঐ যে স্টেশনের বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। আর দূর নেই। ছুটে চলুন।

বললাম, আর ছুটতে পারছি না ভাই। কোন রকমে চলতে হচ্ছে। কতক্ষণ, দশ মিনিট? দশ মিনিটেই পৌঁছে যাব।

দশ পনর মিনিটেই পৌঁছেছিলাম।

স্টেশনের ছাউনীতে লোক ভর্তি। গাদাগাদি হয়ে শুয়ে রয়েছে অনেক লোক। ট্রেন নেই, যাত্রী আছে। এরা নিরাপদ স্থানে যাবার যাত্রী।

চারজন লুঙ্গিপরিহিত জওয়ান ছেলে রাইফেল নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। তাদের দেখেই ফজলুর এগিয়ে গেল। বলল, খানরা দর্শনা দখল করে এদিকে এগিয়ে আসছে। এইসব লোকদের শীগ্‌গির গ্রামের দিকে চলে যেত বল। সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে খানরা আক্রমণ করবে।

সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল।

আমরা তখনও দেখছি।

এতক্ষণ যারা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছিল, তাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সবার চোখে তখন উৎকণ্ঠার ছাপ। আটাত্তর সালের প্রথম দিনটিতে সবার চোখের সামনে সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার। এখন ওরা শুধু কি করে বাঁচতে পারা যায় তার জন্য ছুটোছুটি করছে। অবোধ শিশুরা এই হুড়োহুড়ির মধ্যে আর্তস্বরে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। স্বামী-স্ত্রী পাশে পাশে চলার চেষ্টা করছে, তবুও গাঁটছড়া খুলে যাবার উপক্রম।

আকাশে আলোর রেখা দেখা দিল।

শোনা গেল কামানের শব্দ। আকাশেও বিমানের শব্দ।

ফজলুর, এবার আমাদের নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে।

ফজলুর পলায়মান নারী-পুরুষদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমার কথা বোধহয় শুনতে পায়নি। আমি আবার বললাম। ফজলুর বাঁ-হাতের তেলোতে চোখ মুছে বলল, চলুন।

নতুন বছরের প্রথম দিনের এই সুন্দর সকালে বাঙলা মায়ের একনিষ্ঠ একজন অখ্যাত সেবকের চোখে বেদনাভরা অশ্রু। এই কথাটা আমিও ভুলতে পারছিলাম না।

হাঁটতে হাঁটতে প্লাটফরমের শেষ কোণায় আসতেই দেখতে পেলাম রাইফেল নিয়ে ট্রেন্‌চ-এ বসে আছে ক'জন নওজওয়ান। ওদের কাছে পৌঁছবার আগেই কামানের শব্দ শোনা গেল। খুব কাছ থেকেই আওয়াজ আসছে। আকাশেও দেখা দিল একঝাঁক

বিমান। বিমানগুলো নীচে নেমে আসতেই ট্রেন্‌চ থেকে নওজওয়ানদের রাইফেল গর্জে উঠল। বৃথাই গেল চেষ্টা! বিমান শহরের দিকে এগিয়ে গেল। বিকট শব্দ করে ট্যাঙ্কগুলো এগোতে থাকে। গুলীর শব্দে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। আমরা শুয়ে পড়লাম রেলের বাঁধে। গড়াতে গড়াতে একেবারে নীচের খালে। মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী শোঁ-শোঁ শব্দ করতে করতে ছুটে যাচ্ছে। ট্রেন্‌চ-এর জওয়ানদের কি অবস্থা তা দেখার সাহস নেই। দু'তিনজন গড়াতে গড়াতে আমাদের পাশে এসে থামল। দু'জন পুরুষ, একজন মেয়ে। বুকের সঙ্গে রাইফেল জাপটে ধরে গড়াতে গড়াতে এসেছে।

মেয়েটা ক্ষীণ স্বরে বলল, সব গুঁড়ো হয়ে গেছে। এখান থেকে নিরাপদ স্থানে যেতে হবে।

মাথাটা উঁচু করে দেখলাম।

বিশ-বাইশ বছরের মেয়ে। কোমরে শাড়ী শক্ত করে জড়ানো। বেণী এলিয়ে আছে পিঠের ওপর। সবল দেহ, রং-টা নেহাত তামাটে নয়। পায়ে রক্তের দাগ। আঘাত লেগেছে নিশ্চয়ই। গড়াতে গড়াতে তার কাছে গিয়ে বললাম, তোমার পা দিয়ে রক্ত পড়ছে। এই রুমালটা নাও। কষে বাঁধ। ওষুধপত্তর তো কিছু নেই। জলও নেই কাছে। গড়াতে গড়াতে এগিয়ে যেতেই হবে।

আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

আর দেরি নয়। খানরা গাড়ি থেকে নেমে এদিকে আসতে দেরি করবে না। ঐ দেখ, আগুন জ্বলছে। এক জায়গায় নয়, বহু জায়গায়। কামানের শব্দে কান পাতা যাচ্ছে না। চল সবাই ঐ ঝোপের দিকে। ঝোপকে আড়াল দিয়ে আমরা দৌড়ে কিছুটা গেলেই খাল পাব। তখন আত্মরক্ষার কিছুটা সুবিধা হবে।

আমরা ছয়জন।

বুকে হেঁটে হামাগুড়ি দিয়ে প্রায় একশ গজ দূরের ঝোপটার

পাশে এসে হাঁফ ছাড়লাম। মাথা উঁচু করে দেখলাম, শত্রু কত দূরে। শহরের মানুষ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। রেল লাইন ধরে নীলমণিগঞ্জের দিকে দৌড়চ্ছে। মেয়েরা হোঁচট খেয়ে পড়ছে। শিশুরা আর্তনাদ করছে। কিন্তু খানরা এগোতে পারছে না মনে হল। ওরা কঠিন বাধার সামনে পড়েছে। প্লেন থেকে এলোপাথাড়ি গুলী করছে। যারা বাঁচার আশায় ছুটছিল, তাদের ক'জন গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। ওখানে গিয়ে দেখবার ভরসা নেই। ঝোপকেও বিশ্বাস নেই। খোলা মাঠে শুয়ে থাকলে বিমানদস্যুদের দৃষ্টিতে পড়ব না। বললাম, এগিয়ে মাঠে গিয়ে শুয়ে পড়তে হবে ; তারপর হামাগুড়ি দিয়ে খালের দিকে যেতে হবে। আর বিলম্ব নয়, দেরি করলেই মৃত্যু।

সঙ্গী জওয়ান দু'জন বলল, আপনারা যান। আমরা এই ঝোপের পাশেই থাকব। একজন খানকে না মেরে মরব না। বুবু, আপনি জখম হয়েছেন। এদের সঙ্গে এগিয়ে মাঠের দিকে যান।

আমরা ক্রমেই মাঠের দিকে এগোতে থাকি। আকাশের দিকে আমাদের চোখ। কারও মুখে কোন কথা নেই।

খালের ধারে পৌঁছতে এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে।

কামানের আওয়াজে কানে তালা লাগছে।

খালের ধারে বিরাট নিমগাছ। নিমগাছের তলায় চারজন বসলাম। রুমাল দিয়ে মেয়েটার ক্ষতস্থান বাঁধলেও তা দিয়ে রক্ত তখনও পড়ছে। সোজাসুজি বুলেট লেগেছে তার পেশীতে।

পিপাসা!

অমল, তোমার বোতলে কিছু আছে কি?

বোতল বের করে অমল বলল, সামান্য। এইটুকুই আপনি খান। সামনে গ্রাম দেখছি। ধীরে ধীরে ঐদিকে চলুন। জল পাওয়া যাবে।

মেয়েটি সামান্য জল খেয়ে হাত দিয়ে মুখ মুছে বলল, চলুন। ঐ গ্রামেই যাই।

আমরাও বিশেষ ক্লান্ত। সারারাত পথ চলেছি। চলেছি বললে ভুল হয়, আমরা ছুটে চলেছি। ঠিক ঘোড়দৌড় করার মত। পেটেও কিছু পঁড়েনি। তবুও যেতেই হবে। আহার্য না পেলেও জলের প্রয়োজন সবারই। প্রয়োজন মেটাতে আমাদের না গিয়ে উপায় নেই।

খাল পেরিয়ে সামনে আম-বাগান।

আম-বাগানের মাটি বেশ ঠাণ্ডা। গাছে গাছে অজস্র কাঁচা আম। বোঁটার সঙ্গে বাতাসের তালে তালে কাঁচা আমগুলো দুলছে। একটা গাছতলায় মেয়েটি বসে বলল, একটু বিশ্রাম।

আমরাও বিশ্রাম চাই।

চুয়াডাঙ্গা থেকে অনেকটা দূরে এলেও মোটেই নিরাপদ এলাকা নয়। কামানের রেঞ্জের মধ্যে তখনও রয়েছি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েটি বলল, এমন সুন্দর বাঙলাদেশকে ওরা ধ্বংস না করে ছাড়বে না। দেখুন কেমন শান্ত সুন্দর বাঙলার পল্লী। এ যে সোনার বাঙলা, একে আমরা প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। এই ভালবাসার মূল্য আমাদের কম দিতে হচ্ছে না।

বললাম, তুমি কেন লড়াইয়ে নেমেছ?

মেয়েরা বুঝি ঘরে বসে থাকবে? আমরা আমাদের ভাইদের পাশে না দাঁড়ালে ওদের উৎসাহ কে দেবে? আমার মত মেয়েদের মর্যাদা রক্ষা করতেই তো ওরা জান কবুল করছে। আমার বাবাও বলেছিলেন, তুই কেন যাবি নূরুন্নাহার। তোর কাজ ঘরে। আমি বলেছিলাম, বাপ্‌জি, আমাকে আজ থেকে মেয়ে মনে করো না, আমাকে তোমার অন্য দু'জন ছেলের মত ছেলেই মনে করো। ছুটিতে রাজশাহী থেকে এসেছিলাম। আসার আগেই জেনে এসেছিলাম, আমাদের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। আমাদের জেলায়

এসেই বাবাকে বললাম, তোমার পুলিশবাহিনীর হাতে যে রাইফেল রয়েছে, তা দিয়ে কি বাঙলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে? আমাদের হাতিয়ার বলতে একমাত্র রাইফেল। খানরা কি কম শয়তান! প্রত্যেক জেলার হেড-কোয়ার্টারে ছোটখাটো সৈন্যঘাঁটি করে রেখেছে এস্কান্দার মির্জার সময় থেকেই।

সাম্রাজ্যবাদী জঙ্গীশাসকরা সব সময়ই ভীত-সন্ত্রস্ত। তাদের নৈতিক শক্তি থাকে না বলেই দৈহিক শক্তি প্রয়োগের পথ খুলে রাখে। তোমাদের এখানেও তাই করেছে। কোন সময় পদানত বাঙ্গালীরা যদি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, তখনই যাতে ওরা আঘাত করতে পারে তারই ব্যবস্থা করে রেখেছে। অঙ্কুরেই জনজাগরণকে ধ্বংস করাই হল ওদের মূল ধর্ম।

নূরুন্নাহার বলল, ঠিকই বলেছেন।

অমল বলল, চলুন, গ্রামে যাই। জল ও খাদ্য ছুটোই দরকার।

উঠতে হল।

ফজলুর বেশ ডাঁশা ডাঁশা কয়েকটা আম পেড়ে দিল সবাইয়ের হাতে। ক্ষুধা ও পিপাসা ছুটোই নিবারণ করতে সাহায্য করবে কাঁচা আম।

রাইফেল পিঠে ঝুলিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নূরুন্নাহার আমাদের সঙ্গে চলছে।

গ্রামে এসে অবাক হয়ে গেলাম।

একটিও মানুষ নেই গ্রামে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের যে বর্ণনা রয়েছে, তার চেয়েও ভয়াবহ সে দৃশ্য! কোথায় গেল সব মানুষ! কারও দরজায় তালা, গৃহস্বামী হয়ত আশা করেছে আবার ফিরে আসবে তার গৃহে। আবার সুখের সংসার পাতবে। তাই তালা দিয়ে গেছে। বেশির ভাগ বাড়ির দরজা খোলা। বোধহয় গত রাতেই কামানের শব্দ শুনে সবাই ঘর ছেড়ে

বেরিয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। জলের অভাব নেই, সামনে টিউবওয়েল ; কিন্তু খাদ্য একটি কণাও যে পাওয়া যাবে না তা বুঝলাম।

সবার আগে প্রাণভরে জল খেলাম।

ফজলুর বলল, কাঁচা আম আর পাকা বেল।

বললাম, বেল দিয়েই উদর-পূর্তি করতে হবে। কটা বেল পাড়ার ব্যবস্থা কর।

বলা মাত্র অমল ও ফজলুর পাকা বেল পাড়তে লেগে গেল।

আরেকটি জিনিস আছে দাদা। মনে হচ্ছে শশা আছে। দেখে আসি।

অমল শশা খুঁজতে গেল।

ফিরে এল শশা নিয়ে, আর সংবাদ দিল একটি বৃদ্ধা রয়েছে গ্রামে। তার চলার শক্তি নেই। তাকে রেখেই সবাই পালিয়ে গেছে। বুড়ী ভাল করে কথাও বলতে পারে না, নড়চড়া তো দূরের কথা। যেভাবে আছে বুড়ী, এরপর শেয়াল-কুকুর তাকে টানাটানি করে জীবন্ত অবস্থায় ছিঁড়ে না খায়। যা অবস্থা দেখছি তাতে আশ্চর্য কিছু নেই।

বললাম, কিন্তু উপায় কি। বুড়ীর অতি নিকটজন কেউ থাকলে নিশ্চয়ই কোন রকমে নিয়ে যেত। কিন্তু আমাদেরও তো কিছু করার নেই। দেখি যদি কোন লোকের সঙ্গে দেখা হয় তবে তার খোঁজত করা যাবে।

নূরুন্নাহারের বাবা জেলার পুলিশ-সুপারিনটেনডেণ্ট।

সারা জীবন কেটেছে বিলাস-বৈভবে।

দেশের ডাকে পথে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ কোন অভিযোগ নেই। এই কষ্টকর জীবনকে সে সাদরে গ্রহণ করেছে।

আমরা এগিয়ে চলেছি মেহেরপুরের দিকে পল্লী-পথ ধরে।

সন্ধ্যাবেলায় মেহেরপুরের উপকণ্ঠে এসে আমরা থামলাম। অমল আর ফজলুর গেল মেহেরপুরের অবস্থা দেখতে। তাদের রিপোর্ট পেলে তবেই আমরা স্থির করব কোন্ পথে আমরা অগ্রসর হব। আমি আর নূরুন্নাহার একটা ভাঙ্গা বাড়ির দাওয়াতে বসলাম। তখন আর এক পা চলার সামর্থ্যও ছিল না।

ওরা দুজন চলে যাবার পর আমরা চুপ করেই বসে ছিলাম।

লক্ষ্য করছিলাম আমাদের সম্মুখ দিয়ে দলে দলে মানুষ ছুটছে সীমান্তের দিকে। পেছনে তাকিয়ে দেখবার অবসরও নেই কারও।

ও বড়মিঞা !

আর বড়মিঞা ! বড়মিঞা তখন জান বাঁচাতে ছুটছে। সবুর করার উপায় নেই। নারীকণ্ঠের এই ডাক যদি শুনত বড়মিঞা স্বাভাবিক অবস্থায়, তাহলে গদগদ হয়ে খেদমত করতে ছুটে আসত। আজ সেই নারীকণ্ঠই তার পক্ষে ভীতির সঞ্চার করছে।

এখন,···ওরে ধরল ! কে ধরল তা দেখার সময় নেই কারও।

প্রফুল্লকে চুরি করে নিয়ে যাবার সময় যেমন পাল্‌কী ফেলে প্রাণপণে ছুটে পালিয়েছিল তস্কর ও তার সঙ্গী পাল্‌কী-বাহকরা, তেমনি দিক্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে। আগের মানুষ পেছনের মানুষের দিকে তাকাবার অবসর পাচ্ছে না। মায়া-মমতা, দরদ-মহব্বত, সবকিছু লোপ পেয়েছে শুধু নিজেদের জীবন বাঁচাতে। বোধহয় তাদের কানের কাছে কেউ চিৎকার করছে, এলো, ঐ যে খানরা আসছে। পালাও।

নূরুন্নাহার অনেকক্ষণ এগুলো লক্ষ্য করে বলল, এদের দোষ নেই। এরা এর বেশি চিন্তা করার মত শিক্ষাও পায়নি সাহেব। যে বিবি-বাচ্চা নিয়ে সংসার, সেই বিবি-বাচ্চার প্রতি সামান্য দরদও নেই। কিন্তু আত্মরক্ষা করতে হবে, আত্মরক্ষা করার শিক্ষা বিগত বিশ-বাইশ বছরে কেউ দেয়নি। বাঙলার মানুষকে শুধু

দাসজীবন যাপন করতে খানরা বাধ্য করেনি, ওরা বাঙলার মানুষের ওপর অত্যাচার করে ক্রমেই তাদের কাপুরুষ স্বার্থপরে পরিণত করেছে। তবে এটাই বাঙলার আসল চিত্র নয়। স্বাধীনতা-লাভের পর যারা জন্মেছে, এদের মধ্যে তারা নেই। স্বাধীনতা-লাভের পর যারা জন্মেছে তারা ধাক্কা খেয়ে শিখেছে পালিয়ে বাঁচা যায় না, প্রতিরোধ করে বাঁচতে হয়। আমরা পারতাম এর প্রতি-বিধান করতে, তবে খুব তাড়াতাড়ি হবে না। আমরা যে একেবারে নিরস্ত্র। নইলে প্রতিরোধের প্রাচীর যেভাবে গড়ে তুলতে পারতাম, তার সামনে খানরা দাঁড়াতে পারত না। এই অসহায় নিরীহ লোকদের বাঁচাবার মত ক্ষমতাও আমাদের নেই।

বললাম, ওরা বাঁচবে। তবে সময়সাপেক্ষ। ওরাই আবার ফিরে আসবে, তবে সেদিন ওরা পলায়নের মনোভাব নিয়ে আসবে না, সেদিন আসবে হানাদার বিতাড়নের মনোভাব নিয়ে, সেদিন ওরা কঠিন-কঠোর মন নিয়ে আসবে। যা হারিয়েছে তার দুনো আদায় করতে আসবে।

হতাশভাবে নূরুন্নাহার বলল, শেষরক্ষা কঠিন কাজ। সব ভাল যার শেষ ভাল। শেষ যদি ভাল না হয় তাহলে যে কি হবে!

শেষ ভাল করতেই হবে নূরুন্নাহার। পরাজয় সাম্রাজ্যবাদীকে দেবে নির্বিচারে নরহত্যার সুযোগ। মুক্তিকামী একটি মানুষকেও ওরা বাঁচতে দেবে না, যারা তোমাদের সমর্থক, তাদেরও খতম করবে। তুমি বোধহয় জানো না, পৃথিবীর যারা সেরা বিপ্লবী তারা বলেছেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই সামরিক তৎপরতায় যদি ভুল নেতৃত্ব দেওয়া হয়, তবে তার জন্য কঠিন মাশুল দিতে হয়, সেজন্য নেতৃত্বের নির্ভুল নির্দেশ প্রয়োজন। শুধু একজন, মাত্র একজন, যাকে বলে Single Command—সেই Single Command প্রয়োজন। প্রয়োজন মুক্তিফৌজের রাজনৈতিক শিক্ষা। এর অভাব

হলেই বিপর্যয় আসবে। শুধু বিপর্যয় নয় নূরুন্নাহার, এতে তোমাদের মুক্তিসাধনা অনেক পিছিয়ে পড়বে। ইন্দোনেশিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখ। সেখানে মুক্তিযুদ্ধ অনেক পিছিয়ে গেছে। নাসুসান লক্ষ লক্ষ লোককে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হত্যা করে সমাজতন্ত্রের সাময়িক সমাধি ঘটিয়েছে। তাদের চেয়ে অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় তোমরা আছ। আর এই অবস্থার সুযোগেই তোমাদের মুক্তিলাভ ঘটবে হানাদারদের হাত থেকে।

নূরুন্নাহার চুপ করে গেল।

আজ ক' তারিখ? দোসরা বোশেখ। বছরের দ্বিতীয় দিন। কাল বলতে গেলে অনাহারে গেছে। আজও প্রায় তাই। এই দুঃখের মাঝ দিয়েই যদি আমাদের সাধনার সিদ্ধি ঘটে, তা হলে সব দুঃখই সহ্য করতে পারি।

আবার থামল নূরুন্নাহার।

আজ আকাশে চাঁদ উঠতে দেরি করছে।

কোন উত্তর দিলাম না।

আমাদের কি সুবিধা বলতে পারেন?

সুবিধাটা হল তুলনামূলক। তোমাদের ব্যথা-বেদনার সঙ্গী আমরা। আমাদের অকুণ্ঠ সাহায্য তোমরা পাচ্ছ। এই সাহায্য ইন্দোনেশিয়ার মানুষ পায়নি। চীন তাদের মিত্র, কিন্তু চীন থেকে সাহায্য দেবার কোন পথ ছিল না। সমুদ্রপথে সাহায্য এলেও তা পৌঁছে দেবার মত কোন বন্দর ছিল না বিপ্লবীদের হাতে। অথচ চোদ্দ শ' মাইল ভারত-সীমান্ত দিয়ে সাহায্য পৌঁছে দেবার স্থলপথ বন্ধ করার মত কোন উপায় নেই খানদের। আরও একটি সুবিধা রয়েছে। ইন্দোনেশিয়াতে নিরীহ মানুষদের যেভাবে হত্যা করেছে, তা এখানে সম্ভব হবে না। সেখানে নিরীহ মানুষদের আশ্রয় ছিল না। কিন্তু লক্ষ লক্ষ বাঙালী হিন্দু-মুসলমান ইতিমধ্যেই আশ্রয় পেয়েছে ভারতে। তৃতীয় সুবিধা হল, খানরাজ্য থেকে সৈন্য

নিয়ে এসে পাঁচ হাজার কিলোমিটার পথ পেরিয়ে সাহায্য দেওয়া বেশিদিন সম্ভব নয়। যদি খানরাজ্য আর বাঙলাদেশ স্থলপথে যুক্ত থাকত, তা হলে তোমাদের সব চেষ্টাই পণ্ড করত।

নূরুন্নাহার বলল, খোদার মর্জি দেখুন। আমাদের আন্দোলনের মাত্র কয়েকদিন আগে জম্মু থেকে বিমান চুরি করে লাহোরে এনে পুড়িয়ে দেওয়াতে ভারত-পাকিস্থানের সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে। ভারত সরকার বিমান-চোরদের ফেরত চেয়েছিল, বিমান ফেরত চেয়েছিল। খানরা ভারতের দাবি পূরণ করেনি। ফলে ভারতের ওপর দিয়ে খানদের যাতায়াত বন্ধ। তাদের গোটা ভারত বেড় দিয়ে আসতে হচ্ছে। যদি তা না হত, তা হলে হাজার হাজার খানকে সাদা পোশাকে বাঙলাদেশে গণহত্যা করতে পাঠাত।

বললাম, উদ্দেশ্য ছিল এইভাবে ভারত-পাক সম্পর্ক ঘোলাটে করে বাঙলাদেশের আন্দোলনকে বিপথে পরিচালনা করবে। কিন্তু বাঙ্গালীদের বোকা বানাতে পারল না এহিয়া ও তার তাঁবেদার জঙ্গী-গোষ্ঠী। কূটনীতি-বিশারদ ভুট্টো আর কায়ুম এইসব কু-পরামর্শ দিয়েও যখন গোলমাল বাধাতে পারল না, তখন এহিয়া বাধ্য হল নরহত্যায় নামতে। তবুও ওরা বাধা পেত না। চীনের পথে ওরা আসছিল। বর্মা আপত্তি করাতে তা আর হচ্ছে না, আবার সিংহল থেকে বিমানের তেল পাচ্ছিল, তাও বন্ধ। সেজন্য বিমানপথ ব্যবহার করে মোটেই সুবিধা করতে পারছে না। এতগুলো সুবিধার সদ্ব্যবহার করলে কোনক্রমেই তোমাদের পরাজয় হবে না। যুদ্ধ চালাতে হলে টাকা চাই। এহিয়ার ভাঁড়ে মা ভবানী। খাজনা ট্যাক্স যেমন বন্ধ, তেমনি মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে। বাইরের আর্থিক সাহায্য ভরসা। বাইরের ভরসায় অনির্দিষ্ট কাল লড়াই করা যায় না তা এহিয়াও জানে।

নূরুন্নাহার নিজের মনেই বলল, আমাদের যদি কিছু আধুনিক অস্ত্র থাকত!

তোমরা তো অনেক অস্ত্র পেয়েছ। খানদের কাছ থেকে সাব-মেশিনগান, লাইট মেশিনগান, রিকয়েললেস্ গান প্রভৃতি অনেক অস্ত্র পেয়েছ। সেগুলো ব্যবহার করতে শেখাও, সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার কর, তাতেই তোমাদের কাজ এগিয়ে চলবে। জানো তো বড় বড় বিপ্লবীদের কথা, শত্রুর অস্ত্রই আমাদের অস্ত্র। চে গুয়েভারা বলেছেন, একটি সৈনিকের মৃত্যুর চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে যদি আমাদের একটি অস্ত্র শত্রুদের হাতে যায়। শত্রুদের অস্ত্র সংগ্রহ করে শত্রু নিধন করা হবে বিপ্লবীদের প্রথম কাজ।

আমরা তো ওদের সঙ্গে পারছি না।

তাতে হতাশ হবার কিছু নেই। কিছু কিছু ভুল হয়েছে প্রথম দিকে, তার জন্য ক্ষয়ক্ষতিটাও বেশি হয়েছে।

ঠিক বলেছেন, আমরা জনশক্তির উপর নির্ভরশীল। জনসমর্থন আমাদের বড় অস্ত্র। খানরা যেভাবে গণহত্যা করছে, তা সম্ভব হত না যদি আমরা জনশক্তিকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারতাম।

তোমার কথাই আসল কথা। বাঙলাদেশের পুলিশ, আনসার, E.P.R., E.B.R—এইসব নিয়ে কম করেও এক লক্ষ জওয়ান জীবন দিতে প্রস্তুত। জনসংখ্যায় এরা খানদের চেয়ে অনেক গরিষ্ঠ; কিন্তু এই গরিষ্ঠ সংখ্যাই বিপদ ঘটিয়েছে। মুখোমুখী যুদ্ধের প্রলোভন পরিত্যাগ করতে পারেনি। শত্রুকে প্রভূত শক্তিশালী মনে করা যেমন ভুল, তেমনি ভুল তাদের একেবারে ছোট করে দেখা। সেজন্য প্রথমাবধি যদি যুদ্ধটা চলত গেরিলা পদ্ধতিতে তা হলে আধা-সামরিক বাহিনীকে ট্রেনিং দিয়ে বিরাট গণফৌজ যেমন গড়ে উঠত, তেমনি হাতিয়ার বিদেশ থেকে আমদানি করা সম্ভব হত। তা হয়নি। সেজন্য কেঁচে-গণ্ডূষ করতে হবে। গেরিলা-ট্রেনিং দিয়ে আবার আক্রমণ শুরু করতে হবে। এই যুদ্ধ চলবে বহুকাল অবধি।

আমরা ভেবেছিলাম একমাসের মধ্যেই খানরা ভেঙ্গে পড়বে।

তোমরা সবকিছু বজায় রেখে খান বিতাড়ন করবে এটা তো হতে পারে না। প্রথম আঘাতেই যদি চট্টগ্রাম আর চালনা বন্দরকে সম্পূর্ণরূপে অকেজো করে দিতে পারতে, তা হলে খানরা সরবরাহের কোন পথ পেত না। সে সুযোগ তোমাদের ছিল, সে সুযোগ তোমরা গ্রহণ করতে দ্বিধা করেছ অতিরিক্ত আশাবাদী মনোভাবের জন্য। তোমরা মনে করেছিলে যেহেতু অসামরিক শাসনব্যবস্থা তোমাদের হাতে, সুতরাং খানরা বাধ্য হবে পরাজয় স্বীকার করতে। কিন্তু খানরা যাবার আগে দেশের সবকিছু নষ্ট করে দিয়ে যাবে তা বোধ হয় বুঝতে পারনি। সেজন্য মুখোমুখী যুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছে, ফলে তোমাদের শহর এলাকা ছেড়ে আসতে হয়েছে। এটা পরাজয় নয়। যুদ্ধ করেই যুদ্ধ শেখে সব দেশের মানুষ। ভুল করলেই তা সংশোধন করার চেষ্টা থাকে। এইভাবে নির্ভুল পথে তোমরাও যাবে। সাফল্য আসবে। তবে তা খুব তাড়াতাড়ি নয়। শুধুমাত্র অস্ত্রের যুদ্ধ হলে যুদ্ধ শেষ হতে দেরি হবেই, তবে যুদ্ধটা চালাতে হবে নানাভাবে। যুদ্ধ চলবে অস্ত্রের মুখে, যুদ্ধ চলবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, যুদ্ধ চলবে সামাজিক ক্ষেত্রে, যুদ্ধ চলবে রাজনৈতিক ভাবে, তবেই যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হবে।

ফিরে এল ফজলুর আর অমল।

কি খবর ফজলুর ?

মেহেরপুরে খুব উত্তেজনা। আমাদের সব নেতা মেহেরপুর এসেছেন। বাঙলাদেশ সরকারের শপথগ্রহণ স্থির ছিল চুয়াডাঙ্গায়, তা সম্ভব হয়নি। আশা করা যাচ্ছে শহর ছেড়ে কোন পল্লী এলাকায় আগামীকাল শপথ গ্রহণ করা হবে। চলুন সেখানে। খাবার এনেছি। খেয়েদেয়ে আমরা এগিয়ে যাই মেহেরপুরের দিকে। আশঙ্কা আছে, আজ রাতেই খানরা মেহেরপুর আক্রমণ করবে, সেজন্য রাতের মধ্যেই মেহেরপুর ছাড়তে হবে।

খেয়েই রওনা হচ্ছিলাম।

এমন সময় সত্তর-আশীজনের একটা জনতা আমাদের সামনের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের দেখেই থেমে গেল। একজন এসে জিজ্ঞেস করল, বেতাই কতদূর সাহেব ?

বেতাই! তা মাইল বারো হবে। কোথা থেকে আসছেন আপনারা ?

আমরা আসছি কুষ্টিয়া থেকে।

সেখানকার অবস্থা কেমন ?

লোকটা থমকে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, খুবই খারাপ। শহরে আর মানুষ নেই। যারা আছে তারা অবাঙ্গালী আর মুসলীম লীগের লোক। বাড়িঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। কত লোক যে মেরেছে তার সীমাসংখ্যা নেই। আমরা কোন রকমে পালিয়ে এসেছি।

নূরুন্নাহার জিজ্ঞেস করল, কাদের মারছে ?

হিন্দুদের যাকে পাচ্ছে তাকেই, আর মুসলমানদের মধ্যে যারা আওয়ামী লীগের। দোকানপাট সব লুট করেছে, আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে, কত মেয়ে যে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।

আর কোন প্রশ্ন করার ইচ্ছা ছিল না। ওদেরই একজন বলল, আপনারা কোথায় যাবেন ?

বললাম, ঠিক নেই। আপনারাও যেমন আত্মরক্ষার জন্য নিরাপদ এলাকার খোঁজে যাচ্ছেন, আমরাও তেমনি যাচ্ছি। ভাসতে ভাসতে কোথায় গিয়ে কিনারা পাব তাও তো জানি না।

এগিয়ে গেল ওরা।

নূরুন্নাহার রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে বলল, চলুন।

তোমার পায়ের যন্ত্রণা কমেছে কি ?

কমেনি, তবে চলতে পারব।

আবার রওনা হলাম। লক্ষ্যস্থল মেহেরপুর। সামান্য ছয়-সাত মাইল পথ। কোন রকমে এই রাতেই পৌঁছে যাব।

চলতে চলতে নূরুন্নাহার বলল, আপনাদের ইণ্ডিয়া সরকার ও ইণ্ডিয়ার সাধারণ মানুষ যে ভাবে সাহায্য করছে তা ছিল অভাবনীয়। বাঙলাদেশের মানুষ চিরকৃতজ্ঞ রইবে এই স্বার্থহীন সাহায্যের জন্য।

বললাম, এবিষয়ে এখনও মত দেবার সময় হয়নি নূরুন্নাহার। আরও দেখতে হবে।

আমাদের দেখা শেষ হয়েছে। একটা প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাচ্ছি না দাদাসাহেব। আপনাদের সরকার আমাদের সরকারকে স্বীকৃতি কেন দিচ্ছে না। আমাদের অবিসম্বাদিত নেতা শেখ সাহেব বাঙলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, তিনি পশ্চিম-পাকিস্থানীদের হানাদার বলেছেন, বাঙলার একটি পয়সাও তাদের যাতে না দেওয়া হয় তার জন্য আবেদন করছেন। আমাদের অভাব অস্ত্রের। ভারত সরকার যদি আমাদের স্বাধীন দেশ বলে স্বীকার করত, তা হলে অস্ত্রের অভাবটা মিটত, আমরাও তাড়াতাড়ি লড়াই শেষ করে দেশ-গঠনে নামতে পারতাম।

বললাম, এ প্রশ্ন অনেকেই আমাকে করেছে। উত্তর দেই নি ইচ্ছা করেই। কেননা উত্তরের সবটা খুব শ্রুতিরোচক হবে না বলেই মনে করি। প্রথম কারণ হল, এটা আন্তর্জাতিক একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে। একেই পাকিস্থান প্রচার করছে, পূর্ব-বাঙলায় স্বাভাবিক অবস্থা বর্তমান রয়েছে, সামান্য যা-কিছু গোলমাল হচ্ছে তার জন্য দায়ী পূর্ববঙ্গের কিছু সমাজবিরোধী, আর ভারত থেকে পূর্ববঙ্গে অনুপ্রবেশকারী কিছু লোক যারা পূর্ববঙ্গকে পাকিস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত করেছে। যদি ভারত অস্ত্র দেয়, তা হলে বিশ্বের দরবারে ভারতের মর্যাদাহানি ঘটবে এবং অপরাপর পাকিস্থানপ্রেমী দেশসমূহ পরোক্ষভাবে, হয়ত বা প্রত্যক্ষভাবে, এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে, তার ফলে বাঙলা-দেশের অবস্থা হবে ভিয়েতনামের মত, অথবা বিশ্বযুদ্ধের মত ভয়ঙ্কর

অবস্থা দেখা দেবে। সেজন্য ভারত সরকার এখন স্থির করতে পারছে না কি করা উচিত। ভারত সরকার চেষ্টা করছে বিশ্বের জনমত বাঙলাদেশ সরকারের অনুকূলে গড়ে তুলতে।

নূরুন্নাহার বলল, সেটা ঠিক, কিন্তু ততদিনে আমাদের অস্তিত্ব থাকবে কি?

থাকবে। তোমাদের যুদ্ধের যে পরিকল্পনা ছিল, তা সম্পূর্ণরূপে না হলেও কিছুটা ভ্রমাত্মক, যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে যেমন প্রাণ দিতে হয়েছে, তেমনি শহরগুলো সহজেই খানরা দখল করে নিয়েছে। এই মুক্তিযুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত করার দায়িত্ব এখন নেতাদের। তা হলেই জয় হবে।

ঠিক বুঝলাম না আপনার কথা।

সহজ কথা। ভারত তোমাদের নানাভাবে সাহায্য করছে, কিন্তু ভারত জানে বাঙলাদেশে যা ঘটছে তার প্রতিক্রিয়া ভারতে দেখা দেবে, বিশেষ করে পশ্চিম বাঙলায়। সেজন্য সে সতর্ক ভাবে এগোচ্ছে। ভারত ও পাকিস্থানের বৈষয়িক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে বিশেষ পার্থক্য দেখা যাবে না। উভয় পক্ষই নিজের নিজের দেশে ক্ষমতায় থাকার জন্য প্রয়োজনমত মানুষ মারতে মোটেই দ্বিধা করছে না, করবেও না। এখানে যেমন ক্ষমতা হারাবার ভয়ে পাকিস্থানীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, পৃথিবীর সব সাম্রাজ্যবাদীই ক্ষমতা হারাবার ভয়ে এহিয়া সরকারের মতো ভীত ও ক্ষিপ্ত হয়। এখানে ক্ষমতা-রক্ষার অর্থ হল নরহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও ধ্বংস, অন্যত্রও তাই হবার শঙ্কা আছে; তবে অন্যদেশের লোকেরা খানদের মত মোটাবুদ্ধির লোক নয়; তারা সরাসরি অত্যাচার, শোষণ করে না। তারা গীতা, বাইবেল, কোরান, গণতন্ত্র, মানবতা, আইন-শৃঙ্খলার কথা বলে এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতে গোপন হত্যা, অত্যাচার সবই করে ও করছে; এখানে ওসব বালাই নেই, সোজাসুজি রাইফেল, কামান দিয়ে

ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতে খান হানাদাররা সচেষ্ট। সর্বত্রই জহ্লাদের পতন ঘটে, এখানেও ঘটবে। তবে কবে যে তা হবে, তা বলা কঠিন। সেজন্য বর্তমান সমরকৌশল পরিবর্তন করতেই হবে, যেখানে জন-সমর্থন রয়েছে সেখানে জনযুদ্ধ পরিচালনাই সহজ এবং জয়লাভের একমাত্র উপায়।

অবাক হয়ে নূরুন্নাহার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

আকাশে তখন চাঁদ।

সামান্য আলোতে তার মুখখানা দেখতে পেলাম। কেমন যেন বিষাদ-ক্লিষ্ট তার মুখের চেহারা।

আপনি বলতে চান আপনাদের সঙ্গে আমাদের অবস্থার কোন পার্থক্য নেই?

হাঁ। বললাম যে ভারতে যে গণতন্ত্র, তার মূলনীতিও ব্যর্থ হয়েছে। যার ফলে দেখা দিয়েছে প্রবল শ্রেণী-বৈষম্য। সাতচল্লিশ সালের ভারত-বিভাগ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে, কিন্তু মূলতঃ সেটা হওয়া উচিত ছিল শ্রেণী-সংগ্রামের ভিত্তিতে। শ্রেণী-সংগ্রামকে তৎকালীন ভারতীয় পুঁজিপতি হিন্দু-মুসলমানরা বিপথে পরিচালনা করেছিল তাদের কায়েমী শোষণব্যবস্থাকে নিরাপদ করতে। ভারত-বিভাগের পর যখন চোখ মেলে তাকালাম, আমরা তখন দেখলাম, ভারত-বিভাগের গোপন উদ্দেশ্য শোষণ কায়েম রাখা। ধনীদেব ধনবৃদ্ধি হয়েছে উভয় দেশেই, আর দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়েছে উভয় দেশেই। ধীরে ধীরে গরীবরা বুঝতে শিখল, তারা বাদপ্রতিবাদ আরম্ভ করল। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের লোক বুঝল, তারা ইসলামাবাদের উপনিবেশ। উভয় রাষ্ট্রেই গণ-জাগরণ দেখা দিতে থাকে। তারই পরিণামে ভারতে নানা দল-উপদল সৃষ্টি হল শোষণ রোধ করতে এবং তারা চেষ্টা করছে গণতান্ত্রিক উপায়ে। কিন্তু বিশ-বাইশ বছরে সবাই দেখেছে, গণতন্ত্র শোষণ রোধ করতে পারছে না। শোষককে শক্তি প্রয়োগ করে হটিয়ে দিয়ে

জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ভিন্ন বাঁচার অন্য কোন পথ নেই। বর্তমানে সেই পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে বাঙলাদেশের আপামর জনসাধারণ। সেখানে শোষণ-রোধের জন্য জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছে। জাতীয়তাবাদের মাধ্যমেই উপনিবেশকে শোষকের কব্জা থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে।

নূরুন্নাহার বলল, আপনার যুক্তি অস্বীকার করতে পারছি না। তবুও বুঝতে পারছি না আমরা গণতান্ত্রিক উপায়েই আন্দোলন আরম্ভ করছিলাম, অথচ তার পরিণতিতেই রক্তপাত হচ্ছে। আমাদের নেতারা বলছেন, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজবাদী রাষ্ট্র গঠনই আমাদের উদ্দেশ্য, তবুও কেন পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশগুলো আমাদের সরকারকে স্বীকার করছেন না ?

বললাম, ভারতের কথাই প্রথম বলতে হয়। বহু কারণ তো বলেইছি। আরেকটি গুরুতর কারণ হল 'বুমেরাং'। যদি ভারত অস্ত্রসাহায্য দেয় এবং সেই অস্ত্রে বাঙলাদেশ যদি স্বাধীনতা লাভ করে, তা হলে পশ্চিম বাঙলার মানুষও স্বাতন্ত্র্য চাইবে। বর্তমান সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রের হাতেই সব ক্ষমতা। পশ্চিম বাঙলা যখনই স্বাতন্ত্র্য চাইবে, তখন যদি তা দিতে অস্বীকার করে কেন্দ্রীয় সরকার, তা হলে যে অস্ত্র দিয়ে বাঙলাদেশের স্বাধীনতা আসবে সেই অস্ত্র ঘুরে আসবে পশ্চিম বাঙলার উগ্রপন্থীদের হাতে। আর বাঙালী হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে সাহায্য করবেই। ফলে ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে, এমন আশঙ্কা আছে। তার লক্ষণও দেখা দিয়েছে। বাঙলার মানুষ যে প্রান্তেরই হোক, তারা স্বাধীন হলে ভারতের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হবে, সেটা কারোই কাম্য নয়।

আপনি বলতে চান পূর্ব-বাঙলা আর পশ্চিম বাঙলা এক হবে ?

না। তা কখনও হবে না। পূর্ব-বাঙলা স্বাধীনতা লাভের পর ধাক্কাটা আসবে পশ্চিম বাঙলায়। এখানেও হিন্দী-সাম্রাজ্যবাদের

বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছে, কেন্দ্রের ক্ষমতাহ্রাসের জন্য আন্দোলন হচ্ছে। যদি উগ্রপন্থীরা জোর লড়াই করার সুযোগ পায়, তা হলে পশ্চিম বাঙলাও স্বাধীন সার্বভৌম হতে চাইবে। এই সব ভয় আছে বলেই ইন্দিরা সরকার সরাসরি কোন কাজই করছে না। পূর্ব-বাঙলার মুসলমানরা পশ্চিম বাঙলার সঙ্গে যুক্ত হলে অখণ্ড বাঙলার মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। হিন্দুদের বৃহদংশই হল কায়েমী-স্বার্থের বাহক অথবা তাদের দালাল। তারা সহজে তা স্বীকার করবে না। এমনকি পশ্চিমবঙ্গে উগ্রপন্থীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে মুসলমানদের প্রাধান্য ঘটবে—এই ভয়েই হিন্দুদের বিশেষ বিশেষ শ্রেণী বাধা দেবেই। পরিণতি কি হবে তা ইতিহাসের গর্ভে। যুক্তির দিক থেকে এটাই স্বাভাবিক। সেজন্য উভয় বাঙলা এক হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। বাঙলাদেশের মানুষ ভারতের তাঁবেদারী করতে রাজী হবে না কোন সময়ই। করা উচিতও নয়। যারা পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মিলনের আশা করে, তাদের বাস্তববুদ্ধি সন্দেহজনক।

অমল কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলল, হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষকে আপনি মূল্য দেন না মনে হচ্ছে।

খুব মূল্য দেই। সেই মূল্য দেবার ফলেই পূর্ব-বাঙলার মানুষ আজ হানাদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পেরেছে। আবার যেদিন পশ্চিম বাঙলার মানুষ বাস্তব অবস্থা বুঝবে, সেদিন তারাও কেন্দ্রকে হানাদার মনে করবেই করবে। তবে চরিত্রগত অনেক পার্থক্য রয়ে গেছে বলেই পূর্ববঙ্গে যা সম্ভব হয়েছে, তা পশ্চিমবঙ্গে সম্ভব সহজে হবে না। পূর্ব-বাঙলায় যে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছে, তার সার্থক রূপ যে কি হবে তা আজও স্থির করা সম্ভব নয়। যদি তা ফ্যাসিস্ত রূপ নেয়, যদি তা জনতার সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলে, তা হলে অবস্থা হবে স্পেনের সাধারণতন্ত্রীদের মত। একটি Command না থাকলে দেখা যাবে যুদ্ধক্ষেত্রে বসে জওয়ানরা

বিচার করছে, এই যুদ্ধ ন্যায্য কি অন্যায্য, অথবা তারা চিন্তা করছে লড়াই কি করে পরিচালনা করবে। তাদের এই অবস্থার সুযোগ নেবে সাম্রাজ্যবাদীরা, যেমন সুযোগ নিয়েছিল ফ্রাঙ্কো ; তখনই দেখা দেবে হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন। দেশের মুক্তিসাধনার মত বৃহৎ আদর্শ তাদের সামনে থেকে সরে যাবে। সেজন্য বর্তমানে যে জাতীয়তাবাদী চরিত্র গড়েছে, তার পরিণতি লক্ষ্য না করে কিছুই বলা যায় না।

নূরুন্নাহার বলল, ভারতের সঙ্গে পূর্ব-বাঙলার অবস্থার কোন তুলনাই হয় না।

বললাম, আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়, কিন্তু মূলতঃ এক। তবে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে। বাঙলাদেশে বাঙালী জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠলেও, পশ্চিম বাঙলায় তা গড়ে উঠবে না ; পূর্ববঙ্গে পাকিস্থানীরা দখলদার, পশ্চিমবঙ্গে আইনতঃ দিল্লীওয়ালারা দখলদার নয়। অপরপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পসমৃদ্ধ, এখানে শ্রেণীচেতনাই প্রবল। সেজন্য জাতীয়তাবাদের পরিণতি সম্বন্ধে আমার মনে বেশ দ্বিধা আছে। কোনদিন যদি শ্রেণীচেতনাসম্পন্ন জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়, তখন স্থির বলা যায় কি হবে, অথবা হতে পারে। তখনই বীজগণিতের ফরমূলায় result জানা যাবে। পশ্চিম বাঙলার শ্রেণীচেতনা যেভাবেই এগিয়ে চলুক, তাতে মার্কস্‌বাদী চিন্তার প্রাবল্য দেখা দিয়েছে। এখানে সংকীর্ণতা-পূর্ণ জাতীয়তাবাদের বিশেষ স্থান নেই। সেজন্য আমরা, বিশেষ করে শিক্ষিত হিন্দুরা, সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করি।

নূরুন্নাহার প্রতিবাদের সুরে বলল, শ্রেণীচেতনাসম্পন্ন যারা তারা মার্কস্‌পন্থী, কিন্তু শোষণবিরোধী বাঙলাদেশের মানুষকে নিপীড়ন করতে কম্যুনিজমের প্রবক্তা চীনারাই এগিয়ে এসেছে। এটাই তাজ্জব ব্যাপার।

বললাম, কূটনীতিক অনেক কারণ রয়েছে। পাকিস্থানকে মদত

দিয়ে বড় বড় শক্তি ভারসাম্য রক্ষা করতে চাইবে। তারা জানে ভারত পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হলেও কিছুটা polished এবং বাহ্যিকভাবে তারা মানবতার কথা বলে ; সেজন্য ভারতের আসল চেহারা না জেনে বিশ্বাস করতে পারে না। ইংরেজও বিশ্বাস করে না, আমেরিকাও বিশ্বাস করে না ; ওদিকে রাশিয়াও বিশ্বাস করে না, চীনও বিশ্বাস করে না। ভারসাম্য রক্ষার জন্যই পাকিস্থানকে জিইয়ে রাখতে চায়।

তা হলেও যে চীন নির্যাতিত মানুষের বন্ধু বলে পরিচয় দেয়, তার পক্ষে নির্যাতনকারীকে সাহায্য করা কি উচিত ?

বললাম, কারণ হল ভারতবর্ষ। বাঙলাদেশের মুক্তি যদি কায়েম হয়, তা হবে ভারতের সাহায্যে। ভারতের নৈতিক প্রভাব থাকবে বাঙলাদেশের সদ্যলব্ধ স্বাধীন সরকারের ওপর। ইংরেজ ও আমেরিকা হারাবে তাদের উৎপাদিত মালের উপনিবেশ, চীন হারাবে পুঁজিবাদীদের চোখ-রাঙ্গাবার ঘাঁটি। সেজন্য সবাই চুপ করে বসে আছে, কেউ প্রকাশ্যে বিরোধিতা করছে না।

এই যদি নীতি হয়, তা হলে আপনাদের এখানে যারা শ্রেণী-সংগ্রামে নেমেছে, তারাই না কেন মাওবাদী ?

এর সঠিক উত্তর দিতে পারব না নূরুন্নাহার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন রাশিয়া যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হল, ইংরেজ ও আমেরিকার সঙ্গে হাত মেলালো, তখন ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ইংরেজের সপক্ষে প্রচার করতে লাগল ; তারা বলল,—এটা জনযুদ্ধ। এই জনযুদ্ধে প্রত্যেক ভারতীয়ের অংশ গ্রহণ করা উচিত। পরাধীন জাতি যুদ্ধ করে মুক্তিলাভের জন্য, কিন্তু এখানে পরাধীন জাতি স্বীকার করল অদের প্রভুর হয়ে যুদ্ধ করাটাই জনযুদ্ধ, কারণ কম্যুনিস্ট রাশিয়া ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুদ্ধ করছে। তাদের ভ্রম কেটেছে। ভ্রমমুক্ত হয়ে যখন তারা আবার নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার জন্য সচেষ্ট হল, তখন দেখা গেল অধিকাংশের গলায় ঝুলছে কম্যুনিস্ট পার্টির সাইনবোর্ড, আসলে তারা কম্যুনিজম তত্ত্বের বিরোধী।

মাওবাদ জাতীয় জীবনে কতটা গভীরে প্রবেশ করেছে, সে-বিষয়ে সকার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে ; যে-কোন তত্ত্বেই মানুষ বিশ্বাসী হোক না কেন, তারা নিজস্ব সত্তা নিয়ে লড়াই করে, নিজস্ব সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকে। সেজন্য ভুল হয়ত হবে। ইতিহাস তাদের নির্ভুল পথ দেখাবে কিন্তু আজ কোনক্রমেই বলা যায় না ওরা সত্যিই সব কিছুতে ভুল করছে।

নূরুন্নাহার ক্ষুব্ধভাবে বলল, আপনার যুক্তি মনের সঙ্গে মেনে নিতে পারছি না সাহেব। আমার বিশ্বাস মাওবাদীদের স্লোগান ভুল। চীন চায় পৃথিবীর সর্বত্র অশান্তি বজায় থাক, আর তার নিজস্ব প্রভাব বজায় থাকুক। সেজন্য আজ বাঙলাদেশ সম্বন্ধে চীনের ভূমিকাকে প্রশংসা করতে পারছি না।

মৃদুস্বরে বলল, রাজনীতির এই জটিল সূত্র নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন নয়। আজ সামনে রয়েছে নির্মম বাস্তব, এখানে রয়েছে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা-রক্ষার আদর্শ। সেজন্য তোমাদের এই মুক্তি-যুদ্ধের স্বরূপ নির্ণীত না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলাই সমীচীন হবে না। যেদিন তোমরা সুস্থ সবল ও সহজ জীবন পাবে, সেদিন তর্কশাস্ত্রের জটিল সূত্রগুলো বিচার কোরো, আজ নয়।

অমল বলল, আমরা কিন্তু মেহেরপুর এসে গেছি।

নূরুন্নাহার সামনে ভাল করে তাকিয়ে বলল, ভালই হয়েছে। আচ্ছা, ওরা চোখ-কান বুজে আছে কেন ?

এর উত্তর তো দিয়েইছি।

আপনাদের দেশ ভারত তো অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করছে।

ভারত করছে তার প্রয়োজনে। যে কারণে চীন এহিয়াকে সমর্থন করছে, ইঙ্গ-আমেরিকানরা চুপ করে আছে, সেই কারণেই ভারত সাহায্য করছে বাঙলাদেশকে।

ভারত স্বাধীন বাঙলা গড়ে উঠুক তা চায়।

নিজের স্বার্থে ভারত তাই চায়। দ্বিজাতিতত্ত্ব যে মিথ্যা, তার

প্রমাণ হল এই বিপ্লব। এই বিপ্লবের সাফল্য কামনা করে ভারত আন্তরিকভাবে।

কেন ?

সে অনেক কথা। মোটামুটি কথা হল, ভারতের বর্তমান সামাজিক কাঠামো বজায় রাখতে হলে, ভারতের আভ্যন্তরীণ অসন্তোষ মোচন প্রয়োজন। এই অসন্তোষের মূলে রয়েছে বেকার-সমস্যা আর কৃষি-সমস্যা। ভারত চায় তার নিকটবর্তী বাজার বাঙলাদেশে গড়ে উঠুক। অনুন্নত বাঙলাদেশ বিদেশ থেকে বেশি মূল্য দিয়ে যেসব মাল আনছে, তা অল্প মূল্যে পাবে ভারত থেকে। বাঙলাদেশের অর্থনীতির ওপর তাতে বিশেষ চাপ পড়বে না, অথচ ভারতের শিল্প বাণিজ্য প্রসারলাভ করবে, বেকার-সমস্যা হ্রাস পাবে। ফলে বর্তমান কাঠামোর কোন পরিবর্তন হবে না, অথচ ভারতের বেকার-সমস্যা লাঘব হবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, সেই অনুপাতে বেকার-সমস্যা ভারতের সামনে শ্রেণীসংগ্রামের ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। ভারতকে সহজ পথে নিতে হলে বাঙলাদেশের মঙ্গল কামনা ভিন্ন অন্য পথ নেই। বাঙলাদেশের বাজার দখল করে আছে ইংরেজ, আমেরিকা, চীন ও জাপান। তারা প্রত্যক্ষভাবে বাধা না দিলেও বাজার হাতছাড়া হবার ভয়ে কিন্তু পরোক্ষভাবে বাধা দেবে। তা দিচ্ছেও। যে পরিমাণ আশ্রয়প্রার্থী আসছে ভারতে, তার চাপে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত হবেই, এর সমাধান হবে বাঙলাদেশের রাজনৈতিক সমাধানে এবং রাজনৈতিক সমাধানে ভারত নিজের স্বার্থেই বাঙলাদেশকে সাহায্য করবে।

নূরুন্নাহার প্রতিবাদ করে বলল, আপনার এ যুক্তিও স্বীকার করতে পারছি না।

একটু কটু শুনতে হলেও মূলতঃ ঘটনাটা ঠিক। হিটলার বা কাইজার বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য দুটো বিশ্বযুদ্ধ ডেকে

এনেছিল, যার পরিণামে জার্মান অনেক কিছু হারিয়েছিল। বর্তমানে এভাবে অপরের দেশে হামলা করে কেউ আর বেকার-সমস্যা সমাধান করতে চায় না। আজ উৎপাদিত মালের জন্য কলোনী প্রয়োজন। পুঁজিবাদী দেশের বেকার-সমস্যা এইভাবেই সমাধান করা হচ্ছে। ভিয়েতনামের যুদ্ধ যদি শেষ হয়, তাহলে আমেরিকার কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে, বেকার-সংখ্যা বাড়বে। সেজন্য তাকেও নতুন আরেকটা ক্ষেত্রে দেখতে হবে, যাতে তার অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করা সম্ভব হয়। আজ কেউ কলোনী দখলে রাখতে চায় না এহিয়ার মত মূর্খতা করে। আজ কলোনীকে অর্থনৈতিক শোষণ করতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে স্থানীয় সরকারকে তাঁবেদারী করতে উৎসাহিত করে। এই ঘটনাই ঘটেছে ও ঘটবে।

আমরা অন্য দেশকে সে সুযোগ দেব কেন ?

দিতে হবে না। আপনা থেকেই তা হবে। তোমাদের প্রয়োজন মেটাবে ভারত অযাচিতভাবে। তোমরাও স্বল্পমূল্যে মাল পেলে খুশী হবে। বিশেষ করে ভারতের পূর্বাংশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের আত্মিক বন্ধন রয়েছে। ইংরেজ, আমেরিকা যে শ্রেণীর শোষক, এহিয়া যে শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী, ভারত তা নয় ; এবং ভারত বাঙলাদেশ সম্বন্ধে বিশেষ সহানুভূতিশীল, ভারত ক্ষতি স্বীকার করেও নিকট প্রতিবেশী বাঙলাদেশ গঠনে সাহায্য করবেই। তার জন্য কোন শর্তও থাকবে না। এই অবস্থাকে কোনক্রমেই তোমরাও মনে করবে না শোষণব্যবস্থা, বরং নিজেদের গুছিয়ে নেবার যে সুযোগ পাবে তাতে তোমরা কৃতজ্ঞ রইবে।

আপনি বলছেন ভারতে এক ধরনের শ্রেণীসংগ্রাম চলছে ?

সর্বত্র নয়। কোন কোন রাজ্যে। তা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে।

আমাদের দেশেও শ্রেণীসংগ্রাম দেখা দেবে নিশ্চয়ই।

তা দেখা দেবে। তবে হানাদার খানরা বিশেষ বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীকে নির্মূল করবে যাবার আগে। তারা যে গোরস্থান রেখে

যাবে, তাতে শ্রেণীসংগ্রামের বিশেষ কোন সুযোগ থাকবে না। যারা থাকবে, তারা সবাই হবে নিরন্ন ভিখারী শ্রেণীর। যদি কখনও তাদের মধ্যে শোষক দেখা দেয়, তখন শ্রেণীসংগ্রাম আরম্ভ হবে। আর যুদ্ধ যত বেশিদিন চলবে ততই তা পরিণত হবে জনযুদ্ধে, তখন আপনা থেকেই শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন হবে।

আপনি বলতে চান, ভারত মানবতাবোধ নিয়ে সাহায্য করছে না ?

নিশ্চয় তা করছে। মানবতাবোধ সবার আগে। ভারত জানে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ গণতন্ত্রকামী মানুষ তাদের বন্ধু। সেজন্য বন্ধুকে সাহায্য করবেই করবে। যদি কখনও এর চেহারা বদল না হয়, তা হলে কোন অসুবিধা হবে না। তুমি বোধহয় জানো না, ইতিমধ্যে এহিয়া সরকার নতুন সুরে গান ধরেছে। তারা বলছে, শেখ মুজিবুর পঁচিশ তারিখ রাত বারোটায় আক্রমণ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিল। সংবাদটা তারা জানতে পেরে দু'ঘণ্টা আগে মিলিটারী নামিয়েছিল কেবলমাত্র আওয়ামী লীগের গুণ্ডাদের হাত থেকে নিরীহ নাগরিকদের রক্ষা করতে। ঢাকায় আওয়ামী লীগের গুণ্ডারা অবাঙ্গালীদের হত্যা করছিল, অবাঙ্গালীদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করছিল, অবাঙ্গালী মেয়েদের ওপর অত্যাচার করছিল। এই গুরুতর অবস্থা থেকে বাঁচাতে সামরিক বাহিনীকে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় নামতে হয়েছিল। এহিয়াকে গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনাও নাকি ছিল। এবার বুঝতে পারছ সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী জঙ্গীশাহীর আসল চেহারা কি ? এইরকম কৈফিয়ত দেয় প্রত্যেক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তাদের নরঘাতন সমর্থন করতে। আওয়ামী লীগের গুণ্ডাদের দমন করতে দুইলক্ষ লোককে গুলী করে মারল খানরা কিন্তু অবাঙ্গালী একজনের নামও পাওয়া গেল না যাকে আওয়ামী লীগের গুণ্ডারা হত্যা করেছে। এই সাম্রাজ্যবাদী জঙ্গীবাজদের নীতি কেউ-ই বরদাস্ত করে না, কিন্তু নির্বিবাদী মানুষ

মুখ বুজে এসব সহ্য করতে বাধ্য হয়, তার অর্থ এটা নয় যে তারা এই সব অন্যায়কে সমর্থন করে। মানুষ হয়ত ভয়ে কথা বলছে না, কিন্তু তারা মর্মে মর্মে অনুভব করছে। সত্য চিরকাল চাপা থাকে না।

নূরুন্নাহার বলল, যারা মানুষ মেরে সমস্যা সমাধান করতে চায়, তাদের বুদ্ধির ও রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রশংসা করা যায় না। সর্বক্ষেত্রেই মানুষ মারার নীতি পুঁজিবাদী জঙ্গীশাসকরা গ্রহণ করে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের পরাজয় স্বীকার করতেই হয়।

সব দেশেই 'তা হবে। আজ অথবা কাল।

আকাশ পরিষ্কার হতেই দেখা গেল দলে দলে লোক এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে।

ওরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে।

বোধহয় তাই। এগিয়ে চল। ওদের কাছে অনেক সংবাদ পাওয়া যাবে।

শহরের কেন্দ্রস্থলে কয়েকজন জটলা করছে।

প্রায় সব বাড়ির দরজা খোলা। শহরের লোকজন প্রায় সবাই বেরিয়ে পড়েছে। খানরা যে নিকটে এসে গেছে, সে-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই।

আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

আমরা যাচ্ছি মুজিবনগরে।

মুজিবনগর কোথায়?

ভৈরবের ওপারে। ওখানে আমাদের মন্ত্রীরা আজ সকলেই শপথ গ্রহণ করবে। দলে দলে লোক সেখানে যাচ্ছে। খানরা এসে গেছে, শহর ছেড়ে আমরা গ্রামে আশ্রয় নিচ্ছি। আপনারাও চলুন। শহর মোটেই নিরাপদ নয়।

নূরুন্নাহার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আজ কত তারিখ? তেসরা বোশেখ?

বললাম, হাঁ। আজই নতুন সরকারের বিধিসম্মত অধিকার জন্মাবে দেশ-পরিচালনার।

ভৈরব নদীর বাঁশের অস্থায়ী সাঁকো পেরিয়ে দলে দলে লোক চলেছে বেতাইয়ের পথে। ওরা চলেছে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় পেতে।

আরেক দিকে পারঘাটা পেরিয়ে দলে দলে চলেছে বৈদ্যনাথ-পুরের দিকে। আজ বৈদ্যনাথপুরই হল মুজিবনগর।

পথে পাউরুটি কিনে নিয়েছে ফজলুর।

বোতল-ভর্তি জল।

আমবাগানে বসে রুটি ও জল খেয়ে এগিয়ে চললাম বৈদ্যনাথ-পুরের দিকে।

নূরুন্নাহার বলল, আপনার কি মনে হচ্ছে? আমাদের জয় হবে তো?

আশা করছি।

আপনি তো অনেকদূর ঘুরে এলেন। [illegible] লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন। এবার আপনার মতামত দিন।

আমি সংবাদপত্রের রিপোর্টার নই নূরুন্নাহার। আমি ঘটনা দেখেই মত দিতে পারি না।

তবুও কিছু তো আপনার মনে আঁচড় কেটেছে?

তা ঠিক। আমার বিশ্বাস জাতীয়তাবাদের আফিমের ঘোর এখনও আছে। অতীতে ধর্মের আফিম দিয়ে মুসলমান সমাজকে যেভাবে চতুর বড়লোকরা শোষণ করেছে, সে অবস্থা প্রায় কেটে গেছে। এবার এসেছে জাতীয়তাবাদের মোহ। এই জাতীয়তাবাদকে শ্রেণীসংগ্রামে পরিণত করাই বর্তমানে সবচেয়ে বড় কাজ। সেই কাজটি এখনও হয় নি।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ ঠিক বাম-ঘেঁষা বুর্জোয়া লিবারেলদেরই প্রাধান্য চলছে। সেজন্য বিজয় সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ জাগছে। তবে সাধারণ মানুষের মনোভাব দেখে মনে হচ্ছে, এই যুদ্ধ শীঘ্রই জনযুদ্ধে পরিণত হবে, তখনই তোমাদের জয় হবে অবশ্যম্ভাবী। দেশের বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীর মুষ্টিমেয় সমর্থক বাদে সবাই চায় খানদের হাত থেকে নিষ্কৃতি। একেই বলে জনজাগরণ, এখন নেতাদের কাজ হল এই জনজাগরণের ভিত্তিতে সর্বাত্মক জনযুদ্ধ গড়ে তোলা, 'তাহলে চিরস্থায়ী শান্তি ফিরে আসবে সোনার বাঙলায়। বর্তমানে চলছে লিবারেল বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিকদের লিবারেশন ওয়ার, এটাকে পরিণত করতে হবে পিউপিলস্ লিবারেশন ওয়ারে। আশা করছি তা হবে খুবই শীঘ্রই। তোমাদের অজান্তেই রূপ বদল হবে, হয়ত নেতৃত্বের রদবদল হবে, জনযুদ্ধ ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে এহিয়ার সাম্রাজ্যবাদী হানাদারীকে।

ফজলুর অবাক হয়ে শুনতে শুনতে এসেছে এতটা পথ। এইবার উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, আপনার কথাই ঠিক। আজ মুজিবনগরে সেই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতে হবে।

নূরন্নাহার পায়ের যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে মুখ বিকৃত করছিল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, এতটা দৃঢ়তা কি করে পেল এই মেয়েটা! জাতীয়তাবোধের সঙ্গে দেশপ্রেমের অপূর্ব সংমিশ্রণ না ঘটলে ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য এভাবে পরিহার করা সম্ভব হত না কোনক্রমেই। শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে উঠল। ধন্য এই নারী। সুখের ঘর ছেড়ে অজানা পথে যে ছুটে চলেছে, তাকে প্রশংসা জানাবার মত আমার মুখে কোন কথাই ফুটল না। হয়ত জীবনে আর তার সঙ্গে দেখা হবে না, কিন্তু ভুলতে পারব না তাকে কোনদিনই।